পরিবেশ বিজ্ঞান
সার ব্যবহার নির্দেশনা

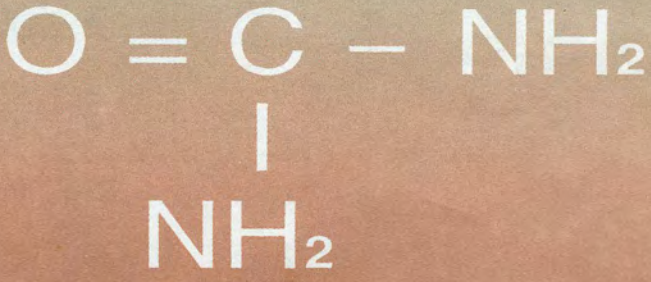

মোঃ সদরুল আমিন

পরিবেশ বিজ্ঞান : সার ব্যবহার নির্দেশনা

ড. মোঃ সদরুল আমিন
প্রফেসর
হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
দিনাজপুর

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library

পরিবেশ বিজ্ঞান : সার ব্যবহার নির্দেশনা
(কৃষি পরিবেশ বিজ্ঞান : সার প্রয়োগের নির্দেশনা)

প্রথম প্রকাশ
জৈষ্ঠ্য ১৪০৫/মে ১৯৯৮

বা/এ ৩৭৭৯
(৯৭-৯৮ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি : ১৩)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ

জীকৃচি ২৫৪

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

PARIBESH BIJNAN : SHAR BABOHAR NIRDESONA (Environmental Science Indications of Fertilizer Application) by Dr. Md. Sadrul Amin. Published by Gholam Moyenuddin. Director, Texbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition : May 1998. Price : Taka 100.00 only.

ISBN 984-07-3747-3

উৎসর্গ

সার ব্যবহারকারী কৃষকদের উদ্দেশে

ভূমিকা

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে সারের ব্যবহার এবং এর মূল্য দুটিই বেড়ে চলেছে। ফলে সারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি গবেষণা জোরদার করা হচ্ছে। সার সম্পর্কে এসব গবেষণার ফলাফল ব্যবহারকল্পে উদ্ভাবিত তথ্যসমূহ পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে কৃষিবিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কৃষিতত্ত্ব, উদ্যানতত্ত্ব, কৃষি রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সার সম্পর্কে পড়ানো হয়ে থাকে। তাই কৃষি গবেষণার সর্বাধুনিক তথ্যসহ সার ব্যবহার নির্দেশনা সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে সার সম্পর্কে সাধারণ নীতিমালাসহ ফসলে সার প্রয়োগের প্রকার, পরিমাণ, সময় ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

সার একটি রাসায়নিক দ্রব্য। সঠিক ব্যবহার না করা হলে সার দ্রব্য নানাভাবে মৃত্তিকা ও পানির পরিবেশকে কলুষিত করে। তাই আশা করা যায়, এই গ্রন্থের বিষয়ের আলোকে নির্দেশনা অনুযায়ী জমিতে সার ব্যবহার করা হলে একদিকে যেমন অল্প পরিমাণ সারে অধিক ফসল উৎপাদন করা যাবে, অন্যদিকে সার ব্যবহারের কুফলসমূহ দূরীকরণ সম্ভব হবে।

এই গ্রন্থটি পাঠ করে কৃষি ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরিবেশবিজ্ঞানী ও পরিবেশ কর্মী কাঙ্ক্ষিত উপকার পেলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

মূল্য বৃদ্ধির কারণে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। বর্তমান হিসাব মতে জমিতে ব্যবহৃত সারের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ অপচয় হয় ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা হলে এই অপচয়ের মাত্রা অনেকখানি কমানো যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের Fertilizer Rceommendation Guide–এর ভিত্তিতে এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির আলোকে এই গ্রন্থের বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে । এই গ্রন্থের তত্ত্ব ও তথ্যের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। বিশেষত চিত্রের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম সদস্য পরিচালক, মৃত্তিকা ও সেচ, BARC-র কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থে বিশেষভাবে সার ব্যবহারের নির্দেশনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থ পাঠে ব্যবহারকারীগণের পক্ষে বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে কোনো নির্দিষ্ট ফসল বা ফসল বিন্যাসের সার সুপারিশ প্রদান করা সম্ভব হবে বলে আশা করি।

সার সম্পর্কিত কৃষি বিজ্ঞান একটি অত্যন্ত গতিশীল বিজ্ঞান। গবেষণার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত নতুন তথ্যের সাহায্যে এই সমৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তেমন অসঙ্গতি দেখা গেলে এবং তা অবহিত করা হলে ভবিষ্যতে সে অনুযায়ী সংশোধন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থে আমি সবার সহযোগিতা কামনা করি।

সর্বোপরি বাংলা একাডেমী গ্রন্থটির বিষয় ও চিত্র সম্পর্কে উন্নতকরণ সাপেক্ষে প্রকাশ করার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

মোঃ সদরুল আমিন

হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
দিনাজপুর

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : সার ব্যবহার ও শ্রেণিকরণ ৯ - ৭৩

১. সার ব্যবহারের বিবর্তন ৯
২. মৃত্তিকা, সার ও পরিবেশ ১০
৩. নাইট্রোজেন সার ও পরিবেশ রক্ষা ১৩
৪. সার ও সারের কাজ ১৫
৫. সারের শ্রেণিকরণ ৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : সারের বৈশিষ্ট্য ৭৪ - ৯৬

১. রাসায়নিক সার ৭৪
২. নাইট্রোজেন সার ৭৬
৩. ইউরিয়া সার ৭৯
৪. এমোনিয়াম সার ৮২
৫. ফসফরাস সার ৮৬
৬. পটাশিয়াম সার ৯০
৭. ফ্রিট ও চিলেট সার ৯৪

তৃতীয় অধ্যায় : সার ব্যবহার নীতিমালা ৯৭ - ১৪০

১. রাসায়নিক সারের ভৌত প্রকৃতি ও গ্রেড ৯৭
২. মিশ্র সার ১০০
৩. সার প্রয়োগ পদ্ধতি ১০৩
৪. কম্পোস্ট সার ১২৩
৫. সার প্রয়োগের মূলনীতি ১২৯
৬. মৃত্তিকা পরীক্ষা ১৩৫
৭. উদ্ভিদ কোষকলা পরীক্ষা ১৩৬
৮. নাইট্রোজেন সার ১৩৭
৯. মৃত্তিকার অন্যান্য উপাদান ১৩৯

চতুর্থ অধ্যায় : মাঠ ফসলে সার প্রয়োগ ১৪১

১. মাঠ ফসলে সার প্রয়োগের নীতিমালা ১৪১
২. মাঠ ফসলে সার প্রয়োগ ১৪১

ধান ১৪১ ; গম ১৪৮ ; বার্লি ১৪৯ ; চিনা ১৫১ ; কাউন ১৫২ ; সরগাম ১৫৪; ভুট্টা ১৫৫ ; মিষ্টি আলু ১৫৭ ; গোল আলু ১৫৮ ; আখ ১৬০ ; তামাক ১৬১ ; পাট ১৬৩ ; শন পাট ১৬৬ ; মেস্তা ১৬৭ ; কেনাফ ১৬৯ ; তুলা ১৭০ ; খেসারি ১৭২ ; মসুর ১৭৩ ; ছোলা ১৭৪ ; মুগকলাই ১৭৬ ; মাসকলাই ১৭৭ ; মটর ১৭৯ ; অড়হর ১৮১ ; গো-মটর ১৮২ ; সরিষা ১৮৪ ; তিল ১৮৬ ; তিসি ১৮৭ ; সূর্যমুখী ১৮৯ ; সয়াবিন ১৯০ ; কুসুমফুল ১৯২ ; চীনাবাদাম ১৯৩ ; পান ১৯৫।

পঞ্চম অধ্যায় : শাক-সবজিতে সার প্রয়োগ ১৯৭ - ২২৬

১. সাধারণ বিষয়াবলী ১৯৮

২. শাক-সবজিতে সার প্রয়োগ ২০০

পুঁইশাক ও লাউ-কুমড়া ২০০ ; লালশাক, ডাঁটা শাক, পালং শাক ও পাট শাক ২০১ ; চীনা শাক ও বাটি শাক ২০৪ ; কলমী শাক ২০৫ ; লেটুস, পেঁয়াজ ও গাজর ২০৫ ; মূলা ২০৭ ; ফুলকপি, ব্রোকোলি ২০৮ ; বাঁধাকপি ২০৯ ; লাউ, চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, শসা, স্কোয়াশ, ক্ষিরা ২১০ ; শিম, বরবটি, মটরশুঁটি ২১১ ; করলা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, কাকরোল ২১২ ; ঢেঁড়শ ও চুকাই ২১৫ ; টমেটো ২১৬ ; বেগুন ২১৭ ; মানকচু ও ওলকচু ২১৮ ; পেয়াজ ২১৯ ; রসুন ২২১ ; মরিচ ২২১ ; আদা ২২৩ ; হলুদ ২২৩ ; ধনে ২২৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ফল গাছে সার প্রয়োগ ২২৭-২৪৩

১. ফল গাছে সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা ২২৭

২. সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি ২২৭

পেয়ারা ২২৭ ; পেঁপে ২২৯ ; লেবু, মাল্টা, কমলা, কিনো ২৩০ ; ডালিম ২৩২ ; কলা ২৩৩ ; নারকেল ২৩৪ ; আঙুর ২৩৬ ; আনারস ২৩৯ ; আম ২৩৯ ; কাঁঠাল ২৪১ ; সুপারি ২৪২।

সপ্তম অধ্যায় : ফুল গাছে সার প্রয়োগ ২৪৪ - ২৬৯

১. ফুল গাছে সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা ২৪৪

২. ফুল গাছে প্রয়োগর জন্য সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি ২৪৪

গোলাপ ২৪৫ ; রজনীগন্ধা ২৪৬ ; ফুল গাছ ২৪৮ ; মৌসুমী ফুল ২৪৯।

তথ্যপঞ্জি ২৭০।

প্রথম অধ্যায়

সার ব্যবহার ও শ্রেণিকরণ

১। সার ব্যবহারের বিবর্তন

মানুষ কখন প্রথম ফসল চাষ শুরু করেছিল তার কোনো সঠিক সময় জানা নেই। তবে এটি অবশ্যই খ্রিষ্ট জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্বে হতে পারে। ঐতিহাসিকগণের মতে তখন থেকে 'ভূমির উর্বরতা' বিষয়ে মানুষের ধারণা জন্মেছিল। ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী মেসোপোটেমিয়া এলাকার মৃত্তিকার উর্বরতা বেশি ছিল বলে তখনই মানুষ তা জানতো। গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের ভ্রমণ কাহিনীতে মেসোপোটেমিয়া এলাকার ফসল উৎপাদন ও উর্বরতার বিষয় উল্লেখ আছে। খ্রিষ্ট জন্মের প্রায় ৩০০ বছর আগে 'থিওফ্রাসটাস' এর লেখায় উল্লেখ আছে টাইগ্রিস অববাহিকার জমিতে পানি প্রবেশের সুযোগ দিলে ও আটকে রাখলে পলি পতনে ভূমির উর্বরতা বাড়তো এবং ফসলের ফলন বাড়তো। অনেক প্রাচীন লেখায় জৈব সার ও পশু-মলের উল্লেখ আছে।

এলিসের কিংবদন্তী রাজা অগিয়াসের ৩০০০টি গবাদি পশুর একটি গোয়াল ঘর ছিল যা ৩০ বছর যাবৎ পরিষ্কার করা হচ্ছিল না। রাজা অগিয়াস তখন হারকিউলিসের সাথে চুক্তি করলো যে, হারকিউলিস যদি এই গোবর সরিয়ে দেয় তবে তাকে ৩০০টি গরু দিয়ে দেওয়া হবে। কথা মতো হারকিউলিস গোবর তুলে নিয়ে জমিতে প্রয়োগ করে। এতে ফসলের ফলন বেড়ে গিয়েছিল।

অন্ধ কবি হোমার তথা ওডিসি কবিতার পটভূমিতে উল্লেখ আছে যে, তাঁর বাবার আঙুর বাগান ও কুঞ্জবনে জৈব সার ব্যবহার করা হতো। এটি খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৯০০-৭০০ বছরের কথা। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৭২-২৪৭ সময়ে থিওফ্রাসটাসের সুপারিশে উল্লেখ ছিল যে, উর্বর জমিতে জৈব সার ও সবুজ সার প্রয়োগ কম করতে হবে এবং গোয়াল ঘরে খড় বিছিয়ে দিতে হবে যাতে পশুর মল-মূত্র তাতে শোষিত হয়। তখন এথেন্সের বিভিন্ন বাগানে নিয়মিত শহর সিউয়েজ ব্যবহার করা হতো। আরও বিশ্বাস করা হয় যে, তখন সিউয়েজ সার হিসেবে কৃষকের নিকট বিক্রি করা হতো। থিওফ্রাসটাসের অভিমত ছিল যে, মনুষ্য মল সবচেয়ে ভাল সার। অবশ্য পরে প্রাচীন রোমান কৃষি লেখক ভ্যারোর লেখায় হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ভাল সার হিসেবে উল্লেখ আছে। প্রাচীন সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাসে এভাবে জমিতে সার ব্যবহার স্বীকৃত হয়েছিল। সেই জৈব সার বর্তমানে রাসায়নিক সারে উন্নীত হয়েছে। 'সার ব্যবস্থাপনা' একটি সুশৃংখল বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। সার ব্যবহারের এসব গুরুত্ব সম্পর্কে ওমর খৈয়াম, ভার্জিল, বাইবেল, জেনোফন, প্লিনি প্রমুখের লেখায় বিস্তর উল্লেখ ছিল। সারা বিশ্বের অনুরূপ বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনেও

সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান শতকের শুরুতেই স্বীকৃত হয়। তখন দেশে জৈব সার হিসেবে গোবর ও কম্পোস্ট ব্যবহারের উপর ব্যাপক সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়। রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু হয় মূলত ষাটের দশকে। অর্থকরী ফসল ও ধানের জমিতে সীমিত পরিমাণ ইউরিয়া ও এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগের মাধ্যমে এই যাত্রা শুরু হয়। তখন এদেশের মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্বরতা কমে যাওয়ায় সারের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য Soil Fertility and Soil Testing Institute (SFSTI) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশে আশির দশক থেকে অত্যন্ত দ্রুত হারে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়তে থাকে (সারণি ১)।

বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের নেতৃত্বে সারা দেশে বিভিন্ন ফসলে ব্যবহারের জন্য সার ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বিতরণ করা হচ্ছে। এদেশে বর্তমানে বিভিন্ন ফসলে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১৩ ধরনের সার দ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সারগুলো হচ্ছে ১. ইউরিয়া, ২. এমোনিয়াম সালফেট, ৩. ট্রিপল সুপার ফসফেট ৪. সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ৫. ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট, ৬. মিউরেট অব পটাশ ৭. পটাশিয়াম সালফেট ৮. জিপসাম ৯. জিঙ্ক সালফেট ১০. জিঙ্ক অক্সিক্লোরাইড ১১. বোরাক্স ১২. গৌণ উপাদান সার এবং ১৩. বিভিন্ন সুষম সার। এসব সার যতো বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করা হবে, সার ব্যবহারে দিনে দিনে ততো সফলতা আসবে। এই গ্রন্থটি তাই এদেশে মাঠ পর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সার ব্যবহার বিষয়টি সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। মৃত্তিকা, সার ও পরিবেশ

কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মৃত্তিকাতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহকল্পে সার ব্যবহারের বিষয়টি সকল যুগের চেয়ে বর্তমানে অধিকতর স্বীকৃত হয়েছে। কৃষকের মূল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ফসল থেকে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় ফলন পাওয়া। সে জন্যই মৃত্তিকাতে সার প্রয়োগ করা দরকার। সার একটি রাসায়নিক দ্রব্য। জমিতে এর ব্যবহার সঠিক না হলে একদিকে উচ্চ ফলন পাওয়া যায় না, অন্যদিকে পরিবেশ বিনষ্ট হয়। তাই সার ব্যবহার নির্বিঘ্ন করার জন্য সারা বিশ্বে সার ব্যবহার প্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণা চলছে। বিভিন্ন হিসেবে দেখা যায়, সারা বিশ্বে ১৯০০ সালের পূর্ববর্তী সময়ে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কেবল আবাদী জমির পরিমাণ সম্প্রসারিত হয়েছে। সার ব্যবহার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। কিন্তু ক্রমান্বয়ে কৃষি জমির পরিমাণ কমতে থাকায়, সীমিত জমিতে অধিক ফলন প্রাপ্তির পদক্ষেপ হিসেবে সারের ব্যবহার বাড়তে থাকে। নিচের সারণিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের পরিমাণ উপস্থাপিত হলো।

সারণি ১ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের পরিমাণ

সাল	পুষ্টি উপাদান/সার (হাজার টন)			
	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ	মোট
১৯৪৯-৫০	৯৫৬	১৯৩০	১০৭০	৩৯৫৬
১৯৬৪-৬৫	৪৬০৫	৩৭৮৫	২৪২৪	১১২১৮
১৯৭২-৭৩	৪৩৩৯	৫০৭২	৪৪১২	১৩৮২৩
১৯৮১-৮২	১১০৭৯	৪৮১৮	৫৬১৪	২১৫১১

সারণি ১ থেকে জানা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৫ গুণ এবং নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় সাড়ে ১১ গুণ। বর্তমানে সারের ব্যবহার যে বেড়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। সার ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টি সারা বিশ্বের জন্যই সত্য। নিচে কানাডায় ব্যবহৃত সারের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করা হলো।

সারণি ২ : আশির দশকে কানাডায় ব্যবহৃত সারের পরিমাণ

সাল	পুষ্টি উপাদান/সার (হাজার টন)			
	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ	মোট
১৯৫৮–৫৯	৬২	১৪৫	৮৮	২৯৫
১৯৬৪–৬৫	১৭১	২৬৭	১২৩	৫৬১
১৯৭২–৭৩	৪১০	৪১৫	১৯১	১০১৬
১৯৮১–৮২	৯৫০	৫৮৪	৩৫৫	১৮৮৯

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, কানাডায় ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সারের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৬ গুণ। এই সময়ের মধ্যে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় সাড়ে ১৫ গুণ। সার ব্যবহারের বৃদ্ধি হার অব্যাহত রয়েছে।

সার ব্যবহার সারা বিশ্বেই বেড়েছে এবং বাড়ছে। অধিক ফলন প্রাপ্তির জন্যই সারের ব্যবহার বাড়াতে হয়েছে। নিচের সারণিতে বিশ্বের কয়েকটি দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে ব্যবহৃত সারের পরিমাণ উপস্থাপিত হলো।

সারণি ৩ : বিশ্বের কয়েকটি দেশে ব্যবহৃত সারের পরিমাণ

দেশের নাম	সারের পরিমাণ ($N+P_2O_5+K_2O$) (কেজি/হেক্টর)	মাথাপিছু পরিমাণ (কেজি)
যুক্তরাষ্ট্র	১১২	৯৩
সাবেক সাভিয়েত ইউনিয়ন	৮১	৭০
বেলজিয়াম	৫০০	৪৩
ফ্রান্স	৩০১	১০৪
পূর্ব জার্মানি	৩২৫	৯৮
পশ্চিম জার্মানি	৪৭২	৫৭
গ্রিস	১৩৪	৫৫
নেদারল্যান্ড	৭৮৮	৩৭
যুক্তরাজ্য	২৯৪	৩৭
কানাডা	৪২	৮০
ব্রাজিল	৬৮	৩৪
পেরু	৩২	৬
মেক্সিকো	৫২	১৭
চীন	১৫৫	১৫

ভারত	৩২	৮
জাপান	৩৭২	১৫
তুরস্ক	৪১	২৬
আলজেরিয়া	৩২	১৩
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭০	৩৬
মিশর	২৩৩	১৬
অস্ট্রেলিয়া	২৮	৮৫
নিউজিল্যান্ড	১০১৭	৮৪
বাংলাদেশ	১০৪	১৩

উৎস : Fertilizer Year Book, Vol. 31 (FAO ১৯৮৫)

সারা বিশ্বে সারের ব্যবহার বাড়ছে। কৃষি উৎপাদন ঠিক রাখা এবং বাড়ানোর জন্য দিনে দিনে এই সারের ব্যবহার বাড়বে। কৃষি উৎপাদনের জন্য সার ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় ফসল পরিচর্যা বা ব্যবস্থাপনা বলতে প্রথমেই আসে সারের কথা। তারপর সার ব্যবহারের মাত্রা অনুসারে নির্ধারিত হয় অন্যান্য পরিচর্যার প্রতিপালন। সার না দেওয়া জমিতে কেউ উন্নত পরিচর্যা করতে চায় না বা পরিচর্যা করে পোষায় না।

বর্তমানে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে সার ব্যবহারের অনুপাত নিম্নরূপ–

সারণি ৪ : উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ব্যবহৃত সারের অনুপাত

দেশ	সারের পরিমাণ (অনুপাত)		
	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ (K_2O)
উন্নত দেশ	১০০	৬২	৫৭
উন্নয়নশীল দেশ	১০০	৩৮	১৬

এই সারণি দেখে বোঝা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে সার ব্যবহার অনুপাতে সুষমতা কম।

জমিতে ব্যবহৃত সারের অনুপাত সুষম না হলে সময়ের ব্যবধানে মৃত্তিকার উর্বরতার অবক্ষয় ঘটে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য মৃত্তিকা ও সার ব্যবহারে সমন্বয়সাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি ৫ : বিশ্বে সার ব্যবহারের ধারা

বছর	সারের পরিমাণ (লক্ষ টন)			
	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ	মোট
১৯১৩	১৩	৮	৭	২৮
১৯৩৯	২৩	১৫	২০	৫৮
১৯৫০	৪১	২৫	৩৫	১০১
১৯৫৫	৬১	৩৩	৫৭	১৫১

১৯৬০	১০৪	৪৩	৭৩	২২০
১৯৬৫	১৭৪	৫৯	১০১	৩৩৪
১৯৭০	৩০২	৮৩	১৩৯	৫২৪
১৯৭৫	৪২৩	১১০	১৯৮	৭৩১
১৯৮০	৫৭২	১৩০	২২৬	৯২৮
১৯৮৫	৭৩০	১৬২	২৮৪	১১৭৬
১৯৯০	৯২৮	১৯৫	৩৪৯	১৪৭২
১৯৯৫	১১৫০	২৩৩	৪২২	১৮০৫
২০০০	১৩৯৬	২৭৪	৫০২	২১৭২
গড়	৪৫৫	১০৫	১৮৬	৭৪৬
অনুপাত	১০০	২৩	৫৬	

* উৎস FAO, UNDP Estimate & Projection ১৯৯২ এর ভিত্তিতে প্রণীত।

৩। নাইট্রোজেন সার ও পরিবেশ রক্ষা

নিচের সারণি থেকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে কৃষি উৎপাদন হার ঠিক রাখার জন্য মৃত্তিকাতে অন্যান্য রাসায়নিক সারের চেয়ে নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সারের ব্যবহার ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আড়াই গুণেরও বেশি হারে ব্যবহার করতে হয়েছে। ধারণা করা যায় আগামী ২০০০ সাল নাগাদ একই হারে বৃদ্ধি পাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরিবেশের বিবেচনার নাইট্রোজেনঘটিত সার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকা, মৃত্তিকা পানি ও অণুজৈবিক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ উপাদান নাইট্রোজেন সার দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হয়। বর্তমানের এইসার ব্যবহার ধারা পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই বিবেচনার বিষয়।

সারণি ৬ : বিশ্বে ফসফেট ও পটাশের তুলনায় নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের অনুপাত (FAO, UNDP, ১৯৮৫)

বছর	ফসফেট ও পটাশের গড় ব্যবহার সূচক	নাইট্রোজেনের ব্যবহার	বৃদ্ধি হার (%)
১৯৩৯–১৯৫৫	১০০	১৩৪	১০০
১৯৬০–১৯৭০	১০০	২২৩	১৬৬
১৯৭৫–১৯৮৫	১০০	৩০৮	২৩০
১৯৯০–২০০০	১০০	৩৫১	২৬২

বাংলাদেশে সারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। সারণি ৭ থেকে সার ব্যবহারের ধারা বোঝা যাবে।

সারণি ৭ : বাংলাদেশে ব্যবহৃত সারের পরিমাণ (হাজার টন) BBS, ১৯৯৪ (সমাঙ্ক পরিমাণ)

বছর	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	অন্যান্য	মোট
১৯৮৮–৮৯	১১৩৫	৪১৬	৯৪	১৩	১৬৫৮
১৯৮৯–৯০	১৩৬৭	৪৮১	১১৯	২৭	১৯৯৪
১৯৯০–৯১	১৩২৩	৫১৪	১৪৭	২৯	২০১৩
১৯৯১–৯২	১৫৩২	৪৫৭	১৩৬	৩২	২১৫৭
১৯৯২–৯৩	১৫৬৮	৪৫৫	১২০	১৩০	২২৭৩
১৯৯৩–৯৪	১৬৩০	৩২০	১১০	১৭০	২২২৯

বাংলাদেশে সারের ব্যবহার শুরু হয় মূলত পঞ্চাশ দশকে। তবে ষাটের দশক থেকে তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে ইউরিয়া সারের ব্যবহার খুবই দ্রুত বাড়ে, এখনো বাড়ছে। ফলে সারের ব্যবহার মাত্রার বা অনুপাতে সুষমতা বিঘ্নিত হয়।
নিচে বিভিন্ন বছরে ব্যবহৃতে সারের অনুপাত উল্লেখ করা হলো।

সারণি ৮ : বাংলাদেশে ব্যবহৃত সারের অনুপাত (BBS) ১৯৯৪ (সমাঙ্ক পরিমাণ)

বছর	নাইট্রোজন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ (K_2O)
১৯৮৮–৮৯	১০০	৩৭	১১
১৯৮৯–৯০	১০০	৩৫	১২
১৯৯০–৯১	১০০	৩৯	১৫
১৯৯১–৯২	১০০	৩০	১২
১৯৯২–৯৩	১০০	৩০	১১

সারা বিশ্বেই সার ব্যবহার নিয়ে গবেষণা এবং উন্নয়ন চলছে। পরিমাণের দিক থেকে প্রতি হেক্টর জমিতে জাপানে সার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও চীন। ভারত ও বাংলাদেশে সারের ব্যবহার এখনো কম। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সার ব্যবহারের কার্যকারিতা বাড়ানো হয়েছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ সালে ১ কেজি সারে ৯ কেজি ফসল উৎপাদন হতো। এই উৎপাদন ১৯৯০ সালে ৯ কেজি থেকে ৩৬ কেজিতে দাঁড়িয়েছে। চীন, জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স সব দেশেই প্রতি কেজি সারে ফলন কম-বেশি বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে তা ২৫ কেজি থেকে কমে গিয়ে ১২ কেজিতে নেমে গেছে। অর্থাৎ সারের অবক্ষয় বেড়ে গেছে (BBS, ১৯৯৪)। সার একটি রাসায়নিক দ্রব্য। মৃত্তিকাতে ব্যবহার করার পর এই সার গাছ কর্তৃক সময়মতো পরিশোষিত না হলে এর অপচয় হয়। এই সার মৃত্তিকা ও নদী-নালা-হাওড়ের পানিতে মিশে গিয়ে জৈব পরিবেশ বিঘ্নিত করে। তাই বলা যায় সার ব্যবহার বিষয়টি সার্বিকভাবে পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি ৯ : বিশ্বের কয়েকটি দেশে সার ব্যবহার, সারের কার্যকারিতা ও ফসল উৎপাদন

দেশ	সার ব্যবহার (কেজি/হেক্টর/বছর)		সারের কার্যকারিতা (কেজি সার/কেজি উপাদান)		
	১৯৬০	১৯৯০	১৯৬০	১৯৯০	১৯৯২
বাংলাদেশ	৪	১০৪	২৫	১২	১২
চীন	২৫	১৮০	১১	১৩	১৪
ভারত	২৫	৮০	১১	৯	১০
জাপান	২৭০	৪০০	৮	১০	১১
যুক্তরাষ্ট্র	৪০	১০০	৯	৩৬	৩৯
যুক্তরাজ্য	৮০	৩৮০	১৩	১৪	১৫
ফ্রান্স	১০০	৩৮০	৯	১২	১৩

উৎস : FAO, UNDP, ১৯৯৪.

৪। সার ও সারের কাজ

সংক্ষেপে জমিতে ফসল উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের অভাব বা ঘাটতি হলে বা আশংকা থাকলে তা পরিপূরণের জন্য যেসব দ্রব্য প্রয়োগ করা হয় তাকে সার বলে। তবে সারের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদান সরবরাহের জন্য মৃত্তিকাতে যে সকল প্রাকৃতিক দ্রব্য বা কল-কারখানায় প্রস্তুত অজৈব বা জৈব দ্রব্য জমিতে প্রয়োগ করা হয় তাকে সার বলে। অবশ্য মৃত্তিকা পরিশোধনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মৃত্তিকার অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব দূরীকরণের জন্য কোনো দ্রব্য প্রয়োগ করা হলে তা সাধারণত প্রকৃত সার দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হয় না। উদ্ভিদ তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য মৃত্তিকা থেকে কমপক্ষে ১৪টি পুষ্টি উপাদান পরিশোষণ করে। প্রত্যেক উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক উপাদানের পরিমাণ এবং উপাদানসমূহের পারস্পরিক অনুপাত ফসলে প্রজাতি বিশেষে ভিন্ন। যে মৃত্তিকাতে কোনো উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানসমূহ কাঙ্খিত অনুপাতে থাকে না সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে সার প্রয়োগের মাধ্যমে অনুপাতে সুষমতা আনয়ন করা হয়। এতে ফসলের উচ্চ ফলন নিশ্চিত হয়।

গাছের অত্যাবশ্যক মৃত্তিকাস্থ পুষ্টি উপাদানের নাম

মুখ্য উপাদান	গৌণ উপাদান
নাইট্রোজেন	লোহা
ফসফরাস	জৈব ম্যাঙ্গানিজ
পটাশিয়াম	জিঙ্ক বা দস্তা
ক্যালসিয়াম	বোরন
ম্যাগনেশিয়াম	মলিবডেনাম
সালফার বা গন্ধক	কপার বা তামা ক্লোরিন কোবাল্ট

সারের কাজ

সারের সংজ্ঞা থেকে এর কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যাহোক, এখানে সারের বিস্তারিত কার্যাবলী উল্লেখ করা হলো।

১. **মৃত্তিকাতে উদ্ভিদ পুষ্টির ঘাটতি উপাদান সরবরাহ করা :** কোনো মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেন বা ফসফরাসের ঘাটতি থাকলে তা ইউরিয়া বা টিএসপি সার প্রয়োগ করে পূরণ করা যায়।

২. **সামগ্রিকভাবে মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদান সরবরাহ বৃদ্ধি করা :** কোনো জমিতে সার প্রয়োগ করা হলে সার্বিকভাবে মৃত্তিকার পুষ্টি সরবরাহ ক্ষমতা বাড়ে।

৩. **ভূমির উর্বরতা বাড়ানো :** কোনো মৃত্তিকার উর্বরতা মান কম হলে বা মধ্যম হলে সার প্রয়োগের মাধ্যমে এর উর্বরতা মান উচ্চ পর্যায়ে উন্নত করা যায়।

৪. **ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ করা :** পরপর ফসল উৎপাদনের ফলে উদ্ভিদ কর্তৃক পুষ্টি শোষণের ফলে অধিক উর্বর মৃত্তিকার উর্বরতা মানও দিনে দিনে কমে যায়। কিন্তু এসব জমিতে সঠিকভাবে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকার বিদ্যমান উর্বরতা মান সংরক্ষিত হয়।

৫. **ভূমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় :** মাটিতে সার প্রয়োগের ফলে ফসলের উৎপাদন বাড়ে। এইভাবে অর্থাৎ ফসল উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে ভূমির মোট বা বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে।

৬. **মৃত্তিকা দ্রবণ ও ভৌত গুণাবলী উন্নত করে :** সার প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকার দ্রবণের ভারসাম্য ঠিক থাকে। জৈব সার, টিএসপি প্রভৃতি সার মৃত্তিকার ভৌত গুণাবলী যথা সংযুতি উন্নত করে।

সার ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য জমিতে উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদানসমূহ সরবরাহ করা। এসব পুষ্টি উপাদান গাছে সুনির্দিষ্ট কাজ করে গাছে পুষ্টিসাধন ঘটায়।

গাছের কোনো পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে গাছের পাতা, শিকড়, ফুলে ও ফলে নির্দিষ্ট ধরনের উপসর্গ বা অপুষ্টি লক্ষণ দেখায়। তাই গাছে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিজনিত লক্ষণ দেখেও সার দ্রব্য ব্যবহার করা যায়।

এই অধ্যায়ে গাছে সার হিসেবে প্রদত্ত পুষ্টি উপাদানের প্রধান প্রধান কাজ ও এদের ঘাটতিতে প্রদর্শিত প্রধান প্রধান উপসর্গ চিত্রসহ (চিত্র ১ থেকে ৬১) উল্লেখ করা হলো।

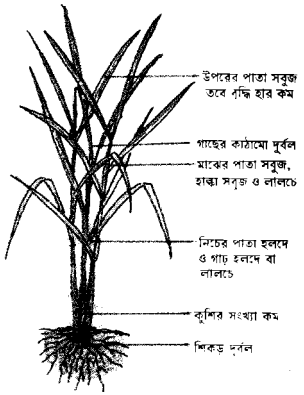

চিত্র ১ : ধান গাছে নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ

ধান গাছে নাইট্রোজেনের প্রধান কাজ

- ❒ দ্রুত বৃদ্ধি হার নিশ্চিত করা
- ❒ সকল পাতা সবুজ রাখা
- ❒ গাছের কাঠামো বড় করা
- ❒ অল্প সময়ে কুশির সংখ্যা বাড়ানো
- ❒ শিকড় বিস্তার ঘটানো।

চিত্র ২ : বড় পাতাবিশিষ্ট গাছের পাতায় নাইট্রোজেন ঘাটতির লক্ষণ

বড় পাতাসম্পন্ন গাছে নাইট্রোজেনের কাজ

- ❒ পাতা দ্রুত বড় করা
- ❒ পাতার রঙ সবুজ রাখা
- ❒ পাতার সংখ্যা বাড়ানো
- ❒ চারা অল্প সময়ে বড় করা।

Dhaka

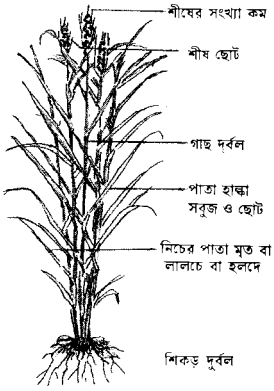

চিত্র ৩ (ক) : গম গাছে নাইট্রোজেনের ঘাটতির লক্ষণ

গম গাছে নাইট্রোজেনের প্রধান কাজ

- ❒ গাছ দ্রুত বড় করা
- ❒ কুশি ও শীষের সংখ্যা বাড়ানো
- ❒ পাতা বড় করা
- ❒ পাতা সবুজ রাখা
- ❒ শিকড় বিস্তার বাড়ানো।

চিত্র ৩ (খ) : গম গাছে নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ নাইট্রোজেন ঘাটতির শুরুতেই গাছের নিচের পাতা হলদে হয়ে যেতে থাকে
- ❒ পাতার হলদে হওয়া লক্ষণ দ্রুত উপরে উঠতে থাকে
- ❒ গাছের পাতা ও কাণ্ড চিকন হয়ে যায়
- ❒ গাছের বড় বৃদ্ধি হয়ে যায়
- ❒ ফলন খুবই কমে যায়

প্রতিকার : জমিতে নাইট্রোজেন সার (ইউরিয়া) প্রয়োগ করা।

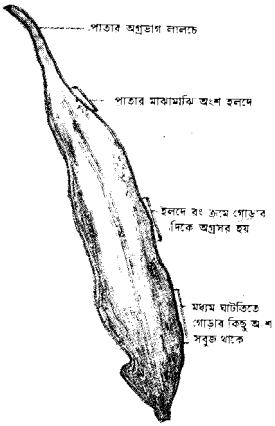

চিত্র ৪ (ক) : ভুট্টা পাতায় নাইট্রোজেনের অপুষ্টি লক্ষণ

ভুট্টা পাতায় নাইট্রোজেনের কাজ

- ❒ পাতা বড় করা
- ❒ পাতার আকার ও আকৃতি স্বাভাবিক রাখা
- ❒ পাতার রঙ সবুজ রাখা
- ❒ পাতা সতেজ ও সবল রাখা।

চিত্র ৪ (খ) : ভুট্টা গাছে নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের গোড়ার পাতার আগে লক্ষণ দেখা দেয়
- ❒ গাছের পাতা শীর্ষ ভাগ থেকে হলদে হতে থাকে
- ❒ গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- ❒ গাছ শীর্ণ দেখায়।

প্রতিকার : জমিতে নাইট্রোজেন সার (ইউরিয়া) প্রয়োগ করা।

চিত্র ৫ : সরগাম গাছে নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের নিচের দিকের পাতা হলদে হয়ে যায়
- ❒ পাতা অগ্রভাগ থেকে হলদে হয়ে গোড়ার দিকে অগ্রসর হয়
- ❒ গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- ❒ গাছ শীর্ণ হয়
- ❒ গাছের উপরের পাতা ক্রমে হলদে হতে থাকে
- ❒ ফলন কমে যায়।

প্রতিকার : জমিতে নাইট্রোজেনজাতীয় সার (ইউরিয়া) প্রয়োগ।

চিত্র ৬ (ক): ভুট্টা পাতায় ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের পাতার শীর্ষে বেগুনি দাগ পড়ে
- ❒ বেগুনি দাগ পাতার শীর্ষ থেকে কিনারা বেয়ে গোড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

(ফসফরাসের অভাবে গাছের পাতায় অ্যান্থোসায়ানিন পিগমেন্ট জমা হয়। অ্যান্থোসায়ানিন পিগমেন্টের বর্ণ নীল। তাই ফসফরাসের অভাবে গাছের পাতা বেগুনি রঙ ধারণ করে)

প্রতিকার : জমিতে ফসফেট সার প্রয়োগ করা।

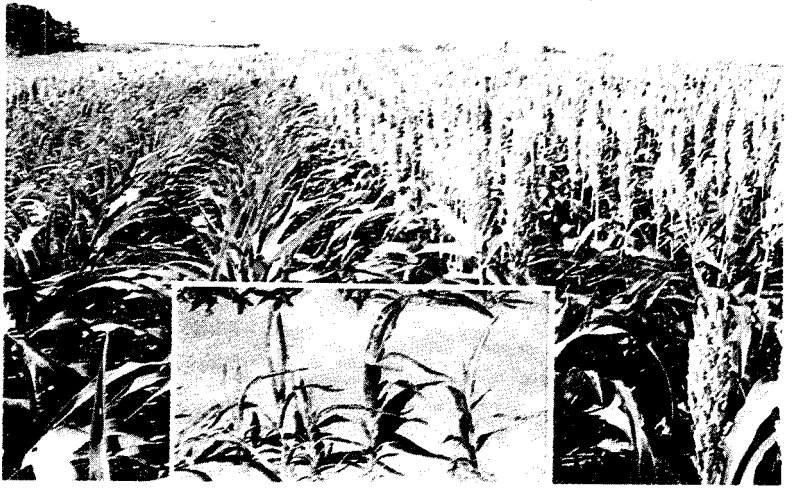

চিত্র ৬ (খ) : ভুট্টা গাছে ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- চারা বয়সে গাছের পাতায় বেগুনি দাগ পড়ে
- গাছের পাতার বর্ণ গাঢ় সবুজ হয়ে থাকে
- ফুল উৎপাদন বিলম্বিত হয়
- গাছের দানার ফলন কম হয়
- গাছের শিকড় দুর্বল থাকে তাই গাছ অনেক সময় হেলে পড়ে যায়
- সরগাম, চিনা, কাউন প্রভৃতি গাছেও ফসফরাসের অভাবে এরূপ লক্ষণ দেখা যায়।

প্রতিকার : জমিতে ফসফেট সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ৭ : আঙুর গাছে ফসফরাস ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের পাতা হলদে দেখায়
- ❒ পাতার শিরাগুলো তত হলদে হয় না
- ❒ পাতা স্থানে স্থানে লালচে হতে থাকে (তবে সে স্থান শুকিয়ে যায় না)
- ❒ ফুলের সংখ্যা কম হয়
- ❒ ফলের সংখ্যা কম হয়
- ❒ ফুল ও ফল উৎপাদনে বিলম্ব হয়
- ❒ ফলের মিষ্টতা ও ফলন খুবই কমে যায়

প্রতিকার : ফসফেটজাতীয় সার প্রয়োগ করা।

BANBEIS Library Dhaka

চিত্র ৮ : গো-মটর গাছে ফসফরাস ঘাটতির লক্ষণ

গোমটর গাছে ফসফরাসের কাজ

- ❒ সময়মতো ফুল ও ফল ধরানো
- ❒ শিকড় শক্তিশালী করা
- ❒ নডিউল উৎপাদন বাড়ানো
- ❒ ফুলের সংখ্যা বাড়ানো
- ❒ ফলের আকার বড় করা।

চিত্র ৯(ক) : ধান গাছে পটাশ ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ ধান গাছের গোড়ার দিকের পাতায় রোগের অনুরূপ দাগ পড়ে।
- ❒ কুশি কম হয়।
- ❒ শিকড়ের পরিমাণ কম, পাতা সরু হয়ে যায়
- ❒ শিকড় গাঢ় তামাটে বর্ণ ধারণ করে
- ❒ গাছ দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়।

প্রতিকার : জমিতে পটাশ সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ৯(খ) : ধানের পাতায় পটাশিয়ামের অভাবজনিত রোগের অনুরূপ লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের পাতায় দাগ পড়ে
- ❒ দাগের আকার ছোট, অনিয়ত
- ❒ দাগের বর্ণ বাদামি
- ❒ পাতার অন্যান্য স্থান হাল্কা হলদে বা সবুজ
- ❒ পাতার শীর্ষে দাগ বেশি
- ❒ পাতার শীর্ষ পুড়ে যাওয়া লক্ষণ

প্রতিকার : সুষমভাবে পটাশ সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ১৩ : ভুট্টা গাছে পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ।

লক্ষণের বিবরণ

- ☐ প্রথমে পাতার কিনারা হলদে হয়
- ☐ তারপর হলদে দাগ কিনারা বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে
- ☐ এর মধ্যে পাতার শীর্ষ ভাগ পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়
- ☐ লক্ষণ সারা পাতায় ছড়িয়ে পড়ে
- ☐ পাতা মরে শুকিয়ে যায়
- ☐ সমগ্র জমি পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়
- ☐ ফলন অনেক কমে যায়।

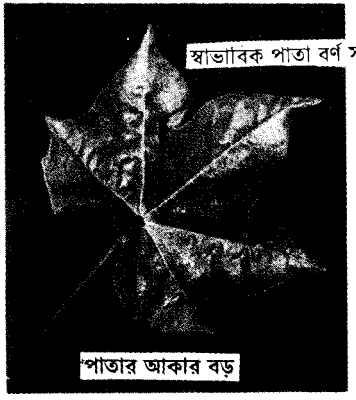

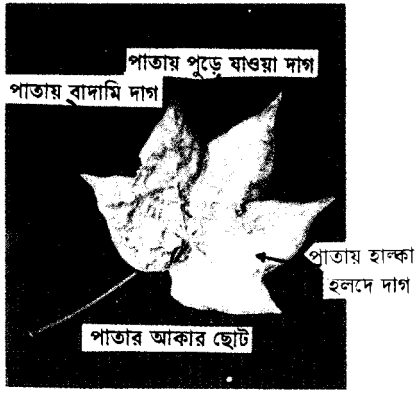

চিত্র ১১ : তুলা পাতায় পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ☐ পাতার আকার ছোট হয়
- ☐ পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়
- ☐ পাতার অন্তঃশিরাস্থান হাল্কা হলদে হয়ে যায়
- ☐ পাতার কিনারায় দাগ পড়ে
- ☐ পাতার কিনারা পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়
- ☐ পাতা ক্রমশ মরে শুকিয়ে যায়

প্রতিকার : জমিতে নিয়মিত সুষমভাবে পটাশ সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ১২ : মিষ্টি আলুর পাতায় পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের পাতায় প্রথমে ছোট ছোট দাগ পড়ে
- ❒ দাগের রঙ প্রথমে হলদে তারপর বাদামি হয়
- ❒ দাগের চারপাশে হলদে হয়ে যায়
- ❒ দাগ ছড়িয়ে পড়লে পাতা পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়
- ❒ পাতার কিনারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- ❒ ফসলের ফলন খুব কমে যায়।

প্রতিকার : জমিতে পটাশ সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ১৩ : চা পাতায় পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ চা গাছের নতুন পাতার বর্ণ হাল্কা হয়
- ❒ নতুন পাতাগুলোর আকার ছোট হয়ে যায়
- ❒ পাতার শীর্ষে ও কিনারায় গাঢ় বাদামি দাগ পড়ে
- ❒ তীব্র ঘাটতি পাতা পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়

প্রতিকার : জমিতে পটাশ সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ১৪ : চীনাবাদাম পাতায় পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ প্রাথমিক লক্ষণ অনেকটা টিক্কা রোগের দাগের মতো
- ❒ গাছের পাতায় গাঢ় বাদামি বর্ণের দাগ পড়ে
- ❒ অভাব বেশি হলে পাতার কিনারা পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়
- ❒ শেষ দিকে পাতা মরে ঝরে পড়ে
- ❒ ফসলের ফলন কমে যায়।

চিত্র ১৫(ক) : নারকেল গাছে পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের নিচের দিকের পাতা হলদে ও বাদামি রঙ ধারণ করে
- আক্রান্ত পাতা মরে শুকিয়ে যায়
- গাছের ফুল ও ফল ঝরে যায়
- এমনকি ফল একটু বড় হওয়ার পরেও ঝরে যায়
- গাছে ফল উৎপাদন খুবই কমে যায়।

প্রতিকার : গাছের গোড়ায় নিয়মিত পটাশ সার ব্যবহার প্রয়োগ করা।

চিত্র ১৫(খ) : নারকেল গাছের পাতায় পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের পাতার সবুজ বর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়
- পাতায় অসংখ্য বাদামি ও লালচে বাদামি দাগ পড়ে
- পাতার শীর্ষ ভাগ পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়
- পাতা চিকন ও দুর্বল হয়
- তীব্র ঘাটতিতে পাতা মরে শুকিয়ে যায়

প্রতিকার : গাছে নিয়মিত পটাশ সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ১৬ (ক) : গোলআলু গাছে পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ প্রথমে গাছে পাতা হলদে হয়ে যায়
- ❒ হলদে পাতা ক্রমে বাদামি বর্ণ ধারণ করে
- ❒ তীব্র ঘাটতিতে গাছ পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়
- ❒ গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- ❒ গাছের ফলন অনেক কমে যায়
- ❒ গাছে অন্যান্য মড়ক রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়।

প্রতিকার : জমিতে সুষমভাবে পটাশ সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ১৬ (খ) : গোল আলুতে পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

গোল আলুতে পটাশিয়ামের প্রধান কাজ

- ❒ পাতা দ্রুত বড় করা
- ❒ শাখা ও পাতা খাড়া ও সবুজ রাখা
- ❒ অতি দ্রুত শিকড় বিস্তার ঘটানো
- ❒ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো
- ❒ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো
- ❒ আলু বড় করা
- ❒ আলুর ফলন বাড়ানো।

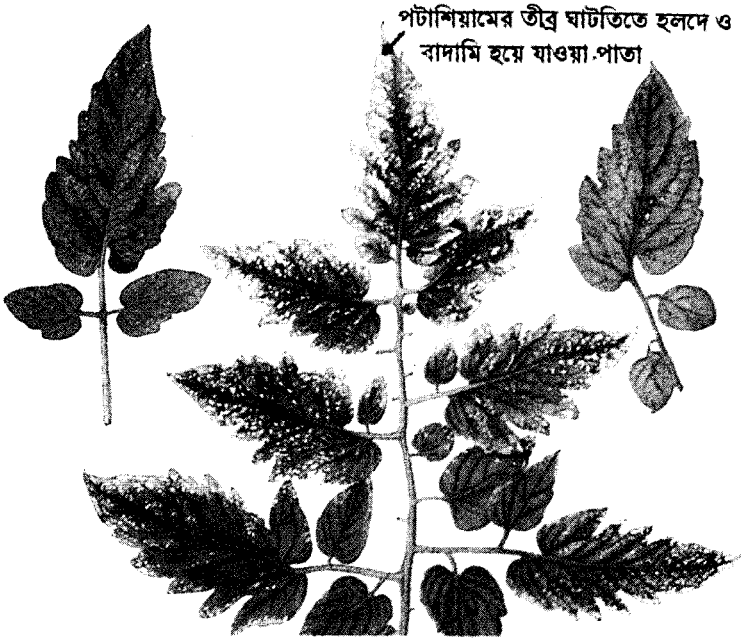

চিত্র ১৭ : টমেটো গাছের পাতায় পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ নিচের দিকের পাতায় প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়
- ❒ পাতার শীর্ষ ও কিনারা হলদে হতে থাকে
- ❒ ক্রমান্বয়ে পাতার শীর্ষ পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়
- ❒ তীব্র ঘাটতিতে সব পাতা হলদে ও বাদামি হতে থাকে
- ❒ শেষ দিকে পাতা মরে শুকিয়ে যায়
- ❒ টমেটোর আকার ছোট হয়, ফলন কম হয়।

প্রতিকার : জমিতে সুষমভাবে পটাশ সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ১৮ (ক) : বাধাকপি গাছে পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ☐ পাতা বিবর্ণ ও ক্লোরোটিক হয়
- ☐ পাতার কিনারায় লালচে বাদামি দাগ পড়ে
- ☐ ক্রমে পাতার কিনার পুড়ে যায়
- ☐ নিচের দিকের পাতা মরে শুকিয়ে যায়
- ☐ পাতার বাঁধন বিলম্বিত হয়

চিত্র ১৮ (খ) : বাঁধাকপি গাছে পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ পাতায় নেক্রোটিক দাগ হয়
- ❒ পাতার শীর্ষদিকে লালচে বাদামি দাগ হয়।

চিত্র ১৯ : সরিষা গাছে পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ পটাশিয়ামের ঘাটতিতে পাতাগুলো প্রথমে গাঢ় সবুজ দেখায়
- ❒ তারপর পাতার কিনারাগুলো কুঁকড়ে যেতে থাকে
- ❒ পাতায় ধূসর হলদে দাগ পড়ে
- ❒ বয়স্ক পাতা শুকিয়ে যায়
- ❒ সরিষা গাছে ফল ও দানা ছোট হয়
- ❒ ফলন কমে যায়।

প্রতিকার : জমিতে পটাশ সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ২২ : পাটের চারা গাছে পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- গাছের পাতা হলদে হতে থাকে
- গাছ ছোট থাকে
- গাছের কাণ্ড চিকন হয়
- ঘাটতি বেশি হলে পাতায় বাদামি দাগ পড়ে
- নিচের পাতা মরে শুকিয়ে যায়
- পাটের ফলন খুবই কমে যায়।

প্রতিকার : জমিতে পটাশ সার প্রয়োগ করা

চিত্র ২৩ : সয়াবিন গাছে পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- পাতার প্রান্ত বরাবর হলদে ক্লোরোসিস হয়
- ঘাটতি বেশি হলে পাতার প্রান্ত পুড়ে যায় এবং শিরাগুলো ফুলে উঠে
- কোন কোন পাতা কুঁকড়ে যায়
- গাছে নডিউলের সংখ্যা খুবই কমে যায়
- গাছে ফলন কম হয়।

প্রতিকার : জমিতে পটাশ সার প্রয়োগ করা

চিত্র ২৪ : কলা গাছে পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- পটাশিয়ামের ঘাটতিতে কলা গাছের পাতায় প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়
- নিচের পাতাগুলো মরে শুকিয়ে যেতে থাকে
- পাতার অগ্রভাগ থেকে পুড়ে যাওয়া লক্ষণ শুরু হয়
- গাছে পাতার সংখ্যা কমে যায়
- গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- কলার ফলন ও মান কমে যায়।

প্রতিকার : জমিতে পটাশ সার দেওয়া।

চিত্র ২৫ : আঙুর গাছে পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছ শীর্ণ হয়
- পাতার কিনারায় মরিচা দাগ পড়ে
- নিচের পাতা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- গাছে নতুন পাতা গজাতে চায় না

প্রতিকার : গাছের গোড়ার মাটিতে এমপি সার ও ছাই প্রয়োগ করা।

চিত্র ২৬ : অয়েল পাম গাছে পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ পটাশিয়ামের সামান্য অভাবেই গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়
- ❒ গাছের পাতায় হলদে ও মরিচা দাগ পড়ে
- ❒ পাতার শীর্ষে পুড়ে যাওয়ার মতো দাগ সৃষ্টি হয়
- ❒ গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- ❒ ফল উৎপাদন হয় না
- ❒ পামওয়েল ছাড়াও বাঁশ, বেত, খেজুর প্রভৃতি গাছে পটাশিয়ামের অভাবে এরূপ লক্ষণ দেখা যায়।

প্রতিকার : পটাশ সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ২৭ : সুগারবিট গাছে পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ প্রথম দিকে পাতার বর্ণ সামান্য গাঢ় হয়ে যায়
- ❒ পাতার আন্তঃশিরাস্থান, অগ্রভাগ ও কিনারায় ক্লোরোসিস দেখা দেয়
- ❒ পাতা কিছুটা কুঞ্চিত হয়ে যায় এবং ভিতরের দিকে কুঞ্চিত হয়ে যায়
- ❒ ক্রমে পাতা শুকিয়ে যেতে থাকে
- ❒ তীব্র ঘাটতিতে পাতা মরে যায়
- ❒ এ অবস্থায় সব জমি পুড়ে যাওয়া লক্ষণ দেখায়।

প্রতিকার : জমিতে সুষমভাবে পটাশিয়াম সার প্রয়োগ করা।

চিত্র ২৮ : ডাল ফসলে ক্যালসিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

ক্যালসিয়ামের কাজ

- ❒ গাছের কুঁড়ি বৃদ্ধি নিশ্চিত করা
- ❒ পত্রকোষ দৃঢ় করা
- ❒ পাতা খাড়া রাখা
- ❒ গাছের কাণ্ড শক্ত রাখা।

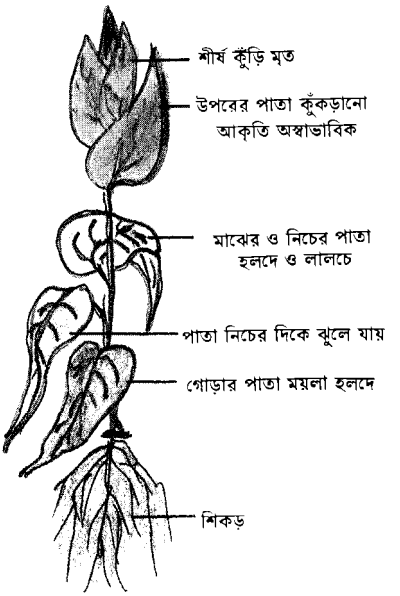

চিত্র ২৯: বড় পাতাবিশিষ্ট গাছে ক্যালসিয়ামের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

বড় পাতাসম্পন্ন গাছে ক্যালসিয়ামের প্রধান কাজ

- চারার কুঁড়ির দ্রুত বর্ধন নিশ্চিত করা
- পাতা বড় করা
- ম্যাগনেশিয়াম সহযোগে পাতার ক্লোরোফিল গঠন
- পাতা সবুজ রাখা
- পাতা খাড়া রাখা
- শিকড় বিস্তার করা
- গাছের মূল কাঠামো তৈরি করা।

চিত্র ৩০ : সুগারবিট গাছে ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের শীষ কুঁড়ি মরে যায়
- গাছ বড় হয় না
- শীর্ষ কুঁড়ির ঠিক নিচের পাতাসমূহের অগ্রভাগ মরে যেতে থাকে
- গাছের পাতা নিচের দিকে কিছুটা ঝুলে পড়ে
- গাছের রঙ কিছুটা সাদাটে দেখায়
- ফলন খুবই কমে যায়।

প্রতিকার : জমিতে চুন প্রয়োগ করা।

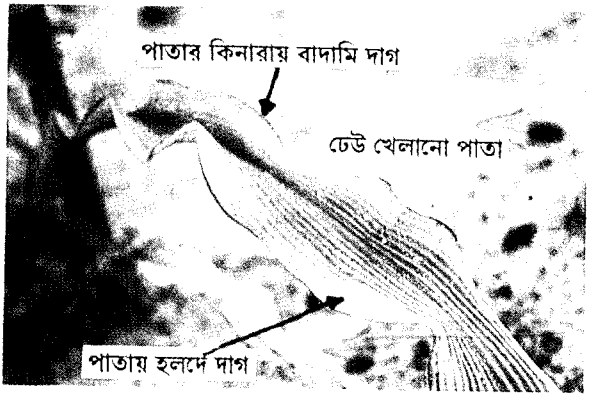

চিত্র ৩১ : ভুট্টা গাছে ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের পাতা অতিরিক্ত ঢেউ খেলানো দেখায়
- পাতার কিনারায় বাদামী দাগ থাকে
- পাতায় হলদে দাগ সৃষ্টি হয়
- পাতার শিরা কিছুটা সবুজ থাকে
- গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- পুরাতন পাতায় লক্ষণ বেশি স্পষ্ট হয়।

প্রতিকার : মাটিতে ডলোমাইট চুন প্রয়োগ প্রয়োগ করা এবং মাটিতে ও গাছে ম্যাগসাল্‌ফ প্রয়োগ করা।

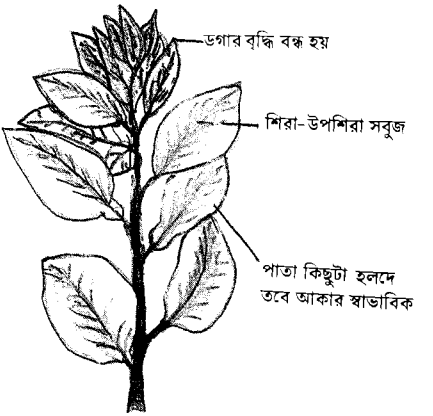

চিত্র ৩২ : কমলা গাছে ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ

কমলা গাছে ম্যাগনেশিয়ামের প্রধান কাজ

- পাতায় অধিক ক্লোরোফিল উৎপাদন
- ফুল ও ফল ধরানো
- ফলের আকার বড় করা
- ফলের মিষ্টতা বাড়ানো
- পাতা সমভাবে সবুজ রাখা
- ফলের অম্লত্ব কমানো
- পাতার আকার বড় করা ও স্বাভাবিক রাখা।

চিত্র ৩৩ : বাতাবী লেবু গাছে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের পাতা ছোট থাকে
- ফলের আকার ছোট হয়
- ফল বড় হওয়ার আগেই পরিপক্কের রঙ ধরে
- পাতায় হলদে দাগ পড়ে
- পাতার শিরা বা অংশবিশেষ সবুজ থাকে।

প্রতিকার : গাছে ম্যাগসালফ বা ম্যাগনেশিয়াম সালফেট স্প্রে করা, গাছের গোড়ায় ডোল মাটি চুন বা ম

চিত্র ৩৪ : মূলা গাছে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের পাতা হলদে হয়ে যেতে থাকে
- পাতার শিরাগুলো কিছুটা সবুজ থাকে
- পাতার আকার আকৃতি স্বাভাবিক থাকে না।

প্রতিকার : মাটিতে ডলোমাইট প্রয়োগ এবং গাছে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট স্প্রে করা।

চিত্র ৩৫ : রেগুন গাছে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়
- গাছের পাতা খুব দুর্বল ও নরম হয়ে যায়
  (ম্যাগনেশিয়াম গাছের পাতায় ক্লোরোফিল তথা সবুজ কণার অংশ। এজন্য ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি হলে পাতার সবুজ রঙ নষ্ট হয়ে যায়)
- নিচের পাতার রঙ আগে বিনষ্ট হয়
- পাতার শিরা কিছুটা সবুজ থাকতে পারে।

প্রতিকার : জমিতে ডলোমাইট চুন বা ম্যাগসালফ প্রয়োগ করা।

চিত্র ৩৬ : লালশাক গাছের ম্যাগনেশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছে দ্রুত ফুল আসে
- গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে হলদে হতে থাকে
- পাতার শিরা ও উপশিরা বাদামি সবুজ বর্ণ ধারণ করে।

প্রতিকার : মাটিতে ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট (ডলোমাইট) বা ম্যাগনেশিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা।

চিত্র ৩৭ : রাবার গাছে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের পাতা ছোট্ট থাকে
- ❒ গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- ❒ গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়
- ❒ পাতার শিরাগুলো কিছুটা সবুজ থাকে
- ❒ তীব্র ঘাটতিতে গাছের পাতা মরতে থাকে।

প্রতিকার : অম্লীয় মাটিতে ডালমাইট চুন ও ম্যাগসালফ প্রয়োগ করা।

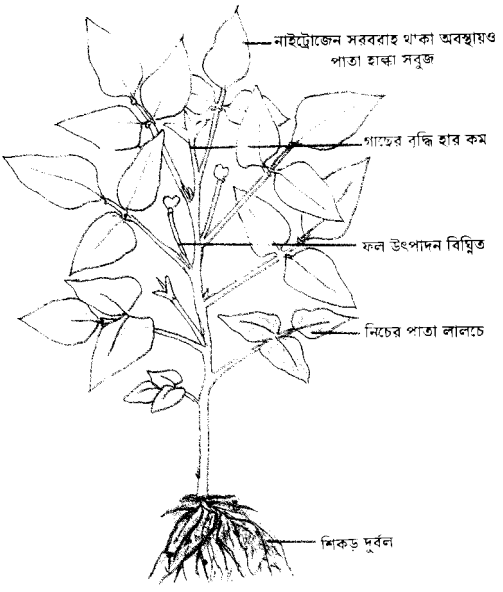

চিত্র ৩৮ : ডাল ফসলে সালফারের অপুষ্টি লক্ষণ।

ডাল ফসলে সালফারের কাজ

- আমিষ উৎপাদন বাড়ানো
- ফুল ও ফলের উৎপাদন বাড়ানো
- দানার মান উন্নয়ন
- গাছ সবুজ রাখা
- নতুন শিকড় বিস্তার ঘটানো
- শিকড়ে নডিউল উৎপাদন বাড়ানো

চিত্র ৩৯(ক) : মাঠে ধানের চারা গাছে সালফারের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের কচি পাতাগুলো হলদে হয়ে যায়
- নিচের দিকের পাতা মরতে থাকে
- গাছে কুশি উৎপাদন কমে যায়
- গাছের পাতায় গোড়ার দিকে সাদাটে দাগ পড়ে

প্রতিকার : জমিতে সালফার সার বা জিপসাম সার প্রয়োগ করা।

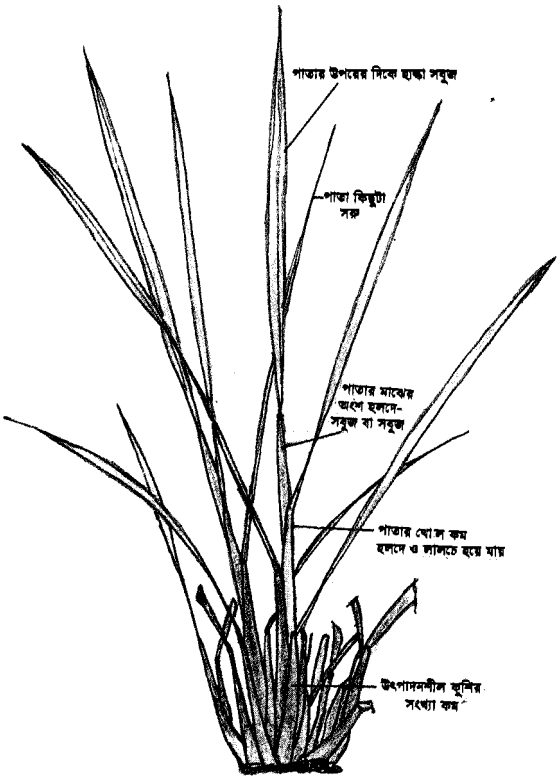

চিত্র ৩৯ (খ) : ধান গাছে সালফার অপুষ্টির লক্ষণ

ধান গাছে সালফারের কাজ

- ❒ সিস্টিন, সিসটেইন ও মেথিওনিন অ্যামাইনো এসিড সমন্বয়ে আমিষ উৎপাদন করা
- ❒ গাছ সবুজ রাখা
- ❒ গাছে কুশি উৎপাদন বাড়ানো
- ❒ ধান গাছের বৃদ্ধি দ্রুত করা
- ❒ ধানের দানার ফলন ও মান বৃদ্ধি করা।

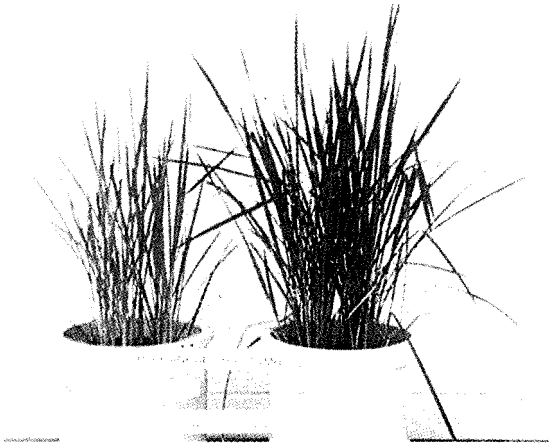

চিত্র ৩৯ (গ) : পটে জন্মানো ধানের চারা গাছে সালফারের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের আকার ছোট
- ❒ সম্পূর্ণ গাছ হাল্কা সবুজ
- ❒ গাছের পাতা ও কাণ্ড দুর্বল
- ❒ গাছে কুশি উৎপাদন বিলম্বিত
- ❒ গাছে কুশির সংখ্যা কম।

(সালফার অভাবসম্পন্ন গাছের পাশে একটি স্বাভাবিক গাছ দেওয়া আছে)

প্রতিকার : জমিতে সালফার সার বা জিপসাম সার প্রয়োগ করা।

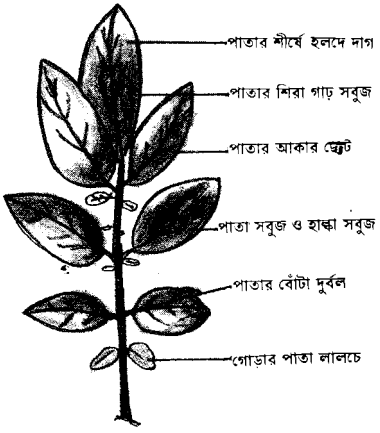

চিত্র ৪০ : গোলআলু গাছে সালফারের অপুষ্টি লক্ষণ

গোলআলুতে সালফারের প্রধান কাজ

- ❒ পাতা সমভাবে সবুজ রাখা
- ❒ পাতা বড় ও সবল রাখা
- ❒ আলুর গুণগত মান উন্নত করা
- ❒ গাছ খাড়া রাখা
- ❒ আমিষ উৎপাদন বাড়ানো
- ❒ আলুর আকার বড় করা
- ❒ আলুর ফলন বাড়ানো।

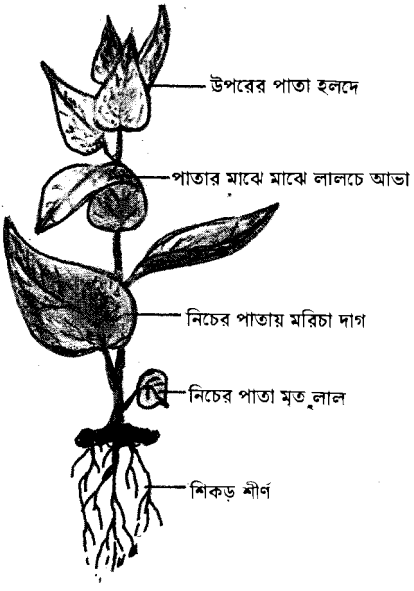

চিত্র ৪১ : বড় পাতাবিশিষ্ট চারা গাছে সালফার ঘাটতির লক্ষণ

বড় পাতাবিশিষ্ট চারা গাছে (উদাহরণ–তামাক)

সালফারের প্রধান কাজ

- ❒ চারা গাছ দ্রুত বড় করা
- ❒ দ্রুত শিকড় বিস্তার ঘটানো
- ❒ সকল পাতা সমভাবে সবুজ রাখা
- ❒ রোগের প্রভাব কমানো
- ❒ শিকড় সবল করা
- ❒ গাছের কাঠামো দৃঢ় করা।

চিত্র ৪২ : ধানের জমিতে সালফার ও দস্তার অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

সালফারের অভাবে

- ❒ সালফারের অভাবে গাছের পাতার রঙ হাল্কা হলদে হয়ে যায়
- ❒ গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

দস্তার অভাবে

- ❒ ধান গাছ স্থানে স্থানে বসে যায়
- ❒ ধানের পাতায় সাদাটে দাগ পড়ে।

প্রতিকার : সালফার : জিপসাম সার প্রয়োগ করা।
দস্তা : জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করা।

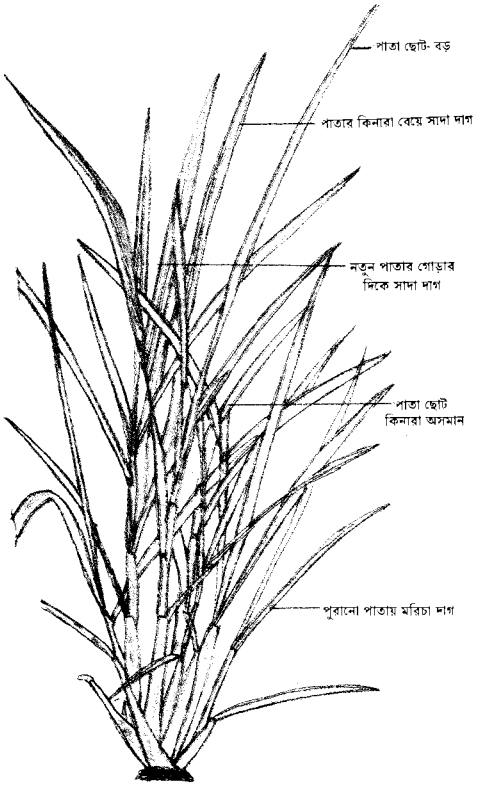

চিত্র ৪৩ : ধানের জমিতে দস্তা ঘাটতির লক্ষণ

ধান গাছে দস্তার কাজ

- গাছের কাঠামোতে সমতা রক্ষণ করা
- গাছের ফসফরাস পুষ্ট নিয়ন্ত্রণ করা
- বিপাকীয় কাজে অনুঘটক হিসেবে কাজ করা
- ধানের পরিপক্কতা ত্বরান্বিত করা
- দানা পরিপুষ্ট করা।

চিত্র ৪৪ : আলুগাছে দস্তা ঘাটতির লক্ষণ

আলু গাছে দস্তার প্রধান কাজ

- ❒ গাছের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করে
- ❒ পাতা দ্রুত বড় করে
- ❒ পাতা সবুজ ও সবল রাখে
- ❒ পাতার শ্বসন হার নিয়ন্ত্রণ করে
- ❒ গাছে রোগাক্রমণ কমায়
- ❒ গাছের কাঠামো শক্ত করে।

আলুগাছে দস্তা ঘাটতির লক্ষণ

চিত্র ৪৫ : লেবু গাছে দস্তা ঘাটতির লক্ষণ

লেবু গাছে দস্তার প্রধান কাজ

- ❒ লেবু গাছে সময় মতো ফুল ও ফল ধরানো
- ❒ ফল নিখুঁত রাখা
- ❒ গাছে, পাতায় ও লেবুতে ক্ষত ও ঘাসজাতীয় রোগ রোধ করা
- ❒ লেবু গাছে পাতা ঝরা বন্ধ করা
- ❒ পাতার সবুজ রঙ ঠিক রাখা
- ❒ কুঁড়ি ও কচি ডগার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

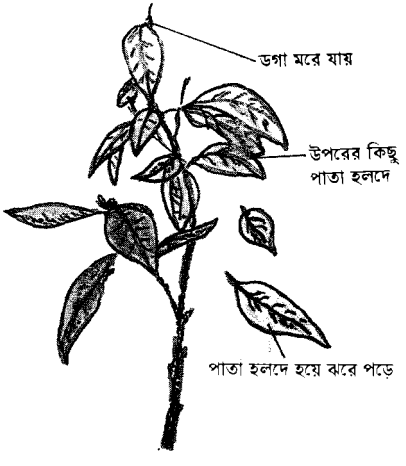

চিত্র ৪৬ : ভুট্টা গাছে দস্তার অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের কচি পাতা বিবর্ণ হয়
- ❒ স্থানে স্থানে কচি পাতা শুকিয়ে যায়
- ❒ গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- ❒ কোনো কোনো কচি পাতার গোড়ায় সাদাটে দাগ পড়ে
- ❒ গাছ দুর্বল দেখায়, পাতা সামান্য নীলাভ সবুজ দেখায়
- ❒ সরগাম, আখ, চিনা, কাউন প্রভৃতি গাছেও একই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়।

প্রতিকার : জমিতে দস্তা সার জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করা।

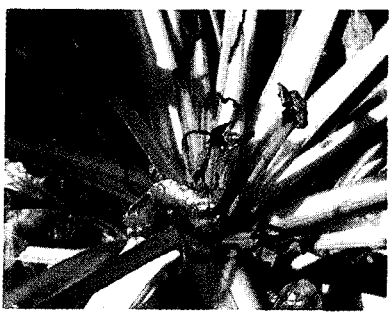

চিত্র ৪৭ : আপেল গাছে লোহার অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ পাতায় ক্লোরোসিস দেখা দেয় অর্থাৎ পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়
- ❒ প্রথমে পাতা আন্তঃশিরাস্থান হাল্কা হলদে হয়, কিন্তু শিরাগুলো সবুজ থাকে
- ❒ লোহার ঘাটতি বেশি হলে সব পাতাই হলদে হয়ে যায়
- ❒ গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- ❒ গাছে ফুল ও ফল ধরে না।

প্রতিকার : গাছে ফেরাস সালফেট দ্রবণ স্প্রে করা।

চিত্র ৪৮ : সরগাম গাছে লোহার অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- ❒ গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়
- ❒ কিছু কিছু শিরা সবুজ থেকে যায়
- ❒ কচি পাতাগুলো খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- ❒ Gramineae গোত্রের অন্যান্য গাছেও লোহার অভাবে এ ধরনের লক্ষণ দেখা যায়।

প্রতিকার : গাছের পাতায় পাতলা ফেরাস সালফেট দ্রবণ স্প্রে করা।

চিত্র ৪৯ : শিম গাছে ম্যাঙ্গানিজ ও লোহা ঘাটতির লক্ষণ

শিম গাছে ম্যাঙ্গানিজ ও লোহার কাজ

- ❒ পাতার শ্বসন হার ঠিক রাখা
- ❒ ক্লোরোফিল গঠনে সহায়তা করা
- ❒ সময় মতো ফুল ও ফল ধরানো
- ❒ গাছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো
- ❒ শিকড় বিস্তার উৎসাহিত করা
- ❒ পাতা ও কাণ্ড শক্ত রাখা।

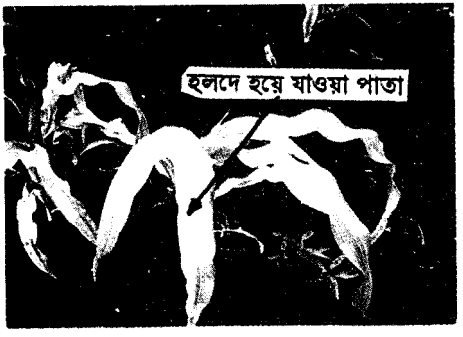

চিত্র ৫০ : ভুট্টা গাছে ম্যাঙ্গানিজের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ভুট্টা গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়
- পাতার শিরাগুলো ঘন সবুজ থাকে
- কচি পাতায় লক্ষণ আগে দেখা দেয়
- ভুট্টা গাছে লোহার অভাবজনিত লক্ষণও একই ধরনের
- Gramineae জাতীয় অন্যান্য গাছেও একই ধরনের লক্ষণ দেখায়।

প্রতিকার : জমিতে ম্যাঙ্গানিজ স্প্রে করা।

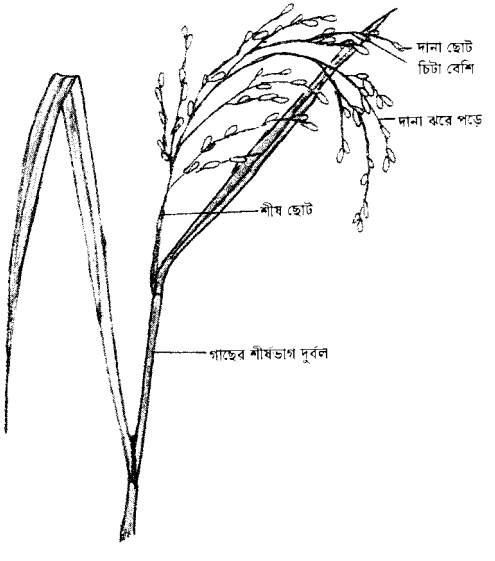

চিত্র ৫১ : ধান গাছে বোরনের ঘাটতির লক্ষণ

ধান গাছে বোরনের প্রধান কাজ

- পরিপুষ্ট ফুল ও দানা উৎপাদন করা
- শীষে চিটা হওয়া বন্ধ করা
- শীষ থেকে ফুল ও দানা ঝরে পড়া বন্ধ করা
- সবুজ গাছে কোষরস ঠিক রাখা
- শীষ পরিপুষ্টি পর্যায় পর্যন্ত পাতা সবুজ রাখা।

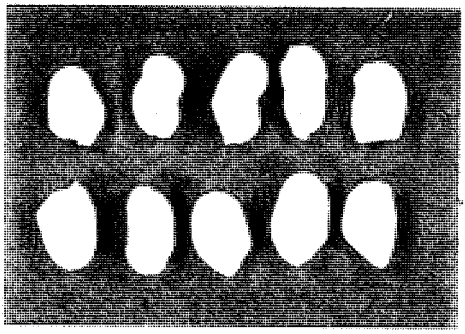

চিত্র ৫২ : চীনাবাদাম গাছে বোরনের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ বোরনের দানায় শূন্য গর্ত (hollow heart) লক্ষণ দেখা যায়
- ❒ দানা ভাঙলে ভিতরে ফাঁপা দেখা যায়
- ❒ দানা ছোট হয়
- ❒ দানার ভিতরে লাল মরিচা দাগ পড়ে
- ❒ দানার শ্বাস নষ্ট হয়
- ❒ দানায় তেলের পরিমাণ কমে যায়।

প্রতিকার : এ ধরনের লক্ষণ দেখা দেওয়া জমিতে বোরন সার দেয়া। গাছে বোরন সার স্প্রে করা।

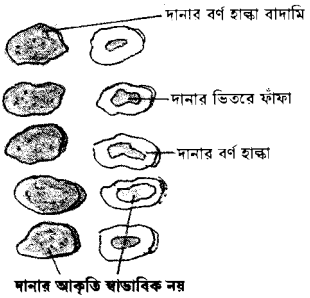

চিত্র ৫৩ : চীনাবাদাম গাছে বোরন ঘাটতির লক্ষণ

চীনাবাদাম গাছের শিকড় ও দানায় বোরনের কাজ

- ❒ দানা পুষ্ট করে
- ❒ দানার মাঝে ফাঁকা হওয়া বন্ধ করে
- ❒ গাছে রোগের প্রকোপ কমায়
- ❒ গাছ সবুজ ও সতেজ রাখে।

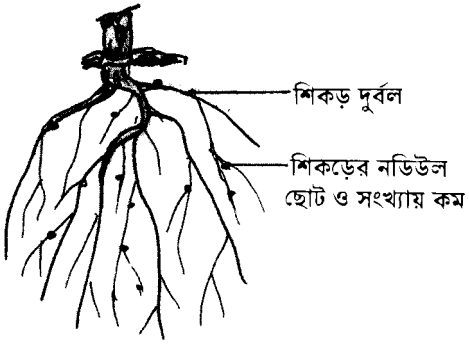

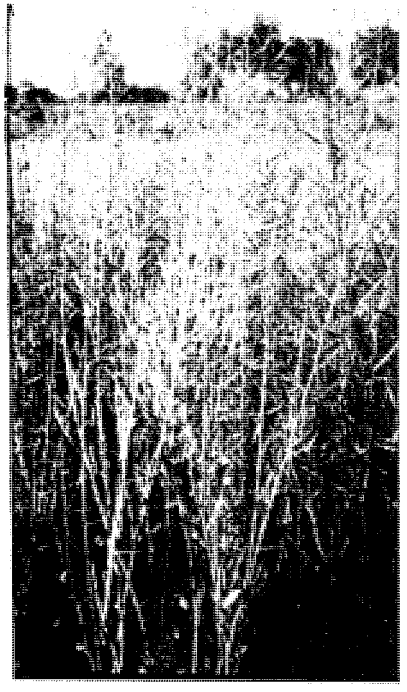

চিত্র ৫৪ : সরিষায় বোরনের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- সরিষা গাছে ফুলের সংখ্যা কম হয়, ফুল ঝরে যায়
- গাছে ফল বা দানা কম হয়
- সরিষার দানা ছোট হয় এবং টিটা বেশি থাকে
- ফল সমভাবে পাকে না।

প্রতিকার : জমি তৈরির সময় বোরন সার প্রয়োগ করা। বাড়ন্ত ফসলের বোরনের অভাব দেখা দিলে গাছে বোরন সার স্প্রে করা।

চিত্র ৫৫ : সূর্যমুখী গাছে বোরনের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
- ফুল উৎপাদন বিলম্বিত হয়
- পাতার আকার বিকৃত হয়
- পাতার কিনারায় দাগ পড়ে।

প্রতিকার : মাটিতে বা গাছে বোরন সার দিলে এই সমস্যা দূর হয়।

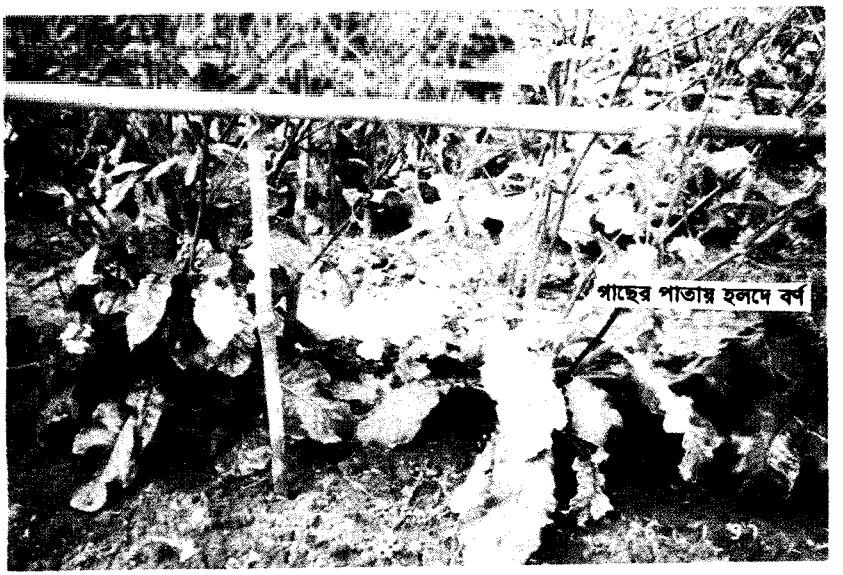

চিত্র ৫৬ : মূলা গাছে বোরন ও ম্যাগনেশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

ম্যাগনেশিয়াম

- গাছের পাতা হলদে বর্ণ ধারণ করে
- গাছের পাতা ছোট হয়
- গাছে পাতার সংখ্যা কম হয়

বোরন

- গাছে ফুলের সংখ্যা কম
- গাছের ফুল ঝরে যায়
- গাছে দানা উৎপাদন কম।

প্রতিকার : ডলোমাইট বা ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট/সালফেট সার প্রয়োগ করা। বোরাক্স সার প্রয়োগ করা।

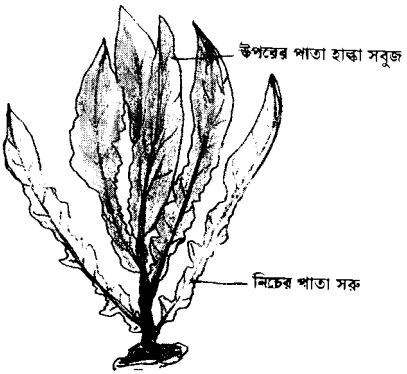

চিত্র ৫৭ (ক) : কপিজাতীয় গাছে মলিবডেনামের অপুষ্টি লক্ষণ

কপিজাতীয় গাছে মলিবডেনামের প্রধান কাজ

- পাতা বড় ও প্রশস্ত করা
- হুইপটেইল (whiptail) রোগ রোধ করা
- বাঁধাকপি বাঁধতে সহায়তা করা
- ফুলকপির ফুল বড় করা
- শিকড় বিস্তার করা
- পাতা ঘন সবুজ রাখা।

চিত্র ৫৭ (খ) : ফুলকপি গাছে মলিবডেনামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
- পাতার আকার অস্বাভাবিক হয়ে যায় (হুইপটেইল লক্ষণ)
- পাতা হলদে হয়ে যায়
- ফুল উৎপাদন বিলম্বিত হয়
- সরিষা, বাঁধাকপি ও সূর্যমুখী গাছে একই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়।

প্রতিকার :

১. জমিতে লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে মলিবডেনাম সার স্প্রে করা।

২. অম্লীয় মাটিতে মলিবডেনাম সার দেওয়া।

চিত্র ৫৮ : সয়াবিন গাছে মলিবডেনামের অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- ❒ গাছের পাতা হাল্কা সবুজ থাকে
- ❒ গাছ আকারে ছোট হয়
- ❒ গাছের পাতা ছোট থাকে
- ❒ গাছে ফল উৎপাদন কম হয়
- ❒ শিকড়ে নডুলের সংখ্যা কম থাকে
- ❒ সয়াবিনের ফলন অনেক কম হয়।

প্রতিকার : ১. গাছে মলিবডেনাম সার স্প্রে করা
২. অম্লীয় মাটিতে জমিতে মলিবডেনাম সার দেওয়া
৩. বীজের সাথে মলিবডেনাম সার মিশিয়ে প্রয়োগ করা।

চিত্র ৫৯ : লেবু গাছে তামার ঘাটতির লক্ষণ

লেবু গাছে তামার প্রধান কাজ

- ❒ গাছের কুঁড়ির বৃদ্ধি নিশ্চিত করা
- ❒ গাছে রোগের আক্রমণ কমানো
- ❒ গাছে ডাইব্যাক (Dieback) রোগ প্রতিরোধ করা
- ❒ লেবুর ক্ষত ও পচন রোধ করা
- ❒ গাছের পাতা সমভাবে সবুজ রাখা
- ❒ গাছের কাঠামো শক্ত করা।

চিত্র ৬০ : কমলা গাছে তামার অভাবজনিত লক্ষণ

লক্ষণের বিবরণ

- গাছের কচি ডগা মরে যায়। একে ডাইব্যাক রোগ বলে
- পাতার রঙ গাঢ় সবুজ হয়ে যায়
- ফলের আকার আকৃতি বিনষ্ট হয়
- ফলের গায়ে কালচে বাদামি দাগ পড়ে
- তীব্র ঘাটতিতে ফলে পচন ধরে
- লেবু বা সাইট্রাসজাতীয় সব গাছেই তামার অভাবে এই ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়।

চিত্র ৬১ : গাছের সুষম পুষ্টিসম্পদ উন্নতমানের অধিক ফলন

সুষম পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্য

- গাছে সুষম হারে সার দিলে ফুল-ফল শাকসবজির রং উজ্জ্বল হয়
- ফলন বাড়ে
- ফলনের পুষ্টিমান বাড়ে
- গাছে রোগ-পোকার আক্রমণ কম হয়
- পণ্য অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যায়

সুষম সার ব্যবহার ও পরিবেশ রক্ষা

ফসল উৎপাদনে অধিক ফলন পাওয়ার জন্য বাইরে থেকে যেসব উদ্ভিদ পুষ্টি দ্রব্য জমিতে প্রয়োগ করা হয় তা সাধারণত সার নামে পরিচিত। অতীতকালে তৎকালীন কৃষি ব্যবস্থায় অর্থাৎ অনুন্নত জাত ও গতানুগতিক ব্যবস্থাপনায় সার প্রয়োগ ছাড়াই সারা বছর ফসল ফলানো যেতো বলে এদেশের মৃত্তিকা উর্বর মৃত্তিকা বলে জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থা ভিন্ন। ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, সেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে, রোগ-পোকা দমনের পদ্ধতি ও উপকরণ উদ্ভাবিত হয়েছে। এমতাবস্থায় সার প্রয়োগ ব্যতীত ফসলের উচ্চ ফলন পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ মৃত্তিকা মধ্য উর্বর বা এর কম। মধ্যম উর্বর বা কম উর্বর জমিতে জৈব সারসহ সুষম সার দিলে অধিকতর ফলন পাওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ দো-আঁশ মৃত্তিকাতে উন্নত পদ্ধতিতে ফসল চাষ করতে গিয়ে ইতোমধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম, সালফার, দস্তা ও বোরনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই একমাত্র জৈব সার ও সুষম সার প্রয়োগ দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে শাক-সবজি ও ফুল-ফল চাষ ও নার্সারির প্রসার ঘটেছে। জমির সীমাবদ্ধতার কারণে বসতবাড়ির আনাচে-কানাচে এমনকি ছাদেও এদের চাষাবাদের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাই এসব ফসলের উচ্চ ফলন প্রাপ্তি ও পরিবেশ রক্ষার জন্য জৈব সারসহ সুষম বা সুষম সার প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

এদেশে জৈব সারের ঘাটতি থাকায় দিনে দিনে কম্পোস্ট সারের ব্যবহার বাড়ছে। কম্পোস্ট সারের সাথে মিশ্রভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হচ্ছে।

জৈব সার ও সুষম সার তৈরি ও ব্যবহার সম্পর্কে নতুন নতুন গবেষণা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাই ফসলে সারের ব্যবহার সম্বন্ধীয় তথ্যে প্রণীত এই গ্রন্থটি সার ব্যবহারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাপ্রদান করবে।

এই সার ব্যবহার গ্রন্থে ফসল ও ফসলের জাত ভিত্তিতে সারের প্রকার, পরিমাণ, প্রয়োগ পদ্ধতি এবং প্রয়োগের সময় সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। বিগত সাত বছর যাবত বাংলাদেশের বিভিন্ন নার্সারি, শাক-সবজি ও জৈব খামারে পরিচালিত পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সার ব্যবহার নির্দেশনার মূল তথ্যভিত্তিতে এটি রচিত হয়েছে।

এই গ্রন্থটি ব্যবহার করে শহর উপশহর, বন্দরসহ মফস্বলের সকল অগ্রণী খামার মালিক তাঁদের ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হতে পারেন। এতে শুধু উৎপাদনই বাড়বে না, বরং শাক-সবজি ফুল-ফলের গুণাগুণ ও স্বাদ বাড়বে।

সুষম সার ব্যবহার করার ফলে ফসলে পোকা ও রোগের প্রকোপ ও বিষ দ্রব্যের ব্যবহার কমবে, অর্থাৎ শাক-সবজি ও ফুল-ফলে বিষাক্ত দ্রব্য থাকার আশংকা কমে যাবে।

সার ব্যবহারের সুফল : নিচে সার ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ক. মাঠ ফসল ও শাক-সবজি ফল-মূলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গণচেতনা বেড়েছে।

খ. সমাজের সকল স্তরে এদের চাষে আগ্রহ জেগেছে।

গ. শহর-বন্দর এমনকি মফস্বল এলাকায়, মাঠে ও নার্সারিতে উন্নতমানের চারা ও তৈরি সার পাওয়া যায়।

ঘ. উন্নতমানের কৃষি ও উদ্যান পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা যায়।

ঙ. ফসলের জাতভেদে সারা বছরই চাষ করা যায়।

চ. বাড়ির আঙিনায় বা ছাদে চাষ করা হলে পরিবারের সবাই ফসলের পরিচর্যা করতে পারে।

ছ. বাজারে উন্নতমানের কম্পোস্ট গুঁড়া সার পাওয়া যায়, যা ঠিকমত ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের ঝামেলা (ক্রয়, পরিমাপ, মিশ্রণ ইত্যাদি কারণে) পোহাতে হয় না।

জ. আধুনিক জাতের মাঠ ফসল, শাক-সবজি, ফুল ও ফল-মূলের ফলন বেশি।

ঝ. বাড়িতে সর্বদা হাতের কাছে টাটকা দানাপুষ্টি, ফল, ফুল ও শাক-সবজি পাওয়া যায়।

ঞ. নিজের কাছে হিসাব থাকে বলে কীটনাশক ও রোগনাশকজাতীয় দ্রব্যের বিষাক্ততা এড়িয়ে খাওয়া যায়।

সারের কাজ : উদ্ভিদের পুষ্টি ঘাটতি পূরণ

ফসল চাষাবাদের জন্য তৈরি করে চারা রোপণ করার পর ফসলের গাছে পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে। তখন গাছে পুষ্টির উপসর্গ দেখে পরিপূরক সার প্রয়োগ করতে হয়। সামগ্রিকভাবে গাছের বিভিন্ন অপুষ্টি উপসর্গ উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো।

১। গাছ বড় হয় না, নিচের পাতা হলদে	—ইউরিয়া (নাইট্রোজেন)
২। গাছে পাতা পোড়া দাগ	— পটাশ (পটাশিয়াম)
৩। গাছ হাল্কা হলদে	— জিপসাম (সালফার)
৪। পাতা ও শিরা-উপশিরায় দাগ	— ম্যাগনেশিয়ামও লোহা
৫। পাতা ছোট ছোট, বিবর্ণ দাগ	— দস্তা সার
৬। গাঢ় বর্ণের বড় পাতা ও ডগা মরে যাওয়া শিরা-উপশিরায় দাগ	— কপার সার

সার প্রয়োগে ফসলের রোগ দমন

ফসলের জমিতে সুষম মাত্রায় সার দিলে গাছে অনেকগুলো রোগ হয় না, বা রোগ দেখা দেওয়ার পর সুষম বা ঘাটতি সার দ্রব্য দিলে তা সেরে যায়। এখানে কতকগুলো রোগের নাম ও সার চিকিৎসা উল্লেখ করা হলো।

সারণি ১০ : ফসলের রোগ ও সারের ব্যবহার (উদাহরণ হিসেবে)

রোগের নাম	ফসলের নাম	রোগের লক্ষণ	চিকিৎসা
হুইপ টেইল রোগ	ফুলকপি বাধাকপি সরিষা	গাছের পাতা চিকন হয়ে যায়	মলিবডেনাম প্রয়োগ
পাতা পোড়া ও ব্লাস্ট রোগ	অধিকাংশ গাছ	পাতার প্রান্ত ও কিনারাই পুড়ে যায়	পটাশ প্রয়োগ
পাতা নীলাভ হওয়া	অধিকাংশ গাছ	পাতা নীলাভ বর্ণ ধারণ করে, গাছ বাড়ে না	ফসফেট প্রয়োগ
বিবর্ণ দাগ	অধিকাংশ গাছ	পাতায় বিবর্ণ দাগ পড়ে (ক্লোরোসিস)	দস্তা সার প্রয়োগ
পাতা হলদে হওয়া	অধিকাংশ গাছ	নিচের পাতা বা সকল পাতা হলদে হতে থাকে	ইউরিয়া/জিপ-সাম প্রয়োগ
জালিকা দাগ	অধিকাংশ গাছ	পাতার শিরা বা ফলক বিবর্ণ হয়ে জালিকা বর্ণ দাগ সৃষ্টি করে	ম্যাগনেশিয়াম /লৌহ সার প্রয়োগ
ডগা মরা	লেবু, মরিচ	গাছের ডগাগুলো মরে যেতে থাকে (ডাইব্যাক)	কপার সার প্রয়োগ

ফসল চাষে সুষম সার ব্যবহার

আজকাল মাঠ ফসল, শাক-সবজি ও ফলমূলের চাষ লাভজনক। এই লাভ আর বাড়ানো যায়, কারণ গাছে সুষম সার ব্যবহার করলে এর ফলন ও গুণাগুণ বেড়ে যায়। নিচে উপস্থাপিত হিসাব থেকে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

সারণি ১১ : ফসল চাষের খসড়া আয়-ব্যয়

ফসল/সবজি/ফল/ফুল	খসড়া আয়-ব্যয় টাকা			
	গতানুগতিক চাষ		ব্যালেন্স সার দ্বারা চাষ	
	মোট ব্যয় টাকা	মোট আয় টাকা	মোট ব্যয় টাকা	মোট আয় টাকা
পাতা সবজি	১০০.০০	১২৫.০০	১৩০.০০	২৩০.০০
ফল সবজি	১৫০.০০	১৮০.০০	২০০.০০	৩০০.০০

মসলা	১৬০.০০	২০০.০০	২৫০.০০	৪০০.০০
ফল (বাণিজ্যিক)	২০০.০০	২৫০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০
ফুল (কিছু সংখ্যক)	২৫০.০০	৩০০.০০	৩৫০.০০	৬০০.০০
মোট ফসল	৭৫.০০	৯৫.০০	২১০.০০	২৬৫.০০

৫। সারের শ্রেণিকরণ

সারা বিশ্বে বর্তমানে হাজারো রকমের সার দ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ফসল জমি, মাছের চাষ, চিংড়ির চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এসব সার দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

সার দ্রব্যের উৎস, প্রস্তুত পদ্ধতি, আকার, গঠন, ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ও মৃত্তিকাতে প্রভাব প্রভৃতির ভিত্তিতে সারকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। এখানে সারের কয়েকটি প্রধান শ্রেণিকরণ উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো।

১. সারের উৎস অনুসারে সারের শ্রেণিকরণ

সার

জৈব সার	*রাসায়নিক সার*
প্রাকৃতিক সার	কৃত্রিম সার
প্রাকৃতিক বর্জ্য থেকে উৎপাদিত	কলকারখানায় প্রস্তুত
খামারজাত সার	ইউরিয়া, ডি এপি, এমোমিয়াম সালফেট
কম্পোস্ট	টি এস পি, এম এসপি
তেল বীজ, খৈল	এমপি, পটাশিয়াম সালফেট
শুষ্ক রক্ত	দস্তা সার, জিঙ্ক সালফেট ও জিঙ্ক অক্সি-সালফেট
হাড়ের গুঁড়া	জিপসাম।
হিউমিক দ্রব্য।	

২. পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা অনুসারে সারের শ্রেণিকরণ

সার

একক উপাদান সার	দ্বি-খাদ্য সার	মিশ্র সার	বহু-উপাদানিক সার
ইউরিয়া	ডিএপি সার	N-P-K নির্দিষ্ট আনুপাতিক সার	মিশ্র সার ও জৈব সার
এমপি	পটাশিয়াম সালফেট	৫০ : ২০ : ১০	

৩. প্রস্তুত পদ্ধতি অনুসারে সারের শ্রেণিকরণ

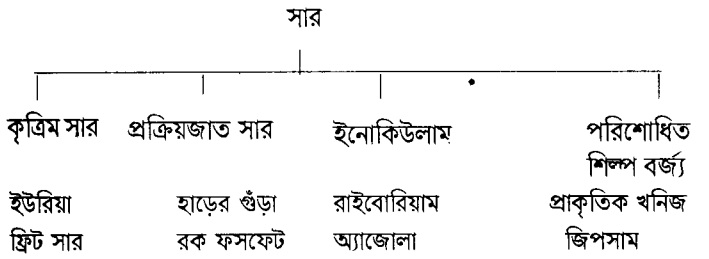

৪. আকার অনুসারে সারের শ্রেণিকরণ

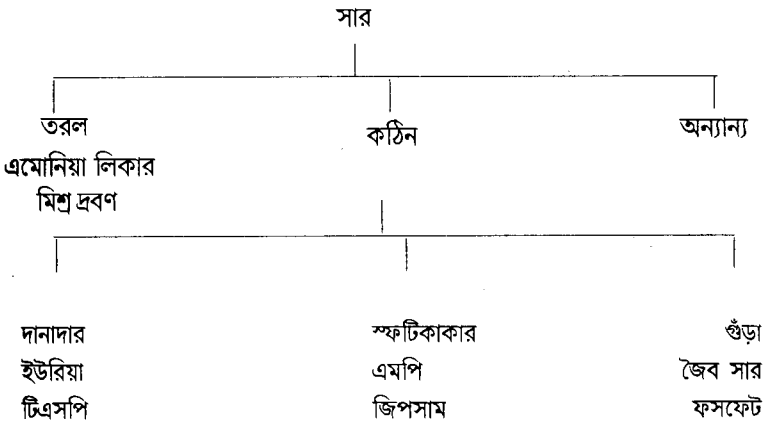

৫. গঠন অনুসারে সারের শ্রেণিকরণ

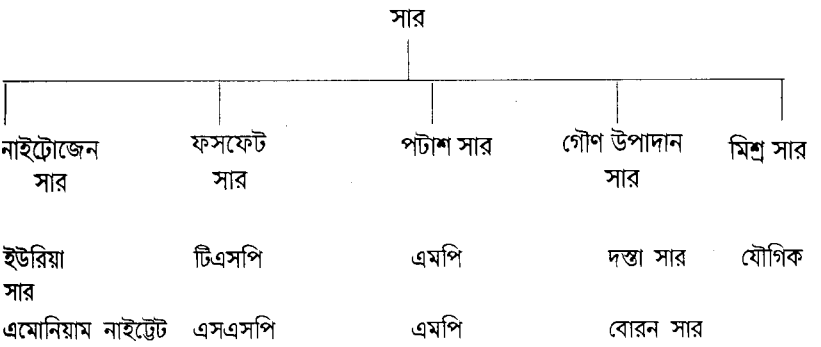

৬. ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুসারে সারের শ্রেণিকরণ

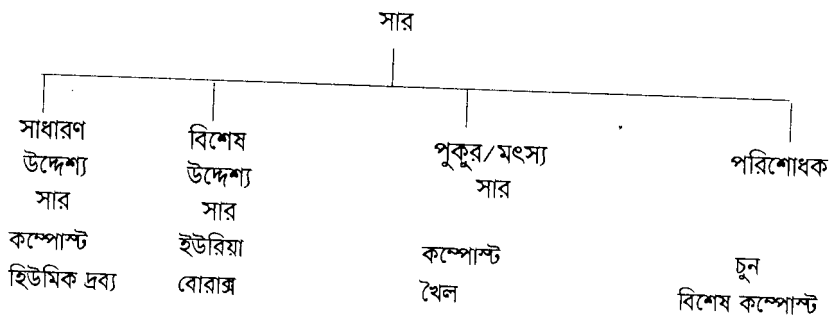

৭. মৃত্তিকাতে প্রভাব অনুসারে সারের শ্রেণীকরণ

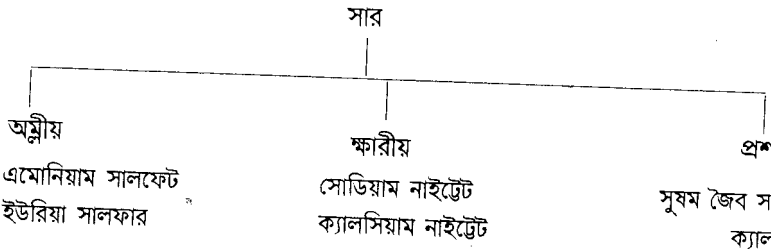

উপরের ছকে সংক্ষিপ্ত উদাহরণসহ ৭ ধরনের শ্রেণিকরণ করা হলেও একই শ্রেণিকরণ কাঠামোতেও এগুলোর শ্রেণিকরণ করা যায়। তবে তা খুব জটিল হয়ে যায়। অবশ্য বোঝার সুবিধার্থে উক্ত ৭ ধরনের শ্রেণিকরণের মধ্যে যে কোনো দুটি বা তিনটি শ্রেণিকরণ একসাথে করে শ্রেণিকরণ অবকাঠামো তৈরি করা যায়।

জৈব ও রাসায়নিক সার

কৃষি ফসল ও মৎস্য পুকুরে ব্যবহারের জন্য সারকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. জৈব সার ;
২. রাসায়নিক সার।

জৈব সার

পশু, পাখি, মানুষ, গাছপালা, কৃষি কারখানা থেকে প্রাপ্ত সকল জৈব বর্জ্য ও উপজাত দ্রব্য সরাসরি বা প্রক্রিয়াকরণের পর প্রয়োগ করা হয় তাকে জৈব সার বলে।

পরিবেশ রক্ষা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জৈব সার প্রয়োগের গুরুত্ব খুবই বেশি। জৈব সারের উৎস ও গঠন এত ব্যাপক যে এর ব্যবহারগত পদ্ধতিসমূহ এক জায়গায় আলোচনা করা দুরূহ। তাই জৈব সারের প্রয়োগ সম্পর্কে ফসলভিত্তিতে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে কম্পোস্ট উৎপাদন পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া একই সিরিজের পরিবেশ বিজ্ঞান : মৃত্তিকা জীব ও জৈব সার গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

এ অধ্যায়ে বিশেষভাবে রাসায়নিক সার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে জৈব সারের গঠন ও পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ সংক্রান্ত একটি সারণি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১২ : জৈব সার দ্রব্যের গঠন ও পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ

ক. খামারজাত সার ও কম্পোস্ট

দ্রব্যের নাম	পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ (%)			
	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ (K_2)	অন্যান্য
গোবর	০.৩৫	০.১২	০.১৭	কম
গোমূত্র	০.৮	০.০১৫	০.৬	মধ্যম
ছাগল-ভেড়ার মল-মূত্র	০.৬৫	০.৫	০.০৩	কম
মনুষ্য মল	১.৩	০.৮	০.৫	মধ্যম
মনুষ্য মূত্র	১.১	০.১১	০.২৫	মধ্যম
চামড়া বর্জ্য	৭.০	০.১	০.২	মধ্যম
চুল ও পশম বর্জ্য	১২.৩	০.১	০.৩	কম
মৎস্য বর্জ্য	৮.২	০.৩	০.২	মধ্যম
হাঁস-মুরগির খামার বর্জ্য	২.০	০.৫	১.০	বেশি
খামার কম্পোস্ট	০.৮	০.১৭	০.৫	কম
হাঁস-মুরগির খামার কম্পোস্ট	৩.০	৩.০	২.৩	বেশি
পৌর কম্পোস্ট	১.৮	১.০	১.৫	মধ্যম
গ্রামীণ কম্পোস্ট	০.৮	০.২	০.৫	কম
মিউনিসিপ্যাল মিশ্র কম্পোস্ট	২.৫	১.৫	২.০	মধ্যম

কচুরি পানা কম্পোস্ট	২.০	১.০	২.৩	কম
মিশ্র আগাছা ও পাতা কম্পোস্ট	১.৮	০.৭	১.৫	কম
মিশ্র এক্টিভেটেড কম্পোস্ট	৩.০	১.০	২.০	মধ্যম
বায়োএক্টিভেটেড সুষম কম্পোস্ট	৫.০	২.০	৩.০	বেশি
বিশেষিত কম্পোস্ট (ফর্মুলেটেড)	৪.০ – ৭.০	১.০–৩.০	২.০–৪.০	খুব বেশি
কর্দম হিউমাস কমপ্লেক্স	৩.০–৮.০	১.০–৫.০	১.০–৫.০	খুব বেশি

হিসাব সূত্র (প্রায়)

$N \times ২.২ =$ ইউরিয়া

$P \times ২.২৯ = P_2O_5$ ফসফেট $\times ২.২৩ =$ টিএসপি

$K \times ১.১২ = K_2O$ পটাশ $\times ১.৬৬ =$ এমপি সার

খ. খৈল ও উপজাত দ্রব্য

দ্রব্যের নাম	পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ (%)			
	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ (K_2O)	অন্যান্য
সরিষার খৈল	৫.১	১.৮	১.০	কম
তিলের খৈল	৬.২	২.০	১.২	মধ্যম
চিনাবাদাম খৈল	৫.৫	১.৭	১.৪	কম
তুলাবীজ খৈল	৪.৫	২.০	১.৮	মধ্যম
ভেরেন্ডা খৈল	৫.৬	১.৮	১.০	মধ্যম
নারিকেল খৈল	৩.১	১.৮	১.৭	কম
নিমের খৈল	৫.২	১.০	১.৪	মধ্যম
নাইজার খৈল	৪.৮	১.৮	১.৩	কম
মহুয়া খৈল	২.৫	০.৮	১.৮	কম
তিসির খৈল	৫.৫	১.৪	১.২	মধ্যম
কুসুম খৈল	৫.৮	১.৮	১.৬	মধ্যম
সয়াবিন খৈল	৫.৮	২.০	২.০	মধ্যম
সূর্যমুখী খৈল	৫.৩	১.৭	২.১	মধ্যম
শুষ্ক রক্ত	১১	১.২	১.০	মধ্যম

কসাইখামার মাংস বর্জ্য	১০.৫	২.৫	০.৫	বেশি
খুরা ও শিং বর্জ্য	১৩.০	১.০	–	বেশি
কাঁচা হাড়	৩.৫	২২.০	–	মধ্যম
সিদ্ধ হাড়	১.৫	২৭.০	–	মধ্যম
মৎস্য হাড়	১.৫	২৭.০	–	মধ্যম
মৎস্য বর্জ্য	৭.০	৬.০	১.৮	বেশি
ইক্ষু বর্জ্য	১.০	০.৫	১.০	কম
তামাক বর্জ্য	১.৫	০.২	০.৮	কম
বেসিক স্ল্যাগ	০.৬	৭.০	১.০	মধ্যম
সাবান বর্জ্য	০.১	০.১	২.০	মধ্যম

গ. খড় দ্রব্য

দ্রব্যের নাম	পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ (%)			
	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ (K_2O)	খড় ঃ দানা অনুপাত
ধানের খড়	০.৫৮	০.২৩	১.৬৬	১.৫
গমের খড়	০.৪৯	০.২৫	১.২৮	১.৫
সরগাম খড়	০.৪০	০.২৩	২.১৭	২.০
চিনা-কাউন-বাজরা	০.৬৫	০.৭৫	২.৫	২.০
ভুট্টা	০.৫৯	০.৩১	১.৩১	১.৫
মুগ-মাশ	১.৪	০.৫০	১.৭	২.০
মসুর-বিন	১.২	০.৬০	১.৫	১.০
খেসারি	১.০	০.৪০	১.৭	৩.০
ছোলা	১.২	০.৬০	১.২৫	১.০
অড়হর	১.১	০.৫৮	১.২৮	২.৫
আখ	০.৩৫	০.০৪	০.৫০	–
তেলবীজ	০.৭৫	০.১০	০.১০	২.০
গোলআলু	০.৪৩	০.০৭	০.১২	–
ঘাস আগাছা	০.৩০	০.০৫	০.১০	–
লিগ্যুম আগাছা	০.৮৫	০.৩৭	০.৭২	–
লিগ্যুম গাছের পাতা	১.১	০.৫২	০.৩৮	–

দ্বিতীয় অধ্যায়

সারের বৈশিষ্ট্য

১। রাসায়নিক সার

কল-কারখানায় কৃত্রিমভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত দ্রব্য যা জমিতে এক বা একাধিক উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান সরবরাহের লক্ষ্যে প্রয়োগ করা হয় তাকে রাসায়নিক সার বলে।

পুষ্টি উপাদানভিত্তিক সার দ্রব্যের অন্তর্গত প্রধান পুষ্টি উপাদানের নামে সারের নামকরণ করা হয়। অবশ্য কোনো সার দ্রব্যে একাধিক পুষ্টি উপাদান থাকলে প্রধানত যে উপাদানের জন্য প্রয়োগ করা হয়, সে নামেই তা পরিচিত হয়। যেমন- এমোনিয়াম সালফেট সারে নাইট্রোজেন ও সালফার থাকলেও নাইট্রোজেন সার নামে পরিচিত। কিন্তু ডাই এমোনিয়াম ফসফেট সার নাইট্রোজেন ও ফসফরাস উভয় নামেই পরিচিত হতে পারে।

প্রাথমিক পুষ্টি উপাদান

১. নাইট্রোজেন—ইউরিয়া, এমোনিয়াম সালফেট
২. ফসফরাস—সিংগেল সুপার ফসফেট, (এসএসপি) ট্রিপল সুপার (টিএসপি) সালফেট।
৩. পটাশিয়াম—মিউরেট অব পটাশ (এম পি) ও পটাশিয়াম সালফেট ।

মাধ্যমিক পুষ্টি উপাদান

১. ক্যালসিয়াম—জিপসাম, কৃষি চুন ;
২. ম্যাগনেশিয়াম—ডলোমাইট, ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ;
৩. সালফার—জিপসাম, সালফার পাউডার ;

গৌণ উপাদান

১. জিঙ্ক—জিঙ্ক সালফেট, জিঙ্ক অক্সিসালফেট ;
২. বোরন—বোরাক্স, বোরন ফ্রিট্স, সলুবর ;
৩. লোহা-লোহা চিলেট।

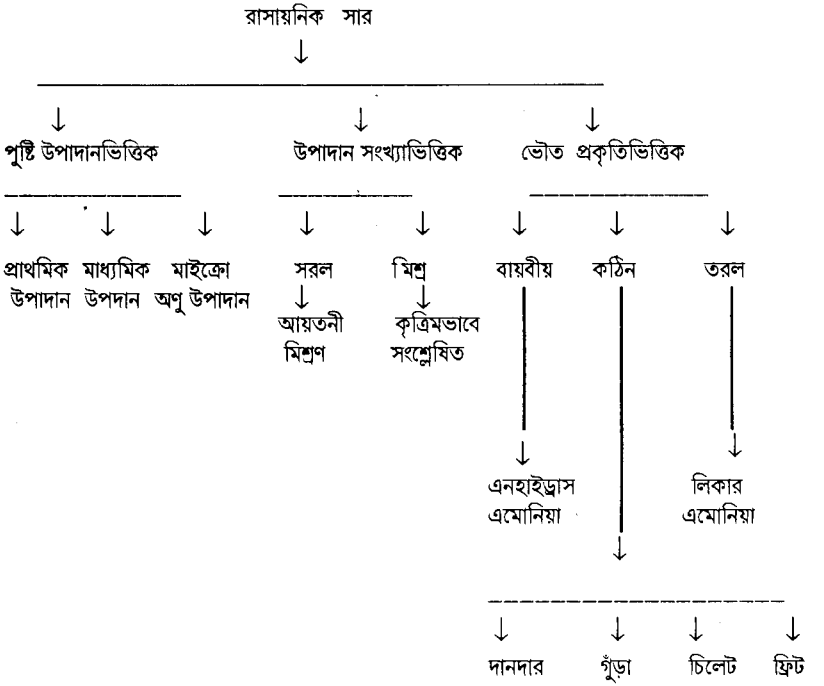

পুষ্টি উপাদানের সংখ্যাভিত্তিক শ্রেণীকরণ

সার দ্রব্যে একাধিক পুষ্টি উপাদান থাকতে পারে। কোনো সার দ্রব্যে কেবল একটি অত্যাবশ্যক উপাদান থাকলে তাকে সরল (straight) সার এবং একাধিক প্রধান বা প্রাথমিক পুষ্টি উপাদান থাকলে তাকে যৌগিক (compound) সার বলে। সরল সারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইউরিয়া ও টিএসপি। যৌগিক সারের মধ্যে রয়েছে ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট, ইত্যাদি।

ভৌত প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণিকরণ

ভৌত প্রকৃতি অনুসারে সার কঠিন, তরল ও বায়বীয় হতে পারে। কঠিন আকারের মধ্যে রয়েছে দানাদার (ইউরিয়া) গুঁড়া (হাই ফসফেট), চিলেট (-লোহা চিলেট) ফ্রিটস(-বোরন ফ্রিটস) দানাদার সার আবার প্রিল দানা (ইউরিয়া), মধ্যম ডিস্বাকার (TSP) অনিয়মিত (MP) ও সুপার দানা ইউরিয়া (USG) হতে পারে। সারের অন্যান্য আকারের মধ্যে রয়েছে স্লারি, মাডবল ও অন্যান্য অবলম্ব (suspension)।

তরল সার সেচের পানির সাথেও প্রয়োগ করা যায়। এমোনিয়া সার বায়বীয় আকারে গাছের গোড়ায় মাটিতে ইনজেকশন করে দেওয়া যায়।

২। নাইট্রোজেন সার

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কলে-কারখানায় রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত যে দ্রব্য উদ্ভিদের নাইট্রোজেন পুষ্টি হিসেবে প্রয়োগ করা হয় তাকে রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার বলে। মাটির উর্বরতা মাত্রা অনুসারে একই সাথে উদ্ভিদের সকল পুষ্টি উপাদানের অভাব দেখা না দিলেও নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের অভাব বাংলাদেশের অনেক স্থানে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। কারণ উদ্ভিদ এই ৩টি উপাদান বেশি পরিমাণে পরিশোষণ করে এবং এগুলোর সামান্য অভাবেই ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জৈব ও উভয় আকারেই সার প্রয়োগ উত্তম।

নাইট্রোজেন সারের শ্রেণিকরণ

উপকরণ দ্রব্যের উৎস, সার প্রস্তুত পদ্ধতি, সারের গুণাবলী এবং নাইট্রোজেনের আকার অনুসারে নাইট্রোজেন সারকে নানাভাবে শ্রেণিভুক্ত করা যায়।

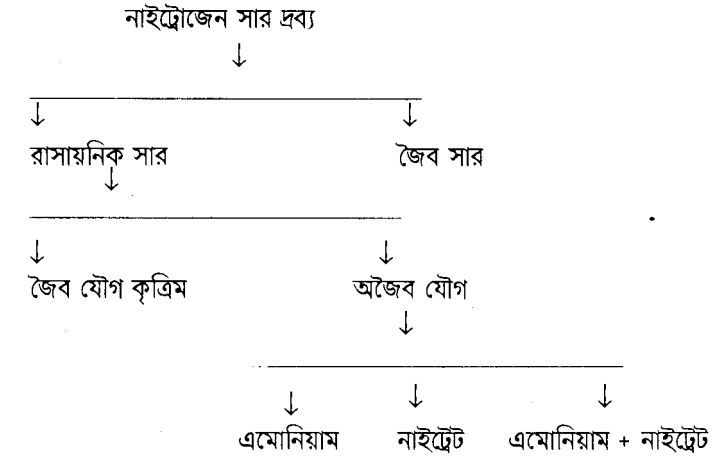

তবে এদের কেবল একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সার শ্রেণিভুক্ত করা হলে তা কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবহারের জন্য অসম্পূর্ণ হতে পারে বলে উপরে একটি সমন্বিত শ্রেণিকরণ উল্লেখ করা হলো।

নাইট্রোজেন সারের তুলনামূলক গুণাবলী :

বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেন সারের গুণাবলীর তুলনামূলক আলোচনা নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

এমোনিয়ামজাতীয় নাইট্রোজেন সার

১. কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করা হয়। অর্থনৈতিকভাবে সংগ্রহযোগ্য প্রাকৃতিক অবক্ষেপ পাওয়া যায় না ;

২. এতে নাইট্রেজেন বিজারিত (NH_4) অবস্থায় থাকে ;
৩. মাটিতে দ্রবীভূত হয় ;
৪. চুয়ানী অপচয় কম ;
৫. মধ্যম মেয়াদি ফসলের জন্য অধিক উপযুক্ত ;
৬. নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি (৮০% পর্যন্ত) ;
৭. নাইট্রিফিকেশনের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ (NH_4) → ($N0_3^-$) ;
৮. স্থায়িত্ব মধ্যম (৩০ থেকে ৬০ দিন) ;
৯. বিক্রিয়া শারীরবৃত্তীয়ভাবে অম্লীয় (নাইট্রিফিকেশনের পর) ;
১০. এঁটেল মাটিতে প্রয়োগ করলে কর্দম সংযোজন বেশি হতে পারে ;
১১. জলাবদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করলে নাইট্রিফিকেশন ও ডিনাইট্রিফিকেশন কম।

উদাহরণ : এনহাইড্রাস এমোনিয়াম (NH_3), এমোনিয়াম সালফেট $(NH_4)_2SO_4$, এমোনিয়াম ফসফেট $(NH_4)_2 PO_4$.

নাইট্রেট নাইট্রোজেন সার

১. প্রাকৃতিক অবক্ষেপ থেকে উৎপাদিত হতে পারে যেমন– সোডিয়াম নাইট্রেট বা পটাশিয়াম নাইট্রেট ;
২. নাইট্রিফিকেশনের প্রয়োজন হয় না ;
৩. নাইট্রোজেন জারিত (NO_3) অবস্থায় থাকে ;
৪. উদ্ভিদের জন্য দ্রুত প্রাপ্য হয় ;
৫. চুয়ানী অপচয় বেশি ;
৬. জলাবদ্ধ অবস্থায় ডিনাইট্রিফিকেশন বেশি ;
৭. মাটির বিক্রিয়ায় প্রভাব অনেকটা নিরপেক্ষ বা প্রশম ;
৮. স্থায়িত্ব কম (১৫ থেকে ৪০ দিন) ;
৯. মাটিতে সহজেই দ্রবীভূত হয় ;
১০. দীর্ঘমেয়াদি ফসলের জন্য কিছুটা অনুপযুক্ত ;
১১. স্বল্পমেয়াদি ফসলের জন্য অধিক উপযোগী।

উদাহরণ :পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3), এমোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3)।

এমাইড আকার

১. কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করা হয় ;
২. নাইট্রোজেন বিজারিত (NH_2) আকারের থাকে ;
৩. অধিকাংশ পানিতে দ্রবণীয় ;
৪. এমোনিফিকেশন/হাইড্রোলাইসিস ও নাইট্রিফিকেশন প্রয়োজন ;

৫. চুয়ানী অপচয় মধ্যম ;
৬. অবশিষ্ট প্রভাব অম্লীয়, অন্যান্য গুণাবলী অনেকটা এমোনিয়াম আকারের অনুরূপ।

উদাহরণ : ইউরিয়া, ক্যালসিয়াম সায়ানেমাইড ।

জৈব বা আমিষ আকার

১. উৎস প্রাকৃতিক–প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ বা মিশ্র ;
২. বেশ জটিল জৈব যৌগে নাইট্রোজেন অবস্থান করে ;
৩. অধিকাংশ জৈব সার পানিতে অদ্রবণীয় ;
৪. কার্যকারিতা বিলম্বিত বা দীর্ঘস্থায়ী ;
৫. মাটির অণুজৈবিক গুণাবলী উন্নত করে ;
৬. চুয়ানী অপচয় কম ;
৭. মাটির অম্লত্ব সাময়িকভাবে বাড়তে পারে ;
৮. মাটির ভৌত গুণাবলী উন্নত হয় ;
৯. অন্যান্য পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে।

সারণি ১৩ : নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সারের বিবরণ

সার	উপাদান পরিমাণ		
	নাইট্রোজেন (%)	অন্যান্য উপাদান (%)	গ্রেড $N\text{-}P_2O_5\text{-}K_2O$
ক. এমাইড আকার			
১. ইউরিয়া	৪৫	—	৪৫–০–০
২. ইউরিয়া সালফার	৪০	১০ (S)	৪০–০–০
৩. ক্যালসিয়াম সায়ানেমাইড	২০	৩৬(Co)	২০–০–০
খ. এমোনিয়াম আকার			
৪. ডাইএমোনিয়াম ফসফেট	২০	৫৩ (P_2O_5)	২০–২২–০
৫. এমোনিয়াম সালফেট	২০	২২ (S)	২০–০–০
৬. এমোনিয়া ক্লোরাইড	২৬	—	২৬–০–০
৭. মনোএমোনিয়াম ফসফেট	১০	৪৬ (P_2O_5)	১০–২০–০
৮. এনহাইড্রাস এমোনিয়া	৮২	—	৮২–০–০
৯. এনহাইড্রাস এমোনিয়া সালফার	৭২	১০ (S)	৭২–০–০
১০. এমোনিয়াযুক্ত সাধারণ সুপার ফসফেট	৪	১৫ (P_2O_5)	৪–৬–০

১১. এমোনিয়াম ফসফেট সালফেট	১৫	২০ (P_2O_5)	১৫-৮-০
১২ তরল এমোনিয়া	২২	—	২২-০-০
গ. নাইট্রেট আকার			
১৩. পটাশিয়াম নাইট্রেট	১৩	৪৩ (K_2O)	১৩-০-৩৪
১৪. ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	১৫	১৮ (a)	১৫-০-০
১৫. সোডিয়াম নাইট্রেট	১৫	—	১৫-০-০
ঘ. এমোনিয়াম ও নাইট্রেট আকার			
১৬. এমোনিয়াম নাইট্রেট	৩০	—	৩০-০-০
১৭. এমোনিয়াম নাইট্রেট সালফেট	৩০	৫ (S)	৩০-০-০

বি: দ্র: সারের মান অনুসারে উপাদানের পরিমাণে কিছুটা কমবেশি হতে পারে।

৩। ইউরিয়া সার

ইউরিয়া সার বিশ্বের অন্যতম প্রধান নাইট্রোজেন সার। বেশ কিছু সুবিধা থাকার জন্য ইউরিয়া সারের ব্যবহার ক্রমে বেড়েই চলেছে। মাটিতে প্রয়োগের পর ইউরিয়া সার একাধিক জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের পর উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য আকার অর্থাৎ এমোনিয়াম ও নাইট্রেট আকার ধারণ করে।

ইউরিয়া জৈব যৌগের ঐতিহাসিক বিবরণ

১. রয়েলি (Rouelle) ১৭৭৩ সালে প্রস্রাব থেকে ইউরিয়া পৃথক করেন ;

২. প্রাউট (Prout) ১৮১৮ সালে ইউরিয়ার রাসায়নিক গঠন নির্ণয় করেন ;

৩. অহেলর (Wohler) ১৮২৮ সালে গবেষণাগারে ইউরিয়া সংশ্লেষণ করেন ;

৪. বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইউরিয়ার ব্যাপক বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়।

মাটিতে রূপান্তরের প্রধান প্রধান বিক্রিয়া

১. আর্দ্র-বিশ্লেষণ (Hydrolysis) : ইউরিয়া থেকে জৈব রাসায়নিক উপায়ে এমোনিয়াম উৎপাদন।

২. নাইট্রিফিকেশন (Nitrification) : এমোনিয়াম থেকে জৈব রাসায়নিক উপায়ে নাইট্রেট উৎপাদন (যেমন-ডায়ানাইট্রাইট)

ইউরিয়েজ নামক এক প্রকার এনজাইমের জৈব রাসায়নিক প্রভাবে পানি বিযোজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। নানা প্রকার ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক এই এনজাইম উৎপাদন করে। ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে *Bacillus pasteurii* এবং *B. freudeurichii* এই এনজাইম

উৎপাদনকারী কিছু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া ইউরিয়ার অধিক ঘনত্ব সহ্য করতে পারে বলে এদেরকে ইউরিয়া ব্যাকটেরিয়াও (Urea bacteria)বলা হয়।

ইউরিয়া আর্দ্রবিশ্লেষণের প্রধান প্রধান উপাদান

ইউরিয়েজ কার্যাবলী (Urease activity): মাটিতে ইউরিয়েজ উপস্থিতির পরিমাণ এবং কোনো জমিতে নির্দিষ্ট সময়ে কি পরিমাণ ইউরিয়া বিযোজিত হয় তার ভিত্তিতে ইউরিয়েজ কার্যাবলী নির্ধারিত হয়।

প্রয়োগকৃত ইউরিয়ার পরিমাণ : নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ইউরিয়া প্রয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হলে বিযোজন হার বৃদ্ধি পায়।

মাটির বিক্রিয়া : প্রশম বিক্রিয়ায় বিযোজন হার বেশি (pH ৬.৫ থেকে ৭.৫)।

মাটির আর্দ্রতা : মাঠ ক্ষমতা আর্দ্রতায় বিযোজন হার বেশি (আর্দ্রতা ২০ থেকে ৩০%)।

মাটির তাপমাত্রা : ২৫ থেকে ৩৫ সে: তাপে বিযোজন হার বেশি।

বুনট ও জৈব পদার্থ

জৈব পদার্থ সম্পন্ন দো-আঁশ বুনটের মাটি ইউরিয়া বিযোজনের জন্য অধিক উপযোগী।

ইউরিয়া আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

ইউরিয়া আর্দ্রবিশ্লেষণের প্রকৃত প্রক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে এখনো সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই। আলেকজান্ডার (১৯৭৭)-এর মতে ইউরিয়া বিযোজনের বিক্রিয়া নিম্নরূপ :

$$(NH_2)_2CO + H_2O \xrightarrow[\text{ইউরিয়েজ এনজাইম}]{} NH_2COONH_4 \rightarrow 2NH_3 + CO_3^{--}$$

অথবা $(NH_2)CO + H_2O \xrightarrow[\text{ইউরিয়েজ এনজাইম}]{} 2NH_4CO_3$

বিভিন্ন বিজ্ঞানীর দেওয়া বিক্রিয়া সূত্র ও ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ধরন অনেকাংশে মাটির গুণাবলীর উপর নির্ভর করে। আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত মধ্যম ও সমাপ্তি দ্রব্য এবং স্থায়িত্ব প্রধানত মাটির অম্লমান, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।

ইউরিয়ার কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবহারে আর্দ্রবিশ্লেষণের গুরুত্ব

১. ইউরিয়েজ কার্যাবলী কম হলে এবং প্রয়োগের পর বৃষ্টিপাত ইউরিয়া সারের চুয়ানী অপচয় ঘটায়।

২. চুনযুক্ত শুকনো মাটিতে প্রয়োগ করলে বায়বীয় এমোনিয়া উৎপাদিত হয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নাইট্রোজেনের অপচয় হয়।

৩. চুনযুক্ত ক্ষারীয় মাটিতে অনুকূল তাপ ও আর্দ্রতায় অধিক পরিমাণ ইউরিয়া প্রয়োগের আর্দ্রবিশ্লেষণ দ্রুত হলে বিষাক্ত নাইট্রাইট (NO_2^-) উৎপাদিত হতে পারে।

৪. মাটির অম্লমান সাময়িকভাবে বেড়ে যায়।

৫. আর্দ্রবিশ্লেষণ বিলম্বিত হলে উদ্ভিদের নাইট্রোজেন পুষ্টি ব্যাহত হয়।

এমোনিয়া উদ্বায়ন (Volatilization)

মৃত্তিকা বিশেষে এমোনিয়া উদ্বায়ন ইউরিয়ার একটি প্রধান অসুবিধা। এমোনিয়াম উদ্বায়ন প্রক্রিয়াটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক. $n(NH_4)_2\ Y + nCaCO_3 \rightarrow n\ (NH)_z\ CO_3 + (Ca)_n\ (Y)_x$

খ. $(NH_4)_2\ CO_3 + H_2O \rightarrow 2NH_3 \uparrow + H_2O + CO_3^{--}$

$$\downarrow$$

$$2NHOH \leftarrow P^H$$

এক্ষেত্রে, Y ঋণাত্মক আয়ন n, x, z যোজনী

উপরোক্ত বিক্রিয়ায় দেখা যায় যে, ইউরিয়া থেকে উৎপাদিত এমোনিয়া যৌগের ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়ার ফলে এমোনিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে। মাটির সাথে ইউরিয়ার বিক্রিয়ার ফলে (চুনযুক্ত মাটি) এমোনিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। এই এমোনিয়াম কার্বনেট ক্ষারীয়, বিক্রিয়ায় এমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে। এমোনিয়া হাইড্রোক্সাইড তারপর এমোনিয়া উৎপন্ন করে। ইউরিয়াকে উদাহরণ হিসেবে নিচে উপরোক্ত সকল বিক্রিয়া নিম্নরূপে সাজানো যায়—

$$CO(NH_2)_2 \rightarrow (NH_4)_2CO_3$$

$$(NH_4)_2CO_3 \rightarrow NH_4OH$$

$$NH_4OH \rightarrow NH_3$$

এমোনিয়া উদ্বায়নের অসুবিধা

১. এমোনিয়া হিসেবে নাইট্রোজেনের অপচয় হয়।
২. নাইট্রাইট জমা হয়ে উদ্ভিদে বিষাক্ততা সৃষ্টি করতে পারে।
৩. এমোনিয়া ও নাইট্রাইট বীজের অঙ্কুরোদ্গমে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

১. ইউরিয়া আর্দ্রবিশ্লেষণ : বাংলাদেশের মৃত্তিকা পরিবেশে লেখক (১৯৮০) পরিচালিত গবেষণার ফলাফল নিচে (সারণি ১৪) উল্লেখ করা হলো।

সারণি ১৪ : বাংলাদেশের বিভিন্ন মৃত্তিকায় ইউরিয়েজ কার্যাবলীভিত্তিক ইউরিয়ার আর্দ্রবিশ্লেষণ হার

মৃত্তিকা	প্রতি ৫ ঘণ্টায় বিযোজন পিপি এম ইউরিয়া
চুনযুক্ত পলিমাটি	১২০–১৮০
গাঢ় ধূসর পলিমাটি	৩০০–৪০০
বরেন্দ্র ও লাল মাটি	২৬০–২৯০
কশ ও চা মৃত্তিকা (তীব্র অম্লীয় মাটি)	৭০–৯০
লোনা পলিমাটি	১০০–১৯০

২. নাইট্রাইট উৎপাদন : চুনযুক্ত মাটিতে ইউরিয়া প্রয়োগের ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ পিপিএম (১২০ পিপিএম হারে প্রদত্ত ইউরিয়া) নাইট্রাইট উৎপাদিত হতে পারে।

সাধারণত ১০ পিপিএম (NO_2-N মাঠ বা সবজি ফসলের জন্য বিষাক্ত হতে পারে বিশেষ করে চারা বয়সে।

৩. অম্লমান বৃদ্ধি : প্রশম ও চুনযুক্ত মাটিতে গড়ে ০.২ একক অম্লমান বেড়ে যায়।

৪. এমোনিয়া উদ্বায়ন : চুনযুক্ত মাটিতে ১২০ পিপিএম হারে প্রদত্ত ইউরিয়া নাইট্রোজেনের ১২% থেকে ২০% উদ্বায়ন হতে পারে (এমোনিয়া হিসেবে উদ্ধার প্রয়োগের প্রথম সপ্তাহে)।

৫. বীজের অঙ্কুরোদ্গম : চুনযুক্ত মাটিতে পাটবীজের অঙ্কুরোদগম হ্রাস প্রয় ৪.% থেকে ৫০%।

নাইট্রেট উৎপাদন

এমোনিয়াম সালফেট এবং এমোনিয়াম ফসফেটসহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি নাইট্রোজেন সারের চেয়ে ইউরিয়া থেকে নাইট্রেট উৎপাদন হার বেশ দ্রুত। সাময়িকভাবে অম্লমান বাড়ে বলে অম্লীয় মাটিতে এ ধরনের ত্বরান্বিত নাইট্রিফিকেশন শীত মৌসুমের স্বল্পমেয়াদি ফসলের জন্য বেশ উপকারী। অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত নাইট্রিফিকেশন নাইট্রোজেন অপচয়েরও প্রধান কারণ হতে পারে। নাইট্রেট উৎপাদন এরপর (ইউরিয়া প্রয়োগের পর) মাটির অম্লমান কিছুটা বেড়ে যায়। চুনযুক্ত মাটিতে ইউরিয়া প্রয়োগ করে অধিক পরিমাণ নাইট্রাইট উৎপাদন করলে নাইট্রেট উৎপাদন কিছুটা ব্যাহত হয়।

৪। এমোনিয়াম সার

এমোনিয়াম সালফেট, এমোনিয়াম ফসফেট ও অন্যান্য সার।

এমোনিয়াম সালফেট

এমোনিয়াম সালফেট নাইট্রোজেনে সার হিসেবে বেশ পুরানো। মাটিতে প্রয়োগের পর এই সার NH_4^+ এবং SO_4^{--}আয়নে বিযোজিত হয়। মাটিতে কর্দম কণার পরিমাণ বেশি থাকলে অধিকাংশ NH_4^+ সংযোজিত হয়। প্রধানত $Ca^{++}Mg^{++}K^+$ প্রতিস্থাপন করে এমোনিয়াম সংযোজিত (fixed) বা উপশোষিত (asorbed) হয়। পরবর্তী সময়ে এই এমোনিয়াম ধীরে ধীরে বিমুক্ত হয়ে নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। মাটিতে এমোনিয়াম সালফেট রূপান্তরের বিক্রিয়াগুলোকে নিম্নরূপ উল্লেখ করা যায়।

ক. $(NH_4)_2SO_4 \xrightarrow[\text{বিযোজন}]{} NH_4^+ + SO_4^{--}$

খ. $\boxed{\text{কর্দম}}\,Ca^{++} + 2NH_4^+ \xrightarrow[\text{ধনাত্মক আয়ন বিনিময়}]{} \boxed{\text{কর্দম}}\,NH_4^+ + Ca\,SO_4$

গ. $\boxed{\text{কর্দম}}\begin{matrix} NH^+ \\ NH^+ \end{matrix} \xrightarrow[\text{নাইট্রিফিকেশন}]{} \boxed{\text{কর্দম}}\begin{matrix} H^+ \\ H^+ \end{matrix} + 2HNO_3$

Ca^{++}

এমোনিয়াম ফসফেট

এমোনিয়াম ফসফেট সারের রূপান্তর বিক্রিয়াও একই ধরনের। এক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম সালফেটের বদলে ক্যালসিয়াম ফসফেট উৎপাদিত হয়।

মোটামুটিভাবে এমোনিয়াম সালফেট ও এমোনিয়াম ফসফেট সারের মৃত্তিকা রূপান্তরে প্রধান ৪টি ভাগে ভাগ করা যায় যথা—

প্রথমত, এমোনিয়াম এবং ঋণাত্মক আয়নে (PO_4^{---} or SO_4^{--}) বিযোজিত হওয়া ;

দ্বিতীয়ত, কিছু পরিমাণ কর্দমে সংযোজিত হওয়া বা উদ্ভিদ কর্তৃক পরিশোষিত হওয়া ;

তৃতীয়ত, কিছু পরিমাণ মৃত্তিকা কর্দমে উপশোষিত হওয়া ;

চতুর্থত, কিছু পরিমাণ $Ca^{++}Mg^{++}K^{+}$ প্রতিস্থাপন করা, যার ফলে মাটির অম্লত্ব বাড়তে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে উপশোষিত ও সংযোজিত এমোনিয়াম নাইট্রিফিকেশন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং উদ্ভিদের জন্য প্রাপ্য নাইট্রেট উৎপাদন করে। এমোনিয়াম সালফেটের অম্ল সমাঙ্ক (Eq. acidity) ১১০। মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ কম থাকলে এবং বেশি পরিমাণে এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলে মাটির অম্লত্ব দ্রুত বাড়তে থাকে।

চা, কফি, আনারস, ধান, গোলআলু, বার্লি, ভুট্টা, প্রভৃতি ফসলের জমিতে এমোনিয়াম সালফেটের কার্যকারিতা বেশ সন্তোষজনক। কারণ এসব গাছ এমোনিয়াম আকারে বেশ কিছু নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। মাটিতে অম্লত্ব অপরিবর্তিত রাখতে হলে ১ টন এমোনিয়াম সালফেটের সাথে দেড় টন গুঁড়া চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

চিলিয়ান নাইট্রেট

১৮০৯ সালে বিজ্ঞানী হেন্কি (Haenke) চিলিতে এই অবক্ষেপ আবিষ্কারের পর কৃষি জমিতে এটি প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য এরপর কৃত্রিম সোডিয়াম নাইট্রেট উৎপাদিত হয়েছে।

চিলিয়ান নাইট্রেটের বর্ণ সাদাটে, পানিতে দ্রবণীয়, পানিগ্রাহিতা বেশি। মাটিতে অনেকদিন ব্যবহার করলে অতিরিক্ত সোডিয়াম মাটির সংযুক্ত বিনষ্ট করতে পারে। এর ক্ষারাঙ্ক প্রায় ৩৬। অম্লীয় মাটিতে প্রয়োগ করলে ধীরে ধীরে অম্লমান বেড়ে যেতে পারে। বৃষ্টিবহুল এলাকায় এই সার থেকে নাইট্রেট অপচয় বেশি হয়। স্বল্পমেয়াদি শাক–সবজি ফসলের জন্য এ ধরনের নাইট্রেট সম্পন্ন সারের কার্যকারিতা বেশি। কারণ এতে নাইট্রিফিকেশন প্রয়োজন হয় না। মাটিতে প্রয়োগের পরপরই উদ্ভিদ তা সারাসরি পরিশোষণ করতে পারে।

এমোনিয়াম সালফেটের দ্রবণীয়তা ০°সে ০·৬ গ্রা/১০০ গ্রাম পানি

১০০ °সে –১০৪·০ গ্রা/১০০ গ্রাম পানি

এনহাইড্রাস এমোনিয়া

জার্মানিতে সর্বপ্রথম ১৯১৩ সালে হেবার বস (Haber Bosch) পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটিয়ে বাণিজ্যিকভাবে এনহাইড্রাস এমোনিয়া উৎপাদন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালের দিকে কয়েকটি কারখানায় এর উৎপাদন শুরু হয়। ১৯৬৩ সন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ৮০টিরও বেশি কারখানা স্থাপিত হয়.এবং বার্ষিক ৫ মিলিয়ন টন নাইট্রোজেন উৎপাদিত হয়। ১৯৮০ সনে এই পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৭ মিলিয়ন টন। সরাসরি প্রয়োগ ছাড়াও এমোনিয়া দ্রব্য অন্যান্য নাইট্রোজেন সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ তাপ ও চাপে এনহাইড্রাস এমোনিয়া ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। তরল ঘনত্ব ২.২৭ কেজি/গ্যালন (৩.৮ লিটার)। ১০° সেন্টিগ্রেড তাপে এনহাইড্রাস এমোনিয়া ৫.২৮ কেজি/বর্গ সেমি. চাপ সৃষ্টি করে। ৩৮° সে তাপে এই চাপ হয় ১৩.৯ কেজি/বর্গ সেমি.। স্টিলের (steel) ট্যাঙ্ক বা প্লাস্টিক পাত্রে এই এমোনিয়া রাখায় পাত্রের তাপ সহ্য ক্ষমতা ১৮.৬ কেজি/বর্গ সেমি. হওয়া দরকার।

এমোনিয়া উৎপাদনে নাইট্রোজেনের উৎস বায়ুমণ্ডল এবং হাইড্রোজেনের উৎস পানি, ন্যাফথা, প্রাকৃতিক গ্যাস (CH_4) ও কয়লা বা তেল।

নিচে এমোনিয়া উৎপাদনের বিক্রিয়াটি উপস্থাপিত হলো।

$$N_2 + 3H_2 \xrightarrow[\text{হেবার-বস পদ্ধতি}]{} 2NH_3$$

এই বিক্রিয়া তাপ উৎপাদনকারী (Exothermic) ১১.০ (KCal NH_3)। মৌল এনহাইড্রাস এমোনিয়াতে প্রায় ৮২% নাইট্রোজেন থাকতে পারে। ওজন ভিত্তিতে পানিতে ৩০% পর্যন্ত এমোনিয়া দ্রবণ তৈরি করা যায়। এর নাম একুয়া এমোনিয়া (প্রায় ২৪% নাইট্রোজেন)

জমিতে প্রয়োগ করার সাথে সাথে প্রয়োগ স্থানের pH ৯.০ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু উষ্ণ পরিবেশে এবং সবাত পরিবেশে এই এমোনিয়া অণুজীব দ্বারা নাইট্রেট পরিণত হয়ে মাটিতে pH কমিয়ে আনতে থাকে। ১ কেজি NH_3-N এর জন্য ১.৭৮ কেজি চুন ($Ca\ CO_3$) এই অম্লত্ব প্রশমন করতে পারে।

নাইট্রোজেন দ্রবণ সার

মাটির উপরিভাগে বা গাছে পাতায় চাপবিহীন নাইট্রোজেন দ্রবণ সার প্রয়োগ পদ্ধতি বেশ প্রাচীন। বহু উপাদানিক সার প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও নাইট্রোজেন দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। সরাসরি মৃত্তিকা প্রয়োগের উপযোগী নাইট্রোজেন দ্রবণে ২০ থেকে ২৪% নাইট্রোজেন থাকে। চাপ গড়ে ৪০° সেঃ তাপে ০.৭০ গ্রাম/বর্গ সেমি.।

তরল নাইট্রোজেন সারের অতিরিক্ত সুবিধা

১. কীটনাশক, রোগনাশক ও আগাছানাশকের সাথে তরলকারী দ্রব্য হিসেবে নাইট্রোজেন দ্রবণ ব্যবহার করা যায়।

২. সেচের পানির সাথে ব্যবহার করা যায়। তাই প্রয়োগের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হয় না।

৩. অনেক দ্রবণ অতিদ্রুত কার্যকর হয়।

নাইট্রোজেন দ্রবণের বৈশিষ্ট্য

বর্ণহীনতা, গন্ধহীনতা এবং লোনা স্বাদ নাইট্রোজেন দ্রবণের কয়েকটি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সনাক্তকরণ ও ব্যবসার সুবিধার জন্য কোন কোন কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান বর্ণ দ্রব্য প্রয়োগ করে। এমোনিয়াম নাইট্রেটের পানি দ্রবণে নাইট্রোজেনের পরিমাণ স্থূলভাবে হাইড্রোমিটার দ্বারাও নির্ণয় করা যায় (ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের মাধ্যমে)। নাইট্রোজেন দ্রবণসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে যথা—

১. এমোনিয়া, এমোনিয়াম নাইট্রেট ;
২. এমোনিয়া, ইউরিয়া ;
৩. এমোনিয়া, ইউরিয়া এমোনিয়াম নাইট্রেট ;
৪. এমোনিয়াম নাইট্রেট ;
৫. এমোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া ;
৬. বিবিধ দ্রবণ।

নাইট্রিক এসিড ও এমোনিয়াম বিক্রিয়া ঘটিয়ে এমোনিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ উৎপাদন করা হয়।

$$HNO_3 + NH_3 \longrightarrow NH_4NO_3 + 23000 \text{ Cal (exothermic)}$$

সার হিসেবে ব্যবহারের জন্য নাইট্রোজেন দ্রবণের ৩টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

১. বাষ্পচাপ ;
২. কেলাসন তাপ ;
৩. দ্রবণের সংরক্ষণ পাত্রে ক্ষয়ধর্মী প্রভাব।

সারণি ১৫ : নাইট্রোজেন দ্রবণের পরিমাণ ও প্রয়োগ হার (লিটার/হেক্টর)

প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন কেজি/হেক্টর	এমোনিয়াম নাইট্রেট (১৯%) লিটার/হেক্টর	এমোনিয়াম নাইট্রেট + ইউরিয়া (৩০%) লিটার/হেক্টর
২৫	১১০	৬৬
২০	৮৭	৫৪
৩০	১৩০	৮০
৪৫	১৯৫	১২০
৫৫	২৪০	১৪৬
৬৫	২৮২	১৭৩
৭৫	৩২৫	২০০
১০০	৪৩৪	২৬৫
কেলাসন তাপ Kg N/l	০.২৩ ১°সে ২১%–১০° সে	০.৩৯ –০১০° সে ৩২%–০° সে

৫। ফসফরাস সার

বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৩০ ধরনের ফসফেট সার কৃষি জমিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব সারকে উৎস, প্রস্তুত পদ্ধতি ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে বহুবিধভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। উৎস ও প্রক্রিয়াকরণের ভিত্তিতে ফসফেট সারকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়—

ফসফরাস সারের প্রকার

ক. প্রাকৃতিক ফসফেট সার–হাড় ও রক ফসফেট ;

খ. প্রক্রিয়াকৃত ফসফেট সার ;

সিদ্ধ গুঁড়া করা হাড়ের গুঁড়া, হাইপার ফসফেট ;

এসিড প্রক্রিয়াকৃত সুপার ফসফেট, ট্রিপল সুপার ফসফেট ;

গ. শিল্পজাত উপদ্রব্য–ক্ষারীয় ধাতুমল, অন্যান্য উপদ্রব্য ;

ঘ. কৃত্রিম ফসফেট–মনো এমোনিয়াম ফসফেট এবং ডাই–এমোনিয়াম ফসফেট (DAP)।

পশু-পাখির হাড় একটি প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত জৈব্য দ্রব্য বিশেষ। রক ফসফেট বা ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট একটি প্রাকৃতিক খনিজ। রক ফসফেটের সাথে সালফিউরিক ও ফসফরিক এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে সুপার ফসফেট ও ট্রিপল সুপার ফসফেট উৎপাদন করা হয়। ক্ষারীয় ধাতুমল ইস্পাত কারখানায় একটি উপদ্রব্য। বাষ্পসিদ্ধ করে বা সরাসরি গুঁড়া করে হাড়ের গুঁড়া এবং রক ফসফেট গুঁড়া করে হাইপার ফসফেট উৎপাদন করা যায়।

সুপার ফসফেট

এই সারের অন্য নাম সাধারণ সুপার ফসফেট। ফসফেটজাতীয় সারের মধ্যে এই সার সবচেয়ে প্রাচীন। রক ফসফেটের সাথে সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে সুপার ফসফেট সার উৎপাদন করা হয়। ১৮৪২ সালে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম জন লয়েস সুপার ফসফেট তৈরির এই সূত্র উদ্ভাবন করেন। সেই সময় থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে সুপার ফসফেটের ব্যবহার সর্বাধিক ছিল।

$$[Ca_3(PO_4)]_3\ CaX + 7H_2SO_4 \longrightarrow 3Ca(H_2PO_4)_2 + 7CaCaSO_4 + H_2O$$

মনোক্যালসিয়াম ফসফেট।

X = ক্লোরো, ফ্লোরো, হাইড্রোক্সি- এপেটাইট হতে পারে।

সাধারণ সুপার ফসফেটের বর্ণ ধূসর–বাদামি থেকে সাদা, গুঁড়া বা দানাদার এবং এতে অম্লীয় ঝাঁঝালো গন্ধ রয়েছে।

সমপরিমাণ (৬০ থেকে ৭০%) সালফিউরিক এসিড এবং গুঁড়া করা রক ফসফেট (১০০ মেশ বা ও.১৪ মিমি) চালুনি অতিক্রমকারী (৭২% বিপিএল) রক ফসফেটের সাধারণিকৃত সূত্র $Ca_3(PO_4)_2$। তবে একটি নির্দিষ্ট সূত্র বা বিক্রিয়া হিসেবে নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায়।

$$Ca_{10}(PO_4)_6\ F_2 + 7H_2SO_4 + 3H_2O \longrightarrow 3CaH_4(PO_4)_2\ H_2O + 7CaSO_4 + 2HF$$

সাধারণ সুপার ফসফেটে ওজনভিত্তিতে প্রায় ৪০% মনোক্যালসিয়াম ফসফেট এবং ৬০% জিপসাম থাকে। এর অম্লমান প্রায় ৩.০। সুপার ফসফেটের প্রায় ৪৫% ফসফরাস পানিতে দ্রবণীয়।

প্রধান তিনটি কারণে জমিতে সুপার ফসফেট প্রয়োগ করে ফসলে ভাল সাড়া পাওয়া যায়—

১. এতে প্রায় ২০% ক্যালসিয়াম থাকে ;
২. এতে প্রায় ১০ থেকে ১২% সালফার থাকে ;
৩. অধিকাংশ ফসফরাস পানি দ্রবণীয় ($H_2PO_4^-$ ৮৫%, $HPO_4^{--} + PO_4^{---}$ = ১৫%) ;
৪. কিছু পরিমাণ Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Cl থাকে ;
৫. এমোনিয়াম সংযুক্ত করে ব্যবহার করা যায়।

এমোনিয়া ফসফেট

এমোনিয়ামের সাথে ফসফরিক এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে এমোনিয়া ফসফেট সার উৎপাদন করা হয়। বর্তমান যুগে এমোনিয়াম ফসফেট শীর্ষস্থানীয় সার দ্রব্য। এই জনপ্রিয়তার প্রধান প্রধান কারণ হচ্ছে—

১. ফসফেটের পরিমাণ বেশি ;
২. পানি দ্রবণীয়তা বেশি ;
৩. অনুকূল ভৌত আকার ও গঠন উত্তম ;
৪. নাইট্রোজেনও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।
৫. সার মিশ্রণে বা জটিল সার ব্যবহারে সুবিধাজনক। এই সার প্রধানত ২ প্রকার যথা মনোএমোনিয়াম ফসফেট ও ডাইএমোনিয়াম ফসফেট।

সারণি ১৬ : সুপার ফসফেট সারের গঠন (%)

নাম	পরিমাণ	নাম	পরিমাণ
ফসফরাস (P)	৯	অক্সিজেন, হাইড্রোজেন	
ক্যালসিয়াম	২০	লোহা, এলুমিনিয়ামও সিলিকা	৫৯
সালফার	১২		

যৌগভিত্তিক

নাম	পরিমাণ	নাম	পরিমাণ
জিপসাম	৩৮	মনোক্যালসিয়াম ফসফেট পানি দ্রবণীয়	৩০
আর্দ্রতা	২	ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট পানি অদ্রবণীয়	৯
ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেটে ধীর দ্রবণীয়	২	আয়রন/এলুমিনিয়াম অক্সাইড ও সিলিকা	৯

দ্রবণীয়তা অনুসারে ফসফেটের শ্রেণিকরণ

পানি ও সাইট্রিক এসিডে দ্রবণীয়তা অনুসারে ফসফেট সার প্রধানত ৩ প্রকার যথা—

১. পানি দ্রবণীয় ফসফেট

এমোনিয়াম ফসফেট ও পটাশিয়াম ফসফেট পানিতে দ্রবণীয়। সুপার ফসফেট ও টিএসপির অধিকাংশই পানি দ্রবণীয়। প্রশম বিক্রিয়ায় এদের কার্যকারিতা বেশি।

২. সাইট্রিক এসিড দ্রবণীয় ফসফেট

পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু শতকরা ১ ভাগ সাইট্রিক এসিডে দ্রবণীয়। এই সারের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট। কার্যকারিতা মধ্যম। অম্লীয় মাটিতে কার্যকারিতা কিছুটা বেশি।

৩. সাইট্রিক এসিড অদ্রবণীয় ফসফেট

পানি বা সাইট্রিক এসিডে অদ্রবণীয়। যেমন হাড়ের গুড়া ও ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট (যেমন– রক ফসফেট) ধীর প্রাপনীয়। অম্লীয় মাটিতে বেশি কার্যকর। অবশিষ্ট প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী।

ফসফেট যৌগের পানি দ্রবণীয়তা (১৫° সে. তাপে)

ডাই–এমোনিয়াম ফসফেট ৬৫%
মনোমোনিয়াম ফসফেট ৩৪%
মনোক্যালসিয়াম ফসফেট ১.৮%
ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট ০.০২%
ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট।

ট্রিপল সুপার ফসফেট

রক ফসফেটের সাথে ফসফরিক এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ট্রিপল সুপার ফসফেট উৎপাদন করা হয়।

১৮৯০ সালে সর্বপ্রথমে ট্রিপল সুপার ফসফেট উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে টিএসপি উৎপাদন আরম্ভ হয়।

ঘনীভূত সুপার ফসফেট (SP)

টেনিসি ভ্যালি (TVA) উৎপাদিত সি এস পি সারে ৫৪% ফসফেট ও ২৪% ফসফরাস থাকে। সি এসপি'র পূর্ণ নাম ঘনীভূত বা ঘন (concentrated) সুপার ফসফেট সি এস পির অধিকাংশই মনোক্যালসিয়াম [$Ca(H_2PO_4)_2.H_2O$] এই দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত মৌল পানি শুকিয়ে গিয়ে সারে কেবল ১ ভাগ পানি থাকে। সি এস পির ৮০ থেকে ৯০ ভাগ ফসফেট পানি দ্রবণীয় । এমোনিয়াযুক্তকরণ (ammoniation) প্রক্রিয়ায় ১০ কেজি ফসফেট ১.০ ০ থেকে ১. ৫ কেজি এমোনিয়া শোষণ করতে পারে।

উৎপাদন প্রক্রিয়া

রক ফসফেট + সুপার ফসফরিক এসিড = সি এস পি (TVA পদ্ধতি) সুপার ফসফরিক এসিডের অপর নাম এনহাইড্রাস ফসফরিক এসিড।

$$2H_3PO_4 \xrightarrow{\Delta} H_4P_2O_7 + H_2O \uparrow (72\% P_2O_5)$$

$$H_3PO_4 + H_4P_2O_7 \xrightarrow{\Delta} H_5P_3O_8 + H_2O \uparrow$$

পলিফসফরিক এসিড

সুপার ফসফরিক এসিডের অধিকাংশই পাইরোফসফরিক ($H_4P_2O_7$) এসিড জাতীয়।

অর্থো–ফসফরিক এসিড + পলি ফসফরিক এসিড = সুপার ফসফরিক এসিড।

সাদা এসিড (বিদ্যুৎ পদ্ধতি), সবুজ এসিড (সিক্ত পদ্ধতি)

ট্রিপল সুপার ফসফেট উৎপাদনের বিক্রিয়া নিম্নরূপ

$$Ca_{10}(PO_4)_6F_2 + 14H_3PO_4 + 10H_2O \longrightarrow 10CaH_4(PO_4).H_2O + 2HF$$

টিএসপি ও এসপির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে, টিএসপি থেকে এসিড অপসারণ করা হয় এবং ফসফেট থাকে মনোক্যালসিয়াম ফসফেট মনোহাইড্রেট হিসাবে। (৪০ থেকে ৪৫% P_2O_5), ১২ থেকে ১৬% Ca, ১ থেকে ২% S) অধিকাংশ ফসফেট পানি দ্রবণীয়। মিশ্র সারেও এই দ্রব্যের ব্যবহার রয়েছে। এই সার উৎপাদনে সালফিউরিক এসিডের বদলে ফসফরিক এসিড ব্যবহার করা হয়।

রক ফসফেট

রক ফসফেটে প্রধানত ট্রাই–ক্যালসিয়াম আকারে ফসফেট অবস্থান করে। এর সাথে সাথে $CaCO_3$, CaF_2, $Ca(OH)_2$ এবং $CaCl_2$ এদের প্রাথমিক খনিজকে এপেটাইট বলে।

এপেটাইটের সাধারণ রাসায়নিক সূত্র

$[Ca_3(PO_4)_2]\ Ca\ X$ অথবা $[Ca_{10}(PO_4)_6\ X]$

এক্ষেত্রে, $X = CO_3, Cl_2, F_2, SO_4, (OH)_2$

রক ফসফেট চার প্রকার হতে পারে যথা–

১. কঠিন শিলা (Hard rack) ফসফেট;

২. কোমল (Soft) ফসফেট;

৩. ভূমি নুড়ি (Land pebbles)ফসফেট;

৪. নদী–নুড়ি (River pebbles) ফসফেট।

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ও ফ্লোরিডায় পর্যাপ্ত ফসফেট খনিজ পাওয়া যায়। ফ্লোরিডার কঠিন শিলা ফসফেটে প্রায় ৭৮ থেকে ৮০ ভাগ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও কুরাকাও

(Curacao) দ্বীপ, মরক্কো (Morocco) এবং তিউনিসে (Tunis) উন্নতমানের ফসফেট অবক্ষেপ পাওয়া যায়।

রক ফসফেটের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে ইউ, এস, জোনস (১৯৫৩) এর মতামত —

১. সুপার ফসফেটের তুলনায় পরিমাণ রক ফসফেট প্রয়োগ করলে তুলা, তৃণভূমি ও গোমটরের ফলন বৃদ্ধি প্রায় যথাক্রমে শতকরা ৫৪, ৬১, এবং ৭০ ভাগ (সুপার ফসফেটের ফলন বৃদ্ধি ১০০ হিসাবে)

২. সুপার ফসফেটের তুলনায় রক ফসফেটের অবাশিষ্ট প্রভাব মাত্র ৫০ ভাগ।

সারণি ১৭ : ফসফেট দ্রব্যের ক্ষার সমাম্লক (প্রায়) বা প্রশমন মান

দ্রব্য	প্রশমন মান	এক টন চুনের সমান, কেজি
রক ফসফেট	৭	—
ক্ষারীয় ধাতুমল	৭০	১২৭৫
ব্লাস্ট ফার্নেস স্ল্যাগ	৭০	১২৭৫

৬। পটাশিয়াম সার

উৎস দ্রব্যের প্রকৃতি ও প্রস্তুত প্রক্রিয়া অনুসারে পটাশিয়াম সারকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়—

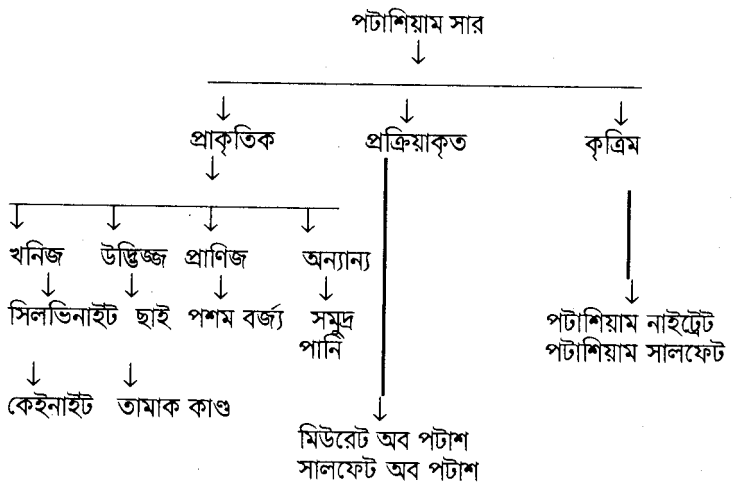

পটাশিয়াম খনিজ

ভূ-পৃষ্ঠে প্রাকৃতিকভাবে অবস্থানরত প্রায় ৫০টি খনিজের মধ্যে প্রচুর পটাশিয়াম রয়েছে। এসব খনিজকে সামান্য মাত্রায় বিশুদ্ধ করেই বা বিশুদ্ধ না করেও ফসলের জমিতে ব্যবহার করা যায়। কতকগুলো উল্লেখযোগ্য খনিজের নাম উল্লেখ করা হলো।

ক. লবণ অবক্ষেপ

সিলভেনাইট বা সিলভাইট (KCl), x x = অবিশুদ্ধ দ্রব্য
কার্নেলাইট – KCl . Mg. Cl. $6H_2O$
কেইনাইট – KCl. $MgSO_4$, $3H_2O$
লেংবিনাইট– K_2SO_4. $MgSO_4$

খ. পানিতে কম দ্রবণীয় : পলি হেলাইট
পলি হেপাটাইস —K_2SO_4.Mg SO_4. $2CaSO_4.2H_2O$

গ. পানিতে অদ্রবণীয়
গ্লোকোনাইট – $KFeSi_2O_6$. $5H_2O$
ফেলসপার – KAl Si_2O_8
মাইকা —মাস্কোভাইট ও বায়োটাইট।

সারণি ১৮ : ফসফরাস সারের উপাদানিক গঠন

সার দ্রব্য	ফসফেটের পরিমাণ (%) (P_2O_5)	অন্যান্য উপাদান
ক. পানি দ্রবণীয় ফসফরাস		
সাধারণ সুপার ফসফেট $Ca(H_2PO_4)2$	২০	S ১০ Ca ২০
ট্রিপল সুপার ফসফেট $Ca(H_2PO_4)2$	৫৪	S <৩ Ca ১৩
মনোএমোনিয়াম ফসফেট $NH_4H_2PO_4$	৪৫	N ১০
ডাই এমোনিয়াম ফসফেট $(NH_4)_2$ HPO_4	৫০	N ২০
এমোনিয়াযুক্ত সুপার ফসফরাস	৪৫	N ৫
খ. সাইট্রিক এসিড দ্রবণীয় ফসফরাস		
ডাই–ক্যালসিয়াম ফসফেট $CaHPO_4$	৩৮	Ca ২৭
বেসিক স্ল্যাগ– $(CaO)_5$ $P_2O_5SiO_2$	১৮	Ca ৩০
গ. সাইট্রিক এসিড অদ্রবণীয় ফসফরাস		
রক ফসফেট Ca_3 $(PO_4)2$	২০	Ca ৩৫
বাষ্পসিদ্ধ হাড়ের গুঁড়া Ca_3 $(PO_4)2$	১৮	Ca ২৪
ক্যালসিয়াম মেটাফসফেট Ca_3 (PO_3)	৬০	Ca ১৮

এসব দ্রব্যের মধ্যে সিলভিনাইটে শতকরা প্রায় ৬৩%, কার্নেলাইটে ১৭%, কেইনাইটে ১৯%, লেংবিনাইটে ২৬% এবং পলিহেলাইটে ১৫% পটাশ রয়েছে। আধুনিক পটাশ সার

কারখানায় এসব খনিজ দ্রব্য বিশোধন ও কাঙ্ক্ষিত ভৌত আকার ও রাসায়নিক গুণাবলী প্রদান করে বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশে এরকম কোনো খনিজ দ্রব্য এখনো পাওয়া যায় নাই। এজন্য পটাশজাতীয় যাবতীয় রাসায়নিক সার বা কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়।

সামুদ্রিক পানি

সামুদ্রিক পানিতে ০.০৬% পটাশ, ০.১৪% ভাগ ম্যাগনেশিয়াম এবং ১.১% ভাগ সোডিয়াম থাকে। আধুনিককালে সামুদ্রিক পানি থেকে পটাশিয়াম নিষ্কাশন করে তা থেকে পটাশিয়াম নাইট্রেট উৎপাদন করা হচ্ছে।

কাঠের ছাই

কাঠের ছাই কৃষি জমির জন্য অতি প্রাচীন সার। গাছের ডাল শাখা কাঠের গুঁড়া ফসল নাড়া পোড়ানো ছাই প্রয়োগ জমিতে পটাশিয়াম সরবরাহ বাড়ায়। এসব ছাইয়ে ৫ থেকে ২৫ ভাগ পটাশ থাকে। উদ্ভিদের প্রকৃতি, বয়স ও পোড়ানো পর্যায়ের (degree of burning) উপর ছাইয়ের পটাশিয়ামের পরিমাণ নির্ভর করে। পটাশিয়াম ও অন্যান্য ক্ষারীয় লবণ বা আয়নের উপস্থিতির জন্য মাটিতে ছাইয়ের প্রভাব ক্ষারীয়। এই কারণে ইউরিয়া সারের সাথে কাছাকাছি স্থানে সদ্য ছাই প্রয়োগ অঙ্কুরোদম হার কমিয়ে দেয়।

ছাইয়ের উপাদানের মধ্যে পটাশিয়ামের পরই জৈব কার্বনের স্থান। তাই পটাশিয়াম সরবরাহের সাথে সাথে ছাই থেকে কিছুটা জৈব কার্বনও পাওয়া যায়। মাটিতে প্রয়োগের পর ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উদ্ভিদ ছাইয়ের পটাশিয়াম পরিশোষণ করতে সক্ষম হয়।

কচুরীপানা, কলাগাছ এবং Graminae গোত্রের গাছের খড়ের ছাইয়ে পটাশিয়ামের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। পটাশিয়াম সরবরাহ ছাড়াও ছাই জমিতে কতকগুলো পরোক্ষ উপকার করে থাকে যেমন—

১. ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের চলাচল রোধ করে। মাটির উপরে এবং গাছের পাতায় প্রয়োগ করলে এই উপকার পাওয়া যায়। গাছের পাতায় প্রায়োগ করলে জাবপোকার অতিক্রম কমে যায়।
২. উঁই ও পিঁপড়াজাতীয় পোকার আকক্রণ কমায়।
৩. মাটির আর্দ্রতা বেশি হয়ে গেলে বিশেষ করে বীজতলায় আর্দ্রতা বেশি হলে ছাই তা কিছুটা শোষণ করে নিতে পারে।
৪. ছাই মাটির আয়তনী ঘনত্ব কমায়।
৫. ছাই মাটির তাপ পরিশোষণ ও বায়ু চলাচলে সহায়তা করে।

তামাক কাণ্ড ও সামুদ্রিক আগাছা

ক. তামাক কাণ্ড (Tobacco Stover)

গাছ থেকে পাতা সংগ্রহের পর কাণ্ডসহ অবশিষ্টাংশ শুকিয়ে গুঁড়া করে পটাশ সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে ৫ থেকে ৮ ভাগ পটাশ এবং ২ থেকে ৩ নাইট্রোজেন থাকে। কমপোস্টেও এই দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। মাটিতে প্রয়োগের পর অন্যান্য জৈব পদার্থের মতোই এই দ্রব্য বিযোজিত হয়ে পটাশিয়াম বিমুক্ত করে। কাণ্ড দ্রব্যের গুঁড়া

যতো সূক্ষ্ম হয় বিযোজন হার ততো বাড়ে। মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকলে বিযোজন প্রক্রিয়া ২০ থেকে ৩০ দিনেই অনেক এগিয়ে যায়। অতএব বলা যায়, তামাক কাণ্ড দ্রব্যের প্রধান ৩টি কাজ রয়েছে যথা– পটাশ সরবরাহ, নাইট্রোজেন সরবরাহ ও জৈব পদার্থ প্রদান।

খ. সামুদ্রিক আগাছা (Sea weeds)

সামুদ্রিক আগাছা সারের অপর নাম গরীবের সার। সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় এসব আগাছাকে সবুজ সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। খামারজাত সারের তুলনায় এতে যথেষ্ট পরিমাণ পটাশ ও নাইট্রোজেন রয়েছে। সামুদ্রিক আগাছার মধ্যে (kelp) আগাছা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এদের বৃদ্ধি দ্রুত, উচ্চতা বা লম্বায় প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিটার হতে পারে। কেল্পের ছাইয়ে > ২৫% ভাগ পটাশ থাকতে পারে।

মিউরেট অব পটাশ (KCl)

সিলভেনাইট ও কারনেলাইট প্রাকৃতিক খনিজ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এই সার উৎপাদন করা হয়। সারা বিশ্বের মোট পটাশ জাতীয় রাসায়নিক সারের মধ্যে মিউরেট অব পটাশের স্থান প্রথম এবং পরিমাণে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ।

মিউরেট অব পটাশ সারের বর্ণ সাদা থেকে লালচে। উৎস খনিজের প্রকৃতি, সারের গ্রেড বা বিশ্লেষণ (analysis) এবং দানার আকার-প্রকৃতি (গুঁড়া বা দানাদার) অনুসারে বর্ণে পার্থক্য হয়ে তাকে। প্রয়োগের পর মিউরেট অব পটাশ মাটিতে এর অম্লমানে তেমন পরিবর্তন আনে না। মৃত্তিকা দ্রবণে এর বিক্রিয়া নিম্নরূপ উল্লেখ করা যায় (সাধারণিকৃত)।

$$\boxed{\text{কর্দম/কলয়ড}}\ \begin{matrix}\text{Ca}\\ \text{Ca}\end{matrix} + 2\text{KCl} \rightarrow \boxed{\text{কর্দম/কলয়ড}}\ \begin{matrix}\text{K}\\ \text{K}\end{matrix} + \text{CaCl}_2$$

বিযোজিত পটাশিয়ামের একটা অংশ মৃত্তিকা দ্রবণে থেকে যায়, অপর অংশ বিনিময়ী ও অবিনিময়ীভাবে কর্দমে সংযোজিত বা উপশোষিত হয়। মাটিতে কর্দমের পরিমাণ বেশি থাকলে, পারিবেশিক অবস্থা একান্তরভাবে শুকনো-ভিজা হলে পটাশিয়াম সংযোজন বৃদ্ধি পায়। মাটিতে চুন প্রয়োগ করলে পটাশিয়াম সংযোজন কমে যায়।

মিউরেট অব পটাশ উৎপাদন

বিশ্বের প্রধান পটাশ খনিজ উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে কানাডা। ১৯৪৩ সনে সিলভেনাইট নামে প্রাকৃতিক অবক্ষেপ সেখানে পটাশ দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়। পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম ক্লোরাইড (KCl + NaCl) সমন্বয়ে সিলভেনাইট গঠিত। সিলভেনাইট থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড অপসারণের জন্য ২টি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় যথা—

ক. ভাসমান পদ্ধতি (Floatation) ;

খ. কেলাসন পদ্ধতি (Crystallization)।

ভাসমান পদ্ধতিতে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রণে সামান্য পরিমাণ বিশেষ প্রকার ভাসমান দ্রব্য বা এজেন্ট প্রয়োগ করা হয়। এই ভাসমান দ্রব্য

সুনির্দিষ্টভাবে কণা আবরণ (coat or film) উৎপন্ন করে। তারপর মিশ্রণটিতে যান্ত্রিকভাবে আলোড়িত (agitated) করে বুদবুদ ফেনা (frothing) উৎপন্ন করা হয় যা আবরিত পটাশিয়াম ক্লোরাইড কণার সাথে যুক্ত হয়ে উপরে ভেসে উঠে। এই ফেনা সংগ্রহ করে পটাশিয়াম ক্লোরাইড পৃথক করা হয়। মিশ্রণে কেবল সোডিয়াম ক্লোরাইড অবশিষ্ট থাকে।

প্রক্রিয়া সংক্ষেপ

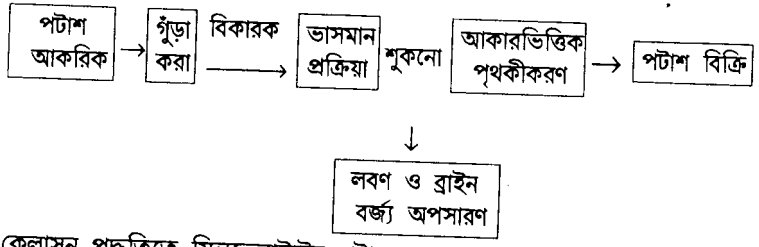

কেলাসন পদ্ধতিতে সিলভেনাইটের পটাশ সংগ্রহ করার মূল ভিত্তি হচ্ছে উষ্ণ ও ঠাণ্ডা পানিতে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তার পার্থক্য। পানির তাপ সামান্য বাড়ালেই পটাশিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তা বেড়ে যায়। কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তা তেমন হারে বৃদ্ধি পায় না। পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম ক্লোরাইড সম্পৃক্ত ঠাণ্ডা ব্রাইন দ্রবণ ১০০° সেঃ তাপে উত্তাপ করে তা গুঁড়া করা আকরিকের উপর ঢেলে দেওয়া হয়। উক্ত আকরিক দ্রবণ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড অধক্ষেপিত (precipitated) হয় এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে অবশিষ্ট থেকে যায়।

পটাশিয়াম সালফেট

লেংবিনাইট আকরিক থেকে দ্রবীভবন পদ্ধতি এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এই সার উৎপাদন করা হয়—

$$K_2SO_4\ 2Mg\ SO_4 + 4KCl \dashrightarrow 3K_2SO_4 + 2MgCl_2$$

কৃষি জমিতে ১৬০ থেকে ১৮০ কেজি পটাশিয়াম/হেক্টর ফসল উৎপাদনের জন্য ভাল। উর্বর কৃষি পলি জমির পটাশিয়াম

১% পটাশিয়াম = ২,২০০,০০০ কেজি ১০০ = ২২,০০০ কেজি/হেক্টর সহজে প্রাপ্য ১%, ২২,০০০০ ১০০ =২২০ কেজি/হেক্টর

৭। ফ্রিট ও চিলেট সার

আধুনিক সার প্রক্রিয়াকরণ ধারণাসমূহের মধ্যে চিলেট ও ফ্রিট সার অন্যতম। কৃষি জমিতে চিলেটকৃত ও ফ্রিট সার প্রয়োগ করে বিশেষ কতকগুলো সুবিধা অর্জন করা যায়। সারা বিশ্বে অনুসারের ক্ষেত্রে চিলেট ও ফ্রিট সার ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে চলেছে।

চিলেটকরণ প্রক্রিয়া

চিলেটকরণ একটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া। ধাতব আয়নের সাথে ইলেকট্রন সংযোগের মাধ্যমে একাধিক আয়নের একক যৌথ উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে চিলেটকরণ বলে। বহুযোজী Fe^{+++}, Ca^{++}, Mn^{++} ইত্যাদি দ্বারা চিলেট করা যায়।

চিলেট সার

Chelate শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ 'নখ' বা 'ক্ল' (claw) জৈব রাসায়নি চিলেট বলতে একটি চক্রাকৃতি (ring structure) বোঝায়। দুই বা তার বেশি ইলেকট্রন প্রদানকারী যৌগসমূহের (electron donar group) কোনো ধাতব আয়ন যুক্ত হয়ে একটি মৌল চক্রাকৃতি উৎপন্ন হলে তাকে চিলেট বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লোহা ধাতুর চারপাশে ৬টি অক্সিজেন ও এরকম অষ্টতলক পরমাণু বিন্যাস রয়েছে। লোহা ব্যতীত কপার, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ দ্বারা সচরাচর চিলেট উৎপন্ন করা যায়। চিলেট উৎপাদনের সহজতা ও স্থায়িত্ব ধাতব আয়নের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। লোহা চিলেট সর্বাধিক স্থায়ী। ডাই-সোডিয়াম EDTA লোহা লবণের এ ধরনের অষ্টতলক পরমাণু বিন্যাস রয়েছে।

ফ্রিট সারের ভৌত বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা

১. ফ্রিট সার দ্রব্য নাড়াচাড়া করা সুবিধাজনক ;
২. মিশ্র সার হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং উৎপাদনের যে কোন পর্যায়ে তা করা যায় ;
৩. বিযোজন হার ধীর ;
৪. এতে গৌণ উপাদানের বিষাক্ততা (যেমন- বোরন) সৃষ্টির আশংকা কমে যায়।

বর্তমানে কতকগুলো সম্ভাবনাময় ফ্রিট সারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা ও বোরন ফ্রিট সার। জিঙ্ক ফ্রিট সার সূক্ষ্ম গুঁড়াসম্পন্ন বর্ণ বাদামি ধাতব লবণ, অবশ্য এককভাবে কেবল জিঙ্ক সম্পন্ন ফ্রিট সার এখানো বাজারে পাওয়া যায় না। জিঙ্ক ফ্রিট সারের প্রয়োগ হয় সাধারণত ১০ থেকে ১২ কেজি/হেঃ বা গাছ প্রতি ১৮ থেকে ২২ গ্রাম (বৃক্ষ)। ফল বৃক্ষে জিঙ্ক ফ্রিট প্রয়োগ করলে তা পানিতে মিশিয়ে নিতে হয়। মাটিতে প্রয়োগ করলে তা মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয়। জিঙ্ক ফ্রিটে পানি দ্রবণীয়তা কম, তবে দূর্বল এসিডে দ্রবীভূত হয়। জিঙ্ক ফ্রিট ৭ থেকে ১০ ভাগ জিঙ্ক (Zn) থাকে। অন্যান্য উপাদান যথা বোরন, কপার, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও মলিবডেনাম কিছু কিছু পরিমাণে থাকতে পারে।

সারণি ১৯ : গৌণ উপাদান সারের বিবরণ (বাণিজ্যিক)

ক. লোহা		খ. দস্তা বা জিঙ্ক	
সারের নাম	পরিমাণ (%)	সারের নাম	পরিমাণ (%)
ফেরাস সালফেট	Fe ১৫ থেকে ২০	জিঙ্ক সালফেট	Zn ২৮ থেকে ৩৬
ফেরিক সালফেট	Fe ১৫ থেকে ১৭	জিঙ্ক অক্সাইড	Zn ৫৮ থেকে ৭৮
লৌহ কিলেট	Fe ৬ থেকে ১২	জিঙ্ক চিলেট	Zn ৪ থেকে ৬
		জিঙ্ক কার্বনেট	Zn ৪৯ থেকে ৫৬

গ. বোরন	
সারের নাম	পরিমাণ (%)
বোরক্স (সোহাগা)	B ১০ থেকে ১১
সোডিয়াম পেন্ট বোরেট	B ১৫ থেকে ১৮
সলোবর	B ১৭ থেকে ২০
বোরন ফ্রিট	B ১০ থেকে ১৭
বরিক এসিড	B ১০ থেকে ১৭

ঘ. কপার	
সারের নাম	পরিমাণ (%)
কপার সালফেট	Cu ১৫ থেকে ২০
কিউপ্রিক অক্সাইড	Cu ৬০ থেকে ৭৫
কিউপ্রাস অক্সাইড	Cu ৮০ থেকে ৯০
কপার কিলেট	Cu ১০ থেকে ১৩
কপার অক্সালেট	Cu ২৬ থেকে ৩২

ঙ. ম্যাঙ্গানিজ	
সারের নাম	পরিমাণ (%)
ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ১	Mn ২৬ থেকে ২৮
ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড	Mn ১৭
ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড	Mn ৪১ থেকে ৬৮
ম্যাঙ্গানিজ ফ্রিটস	Mn ১০ থেকে ২৫
ম্যাঙ্গানিজ চিলেট	Mn_{12}
ম্যাঙ্গানিজ কার্বনেট	Mn ৩১

চ. মলিবডেনাম	
সারের নাম	পরিমাণ (%)
এমোনিয়াম মলিবডেট	Mo ৫৪
মলিবডেনাম ট্রায়েক্সাইড	Mo ৬৬
সোডিয়াম মলিবডেট	Mo ৩৯
মলিবডেনাম ফ্রিটস	Mo ৩০

১ বাণিজ্যিক নাম Techmagnum R ২. Agrononax R

সারণি ২০ : রাসায়নিক সারের ভৌত গুণাবলী

সার	বর্ণ	দানার আকার	দানার আকৃতি	গন্ধ
ইউরিয়া	সাদা	০.৫ মিমি	গোলাকার	ঝাঁঝালো
এমোঃ সালফেট	ধূসর	০.৬ থেকে ৯ মিমি	স্ফটিক, অনিয়ত	ঝাঁঝালো
টি এস পি	ধূসর	১.৫ থেকে ২০ মিমি	ডিম্বাকার	কম
হাইপার ফসফেট	ধূসর	গুঁড়া	প্রায় গোলাকার	কম
	গাঢ় ধূসর	অনিয়মত দানাদার	গোলাকার	কম
এম পি	ধূসর লালচে	অনিয়ত দানাদার	স্ফটিকাকার	কম
জিপসাম	ধূসর	চুর্ণ দানাহীন	অনিয়ত	গন্ধহীন
জিঙ্ক অক্সিক্লোরাইড	ধূসর	০.৫ থেকে ০.৮ মিমি	গোলাকার	গন্ধহীন
জিঙ্ক সালফেট	সাদা	০.৫ থেকে ১.০ মিমি	দানাদার	গন্ধহীন

জিঙ্ক অক্সিসালফেট

একটি ক্ষারীয় জিঙ্ক সার। অম্লমান ৭.৪। জিঙ্ক অক্সাইড এবং জিঙ্ক সালফেট সহযোগে উৎপন্ন। পল্লব প্রয়োগের জন্য উপযোগী। কোনো কোনো ছত্রাকঘটিত রোগ দমনেও এই দ্রব্য কার্যকর হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সার ব্যবহারের নীতিমালা

১। রাসায়নিক সারের ভৌত প্রকৃতি ও গ্রেড

জমিতে সার প্রয়োগের সহজতা, হাতে নাড়াচাড়ার সুবিধা-অসুবিধা, সংরক্ষণ গুণ ও পরিবহণের জন্য রাসায়নিক সার দ্রব্যের ভৌত গুণাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ভৌত গুণাবলীর মধ্যে প্রধান হচ্ছে গ্রাহিতা ও অন্যান্য তরল দ্রব্যে দ্রবণীয়তা।

পরিবহণ ও সংরক্ষণ গুণ ছাড়াও সার দ্রব্যের দানার আকার মাটিতে এগুলোর কার্যকারিতাও প্রভাবিত করে। দানার আকার যতো ছোট হয়, এর কার্যকারিতা সাধারণত ততো বেশি এবং দ্রুত হয়। ভৌত গুণাবলী হিসেবে একক দানার বর্ণ, সমষ্টিগত বর্ণ ও সার সনাক্তকরণের প্রাথমিক বাহ্যিক গুণ হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত কতগুলো রাসায়নিক সারের ভৌত গুণাবলী ১৯ নং সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত সারের মধ্যে ইউরিয়ার পানি গ্রাহিতা বেশি। একক দানার বর্ণ সমষ্টির বর্ণের চেয়ে হাল্কা। ইউরিয়ার হস্তানুভূতি পিচ্ছিল। অন্যান্য সারের হস্তানুভূতি মোটামুটি শুকনো। জিপসাম সারের হস্তানুভূতি রেশমের অনুরূপ। প্রায় সব সারই পানিতে দ্রবণীয়, এদের বিক্রিয়া প্রধানত প্রশম। এমোনিয়াম সালফেটের বিক্রিয়া অম্লীয়।

কোন সার কোন সারের সাথে মিশানো যাবে বা প্রয়োগের কতক্ষণ আগে মিশানো যাবে তাকে সারের মিশ্রণযোগ্যতা বলে। সারের মিশ্রণযোগ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত গুণ। কোনো সারের পানি গ্রাহিতা বা আর্দ্রতা বেশি থাকলে তা অন্যান্য সারের সাথে মিশিয়ে অধিকক্ষণ রাখা যায় না।

ভেজা ক্ষারীয় বা অম্লীয় সার হাতে নাড়াচাড়া করা অসুবিধাজনক। এতে হাতের চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উদ্বায়ী সার থেকে সর্বদাই উগ্র গন্ধ বের হয়ে থাকে (যেমন- ইউরিয়া)। এসব সার গুদাম ঘরের মেঝে, দেয়াল ও ছাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

তরল সার

কৃষি জমিতে তরল সারের ব্যবহার কোনো নতুন পদ্ধতি নয়। বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রে ডেভি (Sir Humphray Davy) ১৮০৮ সালে অজৈব রাসায়নিক সারের দ্রবণ পরীক্ষামূলকভাবে উদ্ভিদে প্রয়োগ করেছিলেন। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, সেই সময় এথেনোর সবজি বাগানে খালের মাধ্যমে পয়ঃ বা সিউয়েজ প্রয়োগ করা হতো। তবে

আধুনিককালে বিগত ২৫ বছর থেকে তরল সারের ব্যবহার সারা বিশ্বে প্রতি বৎসর ৬% থেকে ১০% হারে হিসেবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সার গ্রেড

বাণিজ্যিক সার দ্রব্যে একাধিক মুখ্য পুষ্টি উপাদান যেমন–নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম থাকলে তা একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি দ্বারা তা প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যা কোন সারে কি পরিমাণ (%) কোন পুষ্টি উপাদান আছে তা প্রকাশ করে। সংখ্যাগুলোর মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রথমটি নাইট্রোজেন, দ্বিতীয়টি ফসফরাস এবং তৃতীয়টি পটাশিয়ামের পরিমাণ উল্লেখ করে। মিশ্র সারের জন্য সংখ্যা পদ্ধতি উল্লেখিত নিশ্চিত বিশ্লেষণ (Guaranteed analysis) তথ্যকে সার গ্রেড বলে।

সার গ্রেডের উদাহরণ : তিনটি সংখ্যার দ্বারা গ্রেড উল্লেখ করা হয়। যেমন ১০–১০–১০, ২০–১০–৮, ১০–১৫–১০ ইত্যাদি। এসব সংখ্যার প্রথমটি নাইট্রোজেন, দ্বিতীয়টি ফসফরাস (ফসফেট) এবং তৃতীয়টি পটাশিয়াম (পটাশ)। ২০–২০–১০ সার গ্রেড বলতে বোঝায় এতে মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ ২০ ভাগ, প্রাপনীয় ফসফেট (P_2O_5) ২০% ভাগ, এবং পানির দ্রবণীয় পটাশ (K_2O) ভাগ ১০ ভাগ। বাকি পরিমাণ ২০ ভাগ প্রাপ্য ফসফেট (P_2O_5) ২০% ভাগ এবং পানির দ্রবণ পটাশ (K_2O) ১০ ভাগ। বাকি ৫০ ভাগ রয়েছে অন্যান্য দ্রব্য যেমন–অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন, ইত্যাদি।

সারণি ২০ : যৌগিক সারের গ্রেড

সারের নাম	$N\text{-}P_2O_5\text{-}K_2O$	N-P-K
ডাই–এমোনিয়াম ফসফেট	১৮ – ৪৬ – ০	১৮–২০–০
মনো–এমোনিয়াম ফসফেট	১১ – ৪৮ – ০	১১–২১–০
পটাশিয়াম নাইট্রেট	১৩ – ০ – ৪৪	১৩–০–৩৭
পটাশিয়াম মেটাফসফেট	০ – ৬০ – ৪০	০–২৭–৩৩
পটাশিয়াম ফসফেট নাইট্রেট	৭ – ৩৫ – ২৪	৭ – ১৬ – ২০

সার অনুপাত ও ফর্মুলেশন

কোনো সার দ্রব্যের দুটি বা তিনটি পুষ্টি উপাদানের পারস্পরিক পরিমাণকে সার অনুপাত দ্বারা উল্লেখ করা হলে তাকে সার অনুপাত বলে। কোনো সার দ্রব্যের সার গ্রেড ১০–২০–২০ হলে সার অনুপাত হয় ১ঃ২ঃ২।

সার ফর্মুলেশন

কোনো নির্দিষ্ট সার গ্রেড বা সার অনুপাত তৈরি করতে হলে কোন সার দ্রব্য কি পরিমাণ মিশাতে হয় তা নির্ধারণ করা ও সার উৎপাদনকে সার ফর্মুলেশন বলে। আধুনিককালে

কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যেও এ ধরনের হিসাব কাজ সমাধা করা হয়। সার গ্রেড তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ বা অংশ দ্রব্য দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যৌগিক সার তৈরি করতে হলে বেশ জটিল ধরনের হিসাব সম্পাদন করতে হয়।

বহু-উপাদানিক সার

বর্তমান বিজ্ঞান উন্নত কৃষি উৎপাদন ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় সরল সারের চেয়ে বহু-উপাদানিক সার অধিক প্রতিশ্রুতিশীল। উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের মধ্যে কোনো দ্রব্যে একাধিক মুখ্য উপাদান (NPK) থাকলে তাকে বহু-উপাদানিক সার বলে। অবশ্য কোনো কোনো সময় ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও সালফারকেও বহু-উপাদানিক সার দ্রব্যকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

বহু-উপাদানিক সার উৎপাদনের মূল উপকরণ হচ্ছে-

১. রক ফসফেট-ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম
২. সালফিউরিক এসিড-সালফার
৩. এমোনিয়া-নাইট্রোজেন
৪. পটাশিয়াম ক্লোরাইড-পটাশিয়াম
৫. সল্ট পিটার ও চিলিয়ান নাইট্রেট-নাইট্রোজেন।

উদাহরণ

NP. সার ঃ এমোনিয়াম ফসফেট, নাইট্রো-ফসফেট বা এমোনিয়ামযুক্ত সুপার ফসফেট

NPK সার ঃ NP সার + পটাশিয়াম ক্লোরাইড।

বহু-উপাদানিক সার উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি বা ধাপ

ক) এসিড যুক্তকরণ (Acidulation) : রক ফসফেট +এসিড।

খ) এমোনিয়ামযুক্তকরণ (Ammoniation) : ১০ কেজি সুপার ফসফেট +২.৭-৩.২ কেজি এমোনিয়াম।

১০টি এস. পি. + ১.৮, ২.৩ কেজি এমোনিয়াম

গ) দানা উৎপাদন (Granulation) : ৪ থেকে ৮ মেশ, ৪.৩ থেকে ২.৩ মিমি.।

মিশ্র সার (আর্দ্রতা ৫%)

মিশ্র বা জটিল সারের ৫টি প্রধান উপকরণ যথা-

১. উপাদান বাহক (Nutrient carrier) যথা- N, P, K ইত্যাদির বাহক ;
২. কন্ডিশনার (Conditioners) আবরণী দ্রব্য (Coating agent) ;
আর্দ্রতা শোষণ যেমন-ভারমিক্যুলাইট দলা প্রতিরোধী (Anticaking) দ্রব্য।
৩. অম্লত্ব প্রশমক (Acidity neutralius) ;

৪. পূর্ণদ্রব্য (Fillers) ;

৫. অন্যান্য অতিরিক্ত দ্রব্য (আপদনাশক)।

১. **পুষ্টি উপাদান সরবরাহকারক :** পুষ্টি উপাদান সরবরাহ হিসেবে সরল একক সার বা রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করা হয়। যৌগের প্রকার মনোনয়নের মূল্য ও পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতির (%) উপর নির্ভর করে।

২. **কন্ডিশনার** (Conditioners) : মিশ্র দ্রব্যের দলা বেধে যাওয়া বা প্রতিকুল ভৌত অবস্থা সৃষ্টি হওয়া এড়ানোর জন্য কন্ডিশনার দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। তামাক কাণ্ড গুঁড়া, চীনাবাদাম খোসার গুঁড়া, ধানের তুষ, পিট, ইত্যাদি কন্ডিশনার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। প্রতি টন মিশ্রণে ৫০ কেজি পরিমাণ পর্যন্ত কন্ডিশনার দ্রব্য ব্যবহার করা যায়।

৩. **প্রশমনকারী** (Neutralisers) : উপকরণ সার অম্লধর্মী হলে এর বিক্রিয়া প্রশ্নের জন্য ক্ষারীয় দ্রব্য (যেমন- ডলোমাইট, চুনাপাথর) ব্যবহার করা হয়।

৪. **পূর্ণ দ্রব্য** (Filler materials): এর অপর ওজন পরিপূরক দ্রব্য। নির্দিষ্ট পরিমাণ মাত্রা পরিপূরকের জন্য এই দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। প্রতি টন মিশ্র সারে পূর্ণ দ্রব্যের পরিমাণ ৫০ কেজির বেশি হওয়া উচিৎ নয়। বালি ও কাঠের গুঁড়া পূর্ণ দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২। মিশ্র সার

উদ্ভিদের দুই বা ততোধিক অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদানবাহী যৌগিক সার উৎপন্নের জন্য একাধিক উপকরণ দ্রব্যের (components) কারিগরি মিশ্রণ বা রাসায়নিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে যে দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাকে মিশ্র (mixed) সার বলা হয়।

বর্তমানকালে সারা বিশ্বে মিশ্র সার উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার বেশ ব্যাপকতা লাভ করছে। উন্নত শিল্প কারখানায় রাসায়নিক পদ্ধতিতে মাটি ও ফসলের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সুনির্দিষ্টভাবে ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষম মিশ্র সার উৎপাদন সম্প্রসারিত হচ্ছে। মিশ্র সারের ব্যবহার বেশ পুরাতন। অবশ্য তখন সারের ব্যবহার ততোটা জনপ্রিয় ছিল না।

মিশ্র সারের ব্যবহার দিনে দিনে ব্যাপক হলেও এর কৃষিতাত্ত্বিক কার্যকারিতায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। নিচে এ ধরনের কয়েকটি প্রধান সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হলো।

মিশ্র সারের সুবিধা

আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষি উৎপাদন পদ্ধতিতে মিশ্র সার বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। মিশ্র সারের কয়েকটি প্রধান সুবিধার মধ্যে রয়েছে-

১. সব কয়টি প্রধান পুষ্টি উপাদান একই দ্রব্যের মাধ্যমে এবং একই সময়ে প্রয়োগ করা যায়।

২. সার প্রয়োগজনিত সময়, ব্যয় ও শ্রমিক কম প্রয়োজন হয়।

৩. সার মিশ্রণ তৈরি করার সময় প্রতিটি উপকরণ বিক্রিয়া ও মিশ্রণের পর সামগ্রিক বিক্রিয়ার প্রতি খেয়াল রেখে প্রধানত প্রশম মিশ্রণ তৈরি করা হয় বলে সারের অম্লমানজনিত অবশিষ্ট প্রভাব কমে যায়।

৪. মিশ্র সারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামসহ মাধ্যমিক বা গৌণ উপাদান সারও যুক্ত করা যায়।

৫. সাধারণত প্রতিটি ফসলের জন্য বা সমধরনের একাধিক ফসলের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সার মিশ্রণ তৈরি ও বিক্রি করা যায়। তাই সার পছন্দের ব্যাপারে কৃষকের প্রযুক্তি জ্ঞান কম থাকলেও তেমন অসুবিধা হয় না।

৬. মিশ্র সারের মাধ্যমে সুষম সার ব্যবহার করতে পরোক্ষভাবে অনেকটা বাধ্য করা হয়। সরল সার প্রয়োগ দ্বারা অনেক সময় সুষম সার প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায় না।

মিশ্র সারের অসুবিধা

অনেক সুবিধা থাকলেও মিশ্র সারের বেশ কয়েকটি অসুবিধাও রয়েছে। মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ, প্রয়োগ ও সংরক্ষণের স্বার্থে এসব অসুবিধা রয়েছে। কয়েকটি প্রধান প্রধান অসুবিধা নিম্নরূপ :

১. ফসলের নির্দিষ্ট একক উপাদানের ঘাটতি বা ফসলের বিশেষ প্রয়োজন মেটানো যায় না, সরল সার দ্বারা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এ ধরনের পুষ্টি প্রয়োজন মেটানো যায়।

২. যে কোনো একটি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা মিশ্র সার দ্বারা পরিপূরণ করতে হলে উপস্থিত অন্যান্য উপাদানের অপচয় হয়।

৩. মিশ্র সার উৎপাদন করতে অত্যন্ত বিস্তারিত ও বাস্তব প্রযুক্তি জ্ঞান প্রয়োজন।

৪. মিশ্র সার প্রস্তুতের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হয়।

৫. মিশ্র সারের মূল্য কিছুটা বেশি।

৬. মৃত্তিকা গুণাবলী অনুসারে একই প্রয়োগ পদ্ধতি একাধিক উপাদানের জন্য সমান কার্যকর হয় না। যেমন- কোনো মাটিতে মিশ্র সার মাটির গভীরে প্রয়োগ ফসফেটের কার্যকারিতা বাড়াতে পারে, কিন্তু এতে নাইট্রোজেনের অপচয় বেড়ে যেতে পারে।

৭. ফসলের বৃদ্ধি পর্যায় অনুসারে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান প্রয়োজনীয়তায় সময়ের পার্থক্য রয়েছে। মিশ্র সারের মাধ্যমে একই সময়ে সার প্রয়োগ করলে সবগুলো উপাদান সমানভাবে কার্যকর হয় না।

মিশ্র সারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকা ও ফসল বিশেষে সার প্রয়োগের জন্য মিশ্র ও সরল উভয়ের সুসমন্বয়ই সর্বাধিক ফলন প্রদান করতে সক্ষম।

মিশ্র সার প্রস্তুতের মূলনীতি

মিশ্র সার উৎপাদনের সময় নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহের প্রতিপালন অত্যাবশ্যক।

১. এমোনিয়ামসম্পন্ন সব সার সরাসরি ক্ষারীয় সার দ্রব্যের সাথে (রক ফসফেট, চুনাপাথর বেসিক স্ল্যাগ, ক্যালসিয়াম সায়ানেমাইড) মিশানো উচিৎ নয়। এতে এমোনিয়া উৎপাদিত হয়ে নাইট্রোজেন অপচয় হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়।

২. পানি দ্রবণীয় ফসফেট (সুপার ফসফেট, ট্রিপল সুপার ফসফেট ও এমোনিয়াম ফসফেট) মুক্ত চুন (free line) সম্পন্ন দ্রব্যের সাথে (যেমন– চুনাপাথর,ক্যালসিয়াম সায়ানেমাইড মেশানো উচিৎ নয়। এতে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ফসফেট উৎপন্ন হতে পারে।

৩. সার মিশ্রণে পানিগ্রাহী দ্রব্য ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে মিশ্রণ দলা বেধে গিয়ে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

৪. অম্লীয় সার দ্রব্যের ধারকে (carrier) কিছু পরিমাণ অম্ল প্রশমনকারী দ্রব্য ব্যবহার করা ভাল। এতে মিশ্রণ ধারক পাত্র ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয় না।

মিশ্র সার উৎপাদন প্রক্রিয়া

যে কোনো মিশ্র সার উৎপাদনের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. **হিসাব ও ওজন নেওয়া :** সঠিক মিশ্রণ তৈরির জন্য উপকরণ সারসমূহের পরিমাণ সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় ও ওজন গ্রহণ করা দরকার।

২. **চালুনি ও আকারক্রমন** (Sirving and sizing) **:** সংরক্ষণগারে উপকরণ সার দ্রব্য কোনো কারণে দলা বেধে গেলে তা প্রাথমিকভাবে গুঁড়া করে চেলে নিতে হয়। চেলে নেওয়ার সময় তা দানার আকার অনুসারে বিন্যস্তও করা যায়। সবগুলো উপকরণ সার দ্রব্যের দানার আকার এ রকম না হলে প্রোগ্রিগেশন হওয়ার আশংকা থাকে।

৩. **মেশানো** (Mixing) : মিশ্রণের জন্য সাধারণত ঘূর্ণন ড্রাম বা খাড়া সিলিন্ডার ব্যবহার করা যায়।

৪. প্যাকিং (Packing) : প্রস্তুতকৃত মিশ্রণ উপযুক্ত পাত্রে প্যাকিং করতে হয়।

মিশ্র সার প্রস্তুত পদ্ধতি

যে কোনো মিশ্র সার তৈরি করতে হলে প্রথমেই কাঙ্ক্ষিত ফর্মুলা প্রণয়ন করতে হয়। এই ফর্মুলার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা অংশ দ্রব্য নির্ধারণ এবং পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়। মিশ্র সারের অংশ দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয়ে নিচের সূত্রের সাহায্যে নেওয়া যায়, যথা–

অংশ দ্রব্যের পরিমাণ= উ(মিশ্রণে উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ X মোট মিশ্রণের ওজন,সরল সারে পুষ্টি উপাদান পরিমাণের)

এক্ষেত্রে, ME= মিশ্রণের উপাদান

TM= মিশ্রণের পরিমাণ

IE= সরল সারে উপাদানের শতকরা পরিমাণ

অথবা $AI = \frac{ME\ (\%) \times TM}{I\ E\ (\%)}$

মিশ্র সারে দ্রব্যের পরিবর্তন

কৃত্রিম সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে মিশ্র সার উৎপাদনের সময় ব্যবহৃত উপকরণ দ্রব্য বা সরল সার দ্রব্যের ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এসব রাসায়নিক পরিবর্তনের গতিধারা নির্ধারণের সময় ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা ও মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। কতগুলো প্রধান রূপান্তর সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

ভৌত পরিবর্তন

১. পানিগ্রাহিতা (Hiygroscopicity)

পানিগ্রাহিতা বলতে কোনো দ্রব্যের বায়ুমণ্ডলীর আর্দ্রতা পরিশোষণের আসক্তিকে বোঝায়। কোনো দ্রব্যের পানিগ্রাহিতা বেশি হলে তা বায়ুমণ্ডলীর আর্দ্রতা পরিশোষণ করে গলে যেতে পারে। ইউরিয়া সারের পানিগ্রাহিতা অনেক বেশি। ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, এমোনিয়াম নাইট্রেট ও সোডিয়াম নাইট্রেটও কমবেশি পরিমাণে বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা গ্রহণ করে। এসব দ্রব্য মিশ্র সারে ব্যবহার করলে তা সংরক্ষণ করা খুবই অসুবিধা হয়ে যায়।

২. দলা বাঁধা

কোনো উপকরণ দ্রব্যের আর্দ্রতা বেশি থাকলে তা অন্যান্য দ্রব্যের সাথে দলা বেঁধে গিয়ে মিশ্র সার উৎপাদনে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এই আর্দ্রতা অন্যান্য উপাদানেরও দ্রবণ ঘটাতে পারে। দলা বাঁধা সার প্রয়োগ করতে অসুবিধা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য উপাদানের গুণাবলীও (পানি বাষ্পায়নের পর) বিনষ্ট করতে পারে। ভৌত অবস্থা উন্নয়নকারী বা কন্ডিশনার দ্রব্য ব্যবহার করে এরকম অসুবিধা দূর করা যায়। কন্ডিশনারের দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চীনা-বাদামের খোসার (G.nut husk) চূর্ণ ও কর্দম। দানাদার আকারের মিশ্রণ তৈরি উৎপাদন করেও (মোটামুটি স্থায়িত্বশীল সমান আকারের দানা) এই সমস্যা সমাধান করা যায়।

৩. সেগ্রিগেশন

বিভিন্ন আকারের দানাবিশিষ্ট ও বিভিন্ন ঘনত্ববিশিষ্ট একক উপকারী দ্রব্য মিশিয়ে মিশ্র সার উৎপাদন করলে এগুলো সহজে মিশতে চায় না। বড় বা ভারি দানাগুলো তলানি পড়ে যেতে থাকে। মিশ্রণের এরকম সেগ্রিগেশন এড়ানোর জন্য মিশ্রণ সমাকার দানাবিশিষ্ট করে উৎপন্ন করতে হয়।

রাসায়নিক পরিবর্তন

মিশ্র সার উৎপাদনের সময় তরল সার দ্রব্য বা উপকরণের মধ্যে নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। কয়েকটি প্রধান বিক্রিয়া নিম্নরূপ-

দ্বি-যোজন, প্রশমন, প্রতিস্থাপন, দ্রবীভবন আয়নীভবন ইত্যাদি।

৩। সার প্রয়োগ প্রদ্ধতি

সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিতাত্ত্বিক বিষয়ের মধ্যে সার প্রয়োগ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। সারের প্রকার, পরিমাণ, প্রয়োগ সময়, মৃত্তিকা গুণাবলী ও

ফসলের বৈশিষ্ট্য, উপস্থিত আবহাওয়া এবং প্রয়োগ ব্যয় বিবেচনা করে সার প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয়।

অতএব বলা যায়, ফসলের বৃদ্ধি উন্নয়ন, পরিপুষ্টি ও অধিকতর পরিমাণে ফলন প্রাপ্তির জন্য সকল সার সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হয়। সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ না করার প্রধান অসুবিধা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. সার থেকে পুষ্টি উপাদানের অপচয়ের আশংকা বেড়ে যায়।
২. ফসল উদ্ভিদ প্রয়োজন মোতাবেক পুষ্টি উপাদান পরিশোষণ করতে সক্ষম হয় না।
৩. কোন কোন সময় স্থানীয়ভাবে প্রয়োগকৃত সার উপাদানের বিষাক্ততা সৃষ্টি করে।
৪. সার প্রয়োগজনিত অর্থ ব্যয় ও সময় বেড়ে যায়।
৫. সামগ্রিকভাবে ফসলের ফলন ও মান কমে যায়।

সারের প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণের উদ্দেশ্য, উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য

সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগের মাধ্যমে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সার প্রয়োগ থেকে বেশি অর্থনৈতিক সফলতা লাভ সম্ভব। সার প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণের মূলনীতি বা উদ্দেশ্য নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. ফসলকে সহজভাবে প্রয়োগকৃত পুষ্টি উপাদান পরিশোষণ করার সুযোগ দেওয়া।
২. সার দ্রব্য থেকে ফসল উদ্ভিদে যেন কোনো রকম বিষাক্ততা সৃষ্টি না হয়।
৩. প্রয়োগকৃত সার থেকে পুষ্টি উপাদানের অপচয় কমানো।
৪. সার প্রয়োগ কাজকে সহজ এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করে তোলা।
৫. সার প্রয়োগ দ্বারা নতুন সমস্যা সৃষ্টি না করা।

মাটিতে আবদ্ধকরণ, বিষাক্ততা সৃষ্টি, চলাচল ও অপচয় আশংকা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে সার প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয় যেমন–

১. এমোনিয়া ও অতিরিক্ত পটাশিয়াম বীজের অংকুরোদ্গমে বিষাক্ততা সৃষ্টি করে।
২. মাটিতে ফসফেট আয়ন তেমন চলাচল করতে পারে না অর্থাৎ যেখানে প্রয়োগ করা হয় তার আশেপাশেই এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ থাকে।
৩. পানি চলাচলের সাথে সাথে নাইট্রেট আয়ন, মাটির উপর থেকে নিচ বা পার্শ্ব দিকে ঢালু জমিতে পার্শ্ব চুয়ানীতে চলাচল করতে পারে।
৪. এমোনিয়াম আয়ন কর্দম কণায় আবদ্ধ বা সংযোজিত এবং উপশোষিত হয়ে থাকতে পারে বলে এর চলাচল সীমিত। পটাশিয়াম আয়নও মৃত্তিকা কর্দমে উপশোষিত হয়ে থাকতে পারে।

সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগের উপকারিতা

১. পুষ্টি উপাদানের অপচয়ের আশংকা কম ;

২. পুষ্টি উপাদানের বিষাক্ততা সৃষ্টি হয় না ;
৩. ফসল যথাসময়ে পুষ্টি পরিশোষণ করতে পারে ;
৪. সার প্রয়োগের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বাড়ে ;
৫. অবশিষ্ট প্রভাবজনিত সুফল পাওয়া যায় ;
৬. ফলন বৃদ্ধি পায় ;
৭. সার ব্যবহারজনিত ব্যয় কমে যায় ;
৮. পরিবেশ দূষণের আশংকা কমে যায় ;
৯. বীজের অঙ্কুরোদ্গম ভাল হয় ;
১০. সময় এবং সারের পরিমাণ কম লাগে।

সার প্রয়োগের সময়, প্রকার, পরিমাণ ও পদ্ধতি নির্ধারণের নিচে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করতে হয়, যেমন–

ক) মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য

১. বুনট,
২. আর্দ্রতা ও পানিধারণ ক্ষমতা ;
৩. অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব, চুনের উপস্থিতি ;
৪. উপর ভূমির গভীরতা ;
৫. লবণের পরিমাণ, সোডিয়াম পরিশোষণ অনুপাত (SAR) এবং মোট বিনিময়ী ক্ষারক;
৬. পানি অনুপ্রবেশ হার।

খ) ফসল বৈশিষ্ট্য

১. ফসলের প্রকার ও জাত (ফলনশীলতা),
২. ফসলের বৃদ্ধি পর্যায় ও বয়স,
৩. ফসল ফলানোর উদ্দেশ্য (বীজ, পাতা বা শিকড়),
৪. পূর্ববর্তী ফসল ও ফসল পর্যায়,
৫. ফসলের উৎপাদন সময়সীমা,
৬. ফসলের সেচ প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্যতা,
৭. ফসলের মোট উৎপাদন মূল্য ও বাজারজাতকরণ সুবিধা।

গ) সার বৈশিষ্ট্য

১. সারের প্রকার,
২. প্রধান উপাদানের আকার ও মাটিতে এর চলাচল ;
৩. উপাদান বা আয়নের দ্রবণীয়তা বা সংযোজন ক্ষমতা ;
৪. সারের ভৌত আকার ও প্রকৃতি ;
৫. সারের অম্লাভক ও ক্ষারাভক ;

৬. সারের অবশিষ্ট প্রভাব ;
৭. সারের মূল্য ও পারিমাণ ;
৮. সারের প্রয়োগ ব্যয় ও প্রয়োগ সুবিধা ;
৯. সার হাতে নাড়া-চাড়া করার সুবিধা-অসুবিধা।

ঘ) অন্যান্য উপাদান

১. আগাছার আক্রমণ তীব্রতা ;
২. অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যার মাত্রা ;
৩. রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ,
৪. পানি নিয়ন্ত্রণ সম্ভাব্যতা ,
৫. সার ব্যবহার ক্ষমতা ;
৬. রাষ্ট্রীয় সার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

সার প্রয়োগ পদ্ধতির প্রকার

কৃষি জমিতে ফসল, মৃত্তিকা ও সার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বহু পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা যায়। নিচে সচরাচর ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

ক) ছিটানো পদ্ধতি (হাত বা যন্ত্রের সাহায্য সরাসরি জমিতে সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা)

১. সরল ছিটানো বা মূল (Basal) প্রয়োগ ;
২. পার্শ্ব ছিটানো ;
৩. উপরিপ্রয়োগ।

খ) স্থানীয় প্রয়োগ

১. ব্যান্ড পদ্ধতি ;
২. রিঙ পদ্ধতি ;
৩. সারি পদ্ধতি ;
৪. ড্রিল পদ্ধতি ;
৫. লাঙল তল পদ্ধতি ;
৬. মাডবল পদ্ধতি ;
৭. গভীর প্রয়োগ।

গ) সিঞ্চন পদ্ধতি

১. একক উপাদান প্রয়োগ ;
২. সংরক্ষণ দ্রব্যসহযোগে প্রয়োগ।

ঘ) সেচ পানির সাথে প্রয়োগ

১. তরল সার প্রয়োগ ;
২. মৃত্তিকা ড্রিপ।
৩. ছিটানো, উপরি, পার্শ্ব ও স্থানীয় প্রয়োগ।

১. সার ছিটানো (Broadcast)

এই পদ্ধতিতে জৈব ও রাসায়নিক উভয় প্রকার সারই কঠিন অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। জমি তৈরি করার শেষ পর্যায়ে গোবর ও কমপোস্টজাতীয় সার জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়। জমির উপরে হাতে ছিটানো ছাড়াও আজকাল আয়তনী সার ছিটানোর জন্য বিশেষ প্রকার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এগুলোকে সার বিস্তারক (spreader) বলা হয়। শুষ্ক গুঁড়া করা সকল জৈব সার ও দানাদার রাসায়নিক সার শক্তিচালিত যন্ত্র দ্বারা ছিটানো যায়। হাতে ছিটানোর চেয়ে যন্ত্র দ্বারা ছিটাতে সময় কম লাগে। ছিটানো পদ্ধতিতে জৈব সার, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সার প্রয়োগের পর তা আবার চাষ দিয়ে ভালভাবে উপর মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ভাল হয়। জৈব সার ছাড়াও সাধারণত মাঠ ফসলে বিশেষ করে যে সব ফসলে হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা বেশি যেমন– ধান, গম, সরিষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমগ্র ফসফেট ও পটাশ সার এবং নাইট্রোজেন সারের অংশবিশেষ (প্রারম্ভিক অংশ) ছিটানো প্রয়োগ করা যায়।

চিত্র ১ : সার ছিটানো পদ্ধতি

ছিটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সার প্রয়োগে সুবিধা : শ্রমিক ও সময় কম লাগে
সারের প্রকার : জৈব ও রাসায়নিক মূল সার
প্রধান ফসল : প্রধানত মাঠ ফসল
প্রয়োগ সময় : জমি চাষ দেওয়ার সময় বীজ বপনের ১ থেকে ২ সপ্তাহ আগে

প্রয়োগ পদ্ধতি : হাতে বা যন্ত্র দ্বারা ছিটানো
- মন্তব্য : বাংলাদেশে অতি জনপ্রিয় পদ্ধতি।

২. উপরি প্রয়োগ (Foliar top dress)

জমিতে ফসল কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার পর কঠিনাকার বা দানাদার রাসায়নিক সার উপরিপ্রয়োগ করা হয়। ফসল উৎপাদিত জমিতে গাছের উপর দিয়ে সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করাকে উপরিপ্রয়োগ বলে। সার প্রয়োগের পর তা যেন গাছে লেগে না থাকে সেজন্য সার প্রয়োগের পর জমির গাছের উপর দিয়ে রশি টেনে দিলে ভাল হয়। গাছ ভেজা অবস্থায় জমিতে রাসায়নিক সারের উপরিপ্রয়োগ করা ঠিক নয়, এতে গাছের পাতায় সার লেগে থাকলে পাতার বিষাক্ততাজনিত ক্ষতি হতে পারে। ফসফরাস ও পটাশিয়াম সার সাধারণ উপরিপ্রয়োগ করা হয় না। প্রধানত নাইট্রোজেনের অংশবিশেষ এই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছের বৃদ্ধি পর্যায় ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে জমিতে একাধিক বার উপরিপ্রয়োগ করা যায়। উপরিপ্রয়োগ সাধারণত যন্ত্রপাতি দ্বারা না করে হাতে করা হয়। মিডো (medows) ফসল ও তৃণ ভূমিতে সার উপরি প্রয়োগ করা হয়। বছরের প্রায় সব সময় ফসলাচ্ছাদিত থাকার কারণে এসব জমিতে ফসফরাস এবং পটাশিয়াম সারও এভাবে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যায়। গৌণ উপাদান (micronutrient) সারসমূহ প্রধানত গাছে স্প্রে বা পাতায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

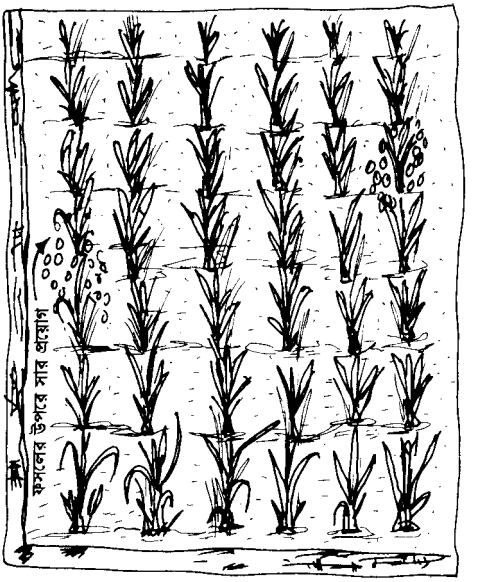

চিত্র ২ : রাসায়নিক সারের উপরিপ্রয়োগ

উপরিপ্রয়োগ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সার প্রয়োগে সুবিধা	:	সার দ্রব্যের কার্যকারিতা বাড়ে
সারের প্রকার	:	প্রধানত ইউরিয়া কিস্তি
প্রধান ফসল	:	ধান, গম, পাট প্রভৃতি মাঠ ফসল
প্রয়োগ সময়	:	চারা রোপণ/বীজ বপনের ২০ থেকে ৬০ দিন বয়সে
প্রয়োগ পদ্ধতি	:	হাতে ছিটানো
মন্তব্য	:	বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।

৩. পার্শ্ব প্রয়োগ (Side dressing)

সারিতে বোনা বা রোপণ করা জমিতে দুই সারির ফাঁকে গাছের গোড়ায় বা পার্শ্বে ছিটিয়ে প্রয়োগ করাকে পার্শ্ব প্রয়োগ বলে। ভুট্টা, আখ, চা, শাক–সবজি, বাঁধাকপি, ওলকপিসহ ১ মিটারের কাছাকাছি দূরত্বের সারিতে লাগানো ফসলে পার্শ্ব প্রয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রধানত নাইট্রোজেনঘটিত সার (সমগ্র অংশ একবারে বা অংশ প্রয়োগ হিসেবে একাধিক বার) পার্শ্ব পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়।

চিত্র ৩ : সারের পার্শ্ব প্রয়োগ

পার্শ্বপ্রয়োগ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সার প্রয়োগে সুবিধা	:	সার দ্রব্যের কার্যকারিতা বাড়ে
সারের প্রকার	:	প্রধানত ইউরিয়া ও মিউরেট অব পটাশ
প্রধান ফসল	:	ভুট্টা, আখ, সরগাম
প্রয়োগ সময়	:	বীজ বপনের ৩০ থেকে ৬০ দিন পর (ইক্ষুর ক্ষেত্রে আরও বেশি)
প্রয়োগ পদ্ধতি	:	হাতে ছিটানো
মন্তব্য	:	বাংলাদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে।

পার্শ্ব প্রয়োগকৃত সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হলেও ফসল ও মাটি বিশেষে সামান্য গভীরে প্রয়োগ করা উত্তম। সারিতে বোনা পানি, তুলা ও আনারসের জমিতে সারের পার্শ্ব প্রয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। চা, কফিসহ বহু বার্ষিক অন্যান্য ফসলে জৈব সার ফসফরাস ও পটাশিয়াম সার প্রয়োগে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আখের মুড়ি ফসল এবং আনারসের দ্বিতীয় বছরের জৈব, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সারের পার্শ্ব প্রয়োগ করা যায়।

স্থানীয় প্রয়োগ পদ্ধতি

মাটির গভীরে উদ্ভিদ শিকড়ের বৃদ্ধিমান অংশের কাছাকাছি স্থানে বা পুষ্টি উপাদান পরিশোষণে সক্ষম (Feeding roots)ও সক্রিয় শিকড়ের কাছাকাছি স্থানে সার প্রয়োগ করা হলে তাকে স্থানীয় প্রয়োগ পদ্ধতি (Local placement) বলে। এই পদ্ধতি সার ব্যবহারের একটি আধুনিক ব্যবস্থা। সাম্প্রতিক- কালে মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক ফলন প্রাপ্তির জন্য স্থানীয় প্রয়োগ পদ্ধতি বিস্তৃতি লাভ করছে। ফসল, মাটি ও সারের প্রকারভেদে স্থানীয় প্রয়োগের বেশ কতকগুলো পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেমন-

১. ব্যান্ড বা বেষ্টনী পদ্ধতি

গাছের এক বা উভয় পার্শ্বে ৫ থেকে ১০ সেমি, নিচে, বা মাটির যত গভীরে বীজ বা চারা রোপণ করা হয়েছে তার ৫ সেমি. নিচে সার প্রয়োগ করাকে ব্যান্ড পদ্ধতি (Band placement) বলে। সারি ফসলের যেমন- গোলআলু, বেগুন, টমেটো, ফলের চারা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে এই অবলম্বন করা যায়। ব্যান্ড পদ্ধতিতে প্রয়োগ করলে সার উপাদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে এঁটেল বুনট সম্পন্ন মাটিতে সার প্রয়োগের জন্য এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর। এতে সমস্ত ফসফরাস ও পটাশিয়াম সক্রিয় উদ্ভিদ। শিকড়ের কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করে (চিত্র ৪)। জমিতে বিচ্ছিন্নভাবে জন্মানো আগাছা এই পুষ্টি উপাদান পরিশোষণের তেমন সুযোগ পায় না। ব্যান্ড পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি হার ত্বরান্বিত হয়। ফসল উদ্ভিদের সাথে ক্ষতিকারক আগাছার প্রতিযোগিতা কম হয়। অবশ্য বীজ বপনের সাথে সাথে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও চুনযুক্ত জমিতে এই পদ্ধতিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা ঠিক নয়। কারণ এক্ষেত্রে ইউরিয়া থেকে এমোনিয়া ও নাইট্রাইট উৎপাদিত হয়ে বীজের অঙ্কুরোদ্গমে বা রোপণ করা চারার বৃদ্ধি ব্যাহত করতে পারে।

বেষ্টনী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সার প্রয়োগে সুবিধা	:	সারের অপচয় রোধ হয়
সারের প্রকার	:	প্রধানত ইউরিয়া ও মিউরেট অব পটাশ
প্রধান ফসল	:	টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম
প্রয়োগ সময়	:	চারা রোপণের ২০ থেকে ৫০ দিন পর
প্রয়োগ পদ্ধতি	:	খুরপি দিয়ে মাটির সাথে মিশানো
মন্তব্য	:	বাংলাদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে।

চিত্র ৪ : বেষ্টনী পদ্ধতি

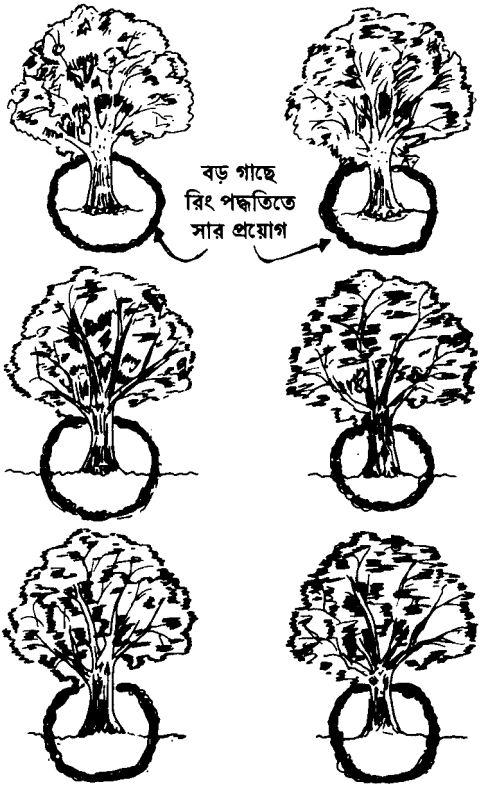

চিত্র ৫ : রিঙ বা গোলাকার পদ্ধতি

২. রিঙ বা গোলাকার পদ্ধতি

বৃহদাকৃতি গাছের চারদিকে গোলাকার নালা কেটে সার প্রয়োগকে গোলাকার বা রিঙ পদ্ধতি বলে (চিত্র ৫)। গাছের গোড়া থেকে নালার দুরত্ব ১ থেকে ৩ মিটার এবং নালার প্রস্থ ও গভীরতা ২০ থেকে ৪০ সেমি. হতে পারে। নারকেল, লেবু, পেয়ারা লিচুসহ অন্যান্য ফল গাছে এই পদ্ধতিতে একই সাথে প্রয়োগ করা যায়। নালা কাটার সময় নালার তলদেশের মাটি শুকিয়ে ও কুপিয়ে গুঁড়া করে এবং নালায় কয়েক দিন রোদ লাগিয়ে তারপর গুঁড়া করা মাটির সাথে সার মিশিয়ে দিতে হয়। সার প্রয়োগের পর নালায় ১০ থেকে ১৫ দিন অন্তর কয়েক বার সেচের ব্যবস্থা করা উত্তম।

রিঙ বা গোলাকার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সার প্রয়োগে সুবিধা	:	সার কম লাগে
সারের প্রকার	:	সকল প্রকার সার
প্রধান ফসল	:	আম, লিচু, কাঁঠাল, নারিকেল, পেয়ারা, লেবু
প্রয়োগ সময়	:	বছরে ২ বার আশ্বিন ও চৈত্র
প্রয়োগ পদ্ধতি	:	কোদাল দিয়ে নালা কেটে সার প্রয়োগ
মন্তব্য	:	বাংলাদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে।

৩. সারি পদ্ধতি (Row method)

দুই সারি ফসলের মাঝখানে নালা করে নালার তলদেশের মাটির সাথে সার মিশিয়ে দিলে সারি পদ্ধতি বলে। সারির মাঝখানে সাধারণত ১০ থেকে ১৫ সেমি. গভীরে এই সার প্রয়োগ করা হয়।

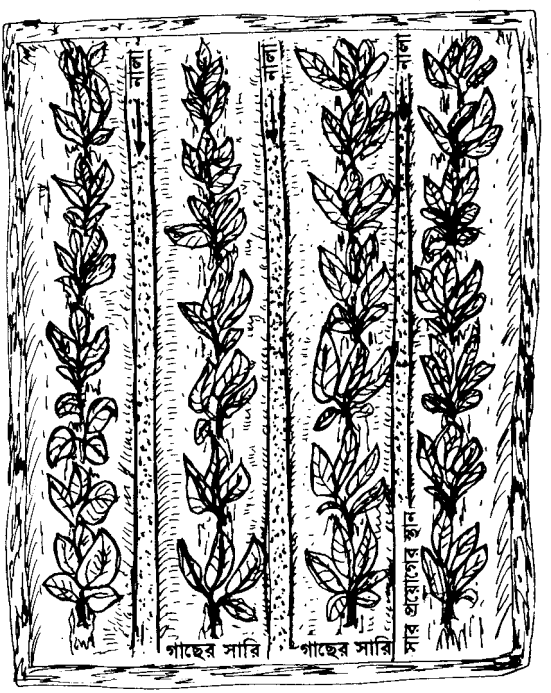

চিত্র ৬ : সারি পদ্ধতি

শাক–সবজি বিশেষ করে শীতকালীন শাক–সবজি, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি কম দূরত্ব সম্পন্ন সারি ফসলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা সুবিধাজনক।

প্রচলিতভাবে জৈব সার, ফসফেট সার ও পটাশিয়াম সার সরল ছিটানো পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য দ্রবণীয় সার এই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা উত্তম। আবহাওয়া ও উপর মাটি শুষ্ক থাকলে নাইট্রোজেন সার হিসেবে ইউরিয়া এই পদ্ধতিতে প্রয়োগ ভাল। কারণ মাটির নিচে তখনো কিছুটা আর্দ্রতা থাকে।

সারি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সার প্রয়োগে সুবিধা	:	সারের কার্যকারিতা বাড়ে
সারের প্রকার	:	প্রধানত ইউরিয়া ও মিউরেট অব পটাশ, কিস্তি
প্রধান ফসল	:	পালং শাক, ধনিয়া, মরিচ, লেটুস, গাজর, মূলা
প্রয়োগ সময়	:	চারা রোপণ/বীজ বপনে ২০ থেকে ৪০ দিন পর
প্রয়োগ পদ্ধতি	:	অগভীর নালা কেটে হাতে ছিটানো ও মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া
মন্তব্য	:	বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়।

৪. ড্রিল পদ্ধতি (Drill method)

যন্ত্রের মাধ্যমে বীজ বপনের সময় সাধারণত বীজের নিচে বা সংলগ্ন আশপাশে সার প্রয়োগ করাকে ড্রিল পদ্ধতি বলে। বীজ বপন যন্ত্র বা সিড ড্রিলের সাথে সংযুক্ত কোনো কোনো যন্ত্র দ্বারা বীজ বপন ও সার প্রয়োগ কাজ একই সাথে সমাধা করা যায়। পাট, গম, তিল, তিসি, সরিষা, প্রভৃতি ফসলে ফসফরাস ও পটাশিয়াম সার বা অন্যান্য বহু উপাদানিক বা যৌগিক সার ড্রিল পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায়। এই পদ্ধতিতে প্রয়োগের জন্য সারের প্রকার মনোনয়নে সাবধান হতে হয়।

বীজ ও সারে মিশ্রিত হয়ে বীজের অঙ্কুরোদ্গমে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে এই পদ্ধতি অবলম্বন না করাই ভাল। আমাদের দেশে এসব পদ্ধতির ব্যবহার এখনো সীমিত। তবে সহজে প্রয়োগ করার উপযোগী যৌথ ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবন করা হলে এবং সারিতে বীজ বপন ও সার প্রয়োগ একই সাথে সামাধা করা সম্ভব হলে ড্রিল পদ্ধতির ব্যবহার সম্প্রসারিত হতে পারে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে ড্রিল পদ্ধতিতে অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে অধিক জমিতে সার প্রয়োগ করা যায়। এই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হলে ফসফরাস ও পটাশিয়াম সারের কার্যকারিতা বেশ বৃদ্ধি পায়। ফসলের বৃদ্ধি উন্নয়ন ভাল হয়।

৫. লাঙল তল পদ্ধতি (Plough Bole method)

লাঙলের ফালের নিচের স্তরের মাটিতে সার প্রয়োগ করা হলে একে লাঙল তল পদ্ধতি বলে। লাঙলের সাথে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা বা বিশেষ যন্ত্র জুড়ে দিয়ে একই সাথে জমি চাষ ও সার প্রয়োগ করা যায়। আমাদের দেশে এরকম পদ্ধতির ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। ফসফরাস ও পটাশিয়াম সার প্রয়োগের জন্য এই পদ্ধতি সম্ভাবনাময়।

সিঞ্চন, গভীর ও সেচ পানিতে সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পদ্ধতি : সার প্রয়োগের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলে আমাদের দেশীয় উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব।

সিঞ্চন পদ্ধতি

সিঞ্চন যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে তরল সার প্রয়োগ করা হলে একে সিঞ্চন প্রয়োগ (Spraying) বলে। অল্প অল্প পরিমাণে এই পদ্ধতিতে ইউরিয়া সার জমিতে প্রয়োগ করা যায়। কোনো কোনো সময় ছত্রাকনাশক বা কীটনাশক ওষুধের সাথে বিভিন্ন সার উপাদান জমিতে প্রয়োগ করা যায়। অণু পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা দিলে তা সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে গাছের পাতায় প্রয়োগ করা হয়। এতে সার উপাদান দ্রুতগতিতে কার্যকর হয়ে উদ্ভিদের পুষ্টি বিধান করে।

সিঞ্চন প্রয়োগকে অনেক সময় পাতা প্রয়োগও বলা হয়। সাধারণত কৃষিতাত্ত্বিক ফসলের বিস্তৃত মাঠে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সারের দ্রবণ বা সিঞ্চন প্রয়োগের সুপারিশ করা হয় না। কারণ এসব সারের তরল (পানি) পরিমাণ এতো বেশি লাগে যে তাতে প্রয়োগ ব্যয় ও সময় অনেক বেড়ে যায় এবং বিষাক্ততাও দেখা দিতে পারে। এসব সারের কার্যকারিতাও এই পদ্ধতিতে কমে যেতে পারে। ফল বাগানে এবং অন্যান্য কিছু মূল্যবান ফসলের ক্ষেত্রে অণু উপাদান প্রয়োগের জন্যই সিঞ্চন প্রয়োগ সবচেয়ে উপযোগী। মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী প্রতিকূল হলে অণু পুষ্টি উপাদান সার শীঘ্র কার্যকর হয় না। সেক্ষেত্রে সিঞ্চন প্রয়োগ বিবেচনায় আসতে পারে।

তাছাড়া গৌণ উপাদানের ক্ষেত্রে সারের পরিমাণও খুব কম থাকে। কোনো কারণে গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে ত্বড়িৎ কার্যকারিতা প্রাপ্তির জন্য ও সার দ্রব্যের সিঞ্চন প্রয়োগ করা যায়।

কীটনাশক ও রোগনাশক দ্রব্য এবং সেচ পানির উপর প্রয়োগের সাথে আধুনিককালে সার উপাদানের তরল বা সিঞ্চন প্রয়োগ গুরুত্ব লাভ করছে।

অবশ্য যে সকল সার তরল আকারে বাজারজাত করা হয় (যেমন–তরল এমোনিয়া এবং অণু উপাদান দ্রবণ) সেগুলো সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করা যায়। তবে সাধারণভাবে সিঞ্চন পদ্ধতিতে কম পরিমাণে প্রয়োজনীয় সারসমূহ প্রয়োগ করা সুবিধাজনক।

সিঞ্চন প্রয়োগ হার

নিচে অণু পুষ্টি উপাদান সারের সিঞ্চন প্রয়োগের হার বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া হলো–

ক) ম্যাঙ্গানিজ—ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ৪ থেকে ১০ কেজি/হেক্টর, ২৫০ গ্যালন পানিতে দ্রবীভূত হয়, ১ থেকে ২.৫ কেজি ম্যাঙ্গানিজ/হেক্টর)

খ) লোহা ফেরাস সালফেট ৪ থেকে ৬% দ্রবণ,

গ) জিঙ্ক–জিঙ্ক সালফেট ৩ থেকে ৪ কেজি/১০০ গ্যালন পানি

ঘ) মলিবডেনাম ১ কেজি/হেক্টর, সোডিয়াম মলিবডেট।

অণু পুষ্টি উপাদানসমূহের প্রয়োগ মাত্র নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের চেয়ে অনেক কম বলে সিঞ্চন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায়।

মাডবল প্রয়োগ

কাদা দ্বারা তৈরি বলের অভ্যন্তরে সার দ্রব্য হাত দ্বারা মাটির গভীরে প্রবেশ করিয়ে সার প্রয়োগ করাকে মাডবল (Mud ball) গভীর প্রয়োগ পদ্ধতি বলে। এটি একটি সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত পদ্ধতি। এশিয়া মহাদেশে ও উষ্ণ আর্দ্র আঞ্চলের ধানের জমিতে (ধানের প্রতি ৪টি চারা বা গুছির মাঝখানে একটি মাডবল হিসেবে) এই পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করে ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে ও অধিক অপচয় আশংকাযুক্ত নাইট্রোজেন সার (যেমন, ইউরিয়া) এই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে এর কার্যকারিতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশে এই পদ্ধতি এখনো ব্যাপকতা লাভ করে নাই।

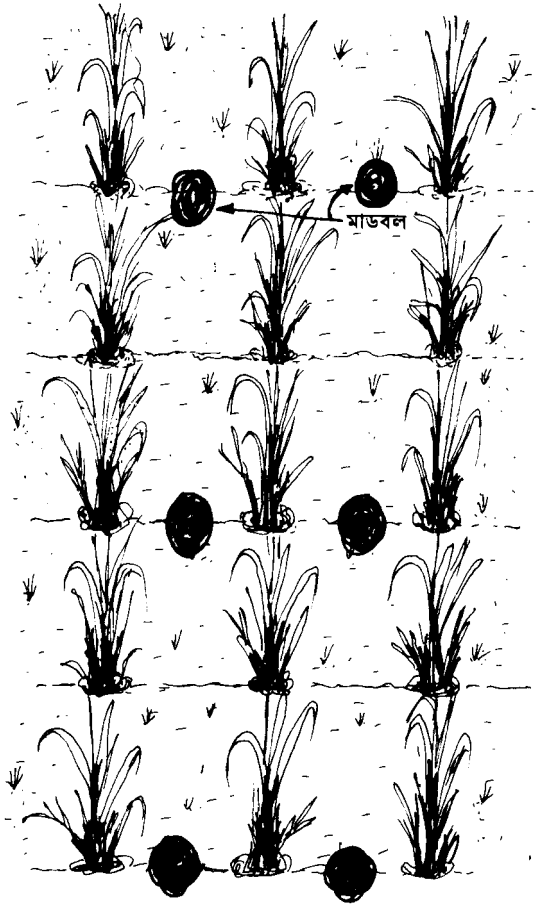

চিত্র ৭ : মাডবল প্রয়োগ

মাডবল প্রয়োগ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সার প্রয়োগে সুবিধা	:	সারের কার্যকারিতা বাড়ে
সারের প্রকার	:	ইউরিয়া মাডবল
প্রধান ফসল	:	রোপণ ধান
প্রয়োগ সময়	:	চারা রোপণের মাস খানেকের মধ্যে
প্রয়োগ পদ্ধতি	:	৪টি ধানের গুছির মাঝখানে হাতে আঙুলে দাবিয়ে দেওয়া
মন্তব্য	:	বাংলাদেশে প্রচলনের চেষ্টা চলছে।

গভীরপ্রয়োগ

আজকাল বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সার উৎপাদনকারী সংস্থা বড় দানার আকারে (একটি দানার ওজন প্রায় ১ গ্রাম) সার উৎপাদন করছে। এসব সুপার দানা মাডবলের অনুরূপ মাটির গভীরে প্রয়োগ (Deep Placement) করা হয়। প্রধানত ধানের জমিতে নাইট্রোজেন সার (ইউরিয়া) ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকর হয়। গভীর প্রয়োগ পদ্ধতির একটি শর্ত হচ্ছে সার বড় দানার আকারে উৎপাদন করতে হয়। একক উপাদান ব্যতীত একাধিক উপাদানের ফর্মুলেশনে এ ধরনের সার বা যৌগিক সার উৎপাদন সম্ভব। সার দ্রব্য দুই বা তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করলে একে যৌগিক সার বলা হয়। ধানের জমিতে ইউরিয়া সুপার দানার কার্যকারিতা বাংলাদেশে কিছুটা বেশি বলে জানা গেছে।

সেচ পানিতে সার প্রয়োগ

বহুকাল আগে থেকেই সেচের পানির সাথে সার প্রয়োগ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অনেক আগেও সেচের নালায় গোবর ফেলে রাখা হতো। বর্তমানকালে এনহাইড্রাস এমোনিয়া বা অন্যান্য সারদ্রব্য সেচের পানির সাথে পরিমাপক মিটার সংযুক্ত করে প্রয়োগ করা হয়। বর্ষণ সেচের সাথে সার দ্রবণ প্রয়োগ করা যায়।

সেচের পানির সাথে যে সার দ্রব্য প্রয়োগ করা যায় বা যায় না সে সম্পর্কিত বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক) যেসব সার প্রয়োগ করা যায়

ইউরিয়া, এমোনিয়াম সালফেট, এমোনিয়াম নাইট্রেট, মিউরেট অব পটাশ, পটাশিয়াম সালফেট, পানি-দ্রবণীয় বোরাক্স বা বোরেট, এমোনিয়াম পলিফসফেট (১৫-৬০-০), এমোনিয়াম ফসফেট (১৩-৩৯-০, ১১-৪৮-০), ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট (২১-৫৩-০), তরল এমোনিয়াম ফসফেট (৮-২৪-০), ইউরিয়া এমোনিয়াম ফসফেট (২৫-৩৫-০)।

খ) যেসব সার প্রয়োগ করা উচিৎ নয়

ফসফরিক এসিড, এনহাইড্রাস এমোনিয়া দ্রবণ (একুয়া এমোনিয়া) এই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করলে এসব এমোনিয়া সারের নাইট্রোজেন অধিক হারে অপচয় হতে পারে এবং ফসফরিক এসিড গাছের কিছুটা ক্ষতি করে, যদিও সবগুলোই পানি-দ্রবণীয় অবশ্য সেচের পানির সাথে এমোনিয়া সারের ব্যবহার অনেক উন্নত দেশে বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে।

গ) যেসব সার প্রয়োগ করা যায় না

সুপার ফসফেটজাতীয় সার, উপাদানিক সালফার, জিপসাম, চুন ও কিছু মিশ্র সার। এসব দ্রব্য পানিতে সমভাবে দ্রবীভূত হয় না।

এখানে উল্লেখ্য, সেচ পানিতে পরিমাণ মতো সার দ্রবীভূত করে নিতে হয়। তারপর পানিপ্রবাহ মেপে সারের বা প্রদত্ত উপাদানের মোট পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বর্ষণ প্রয়োগের সাথে সার উপাদানের উদ্ভিদ দেহে চলাচল ক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উপাদানের উদ্ভিদের অভ্যন্তরে চলাচল ২১ নং সারণিতে উপস্থাপিত হলো।

সারণি ২১ : উদ্ভিদের অভ্যন্তরে পুষ্টি উপাদান চলাচলের বিবরণ

চলাচলকারী	আংশিক চলাচলকারী	চলাচল করে না	মন্তব্য
নাইট্রোজেন	জিঙ্ক	ক্যালসিয়াম	চলাচলের মাধ্যমে
পটাশিয়াম	কপার	ম্যাগনেশিয়াম	পাতা থেকে
ফসফরাস	ম্যাঙ্গানিজ	ম্যাগনেশিয়াম	অন্যান্য অংশে
ক্লোরিন		ম্যাগনেশিয়াম	পরিবাহিত হয়।
সালফার	মলিবডেনাম		

উপর থেকে নিচে ক্রমানুসারে চলাচল বেশি। উৎসঃ বুকাভাক ও উইটার ,১৯৬১।

তরল সার প্রয়োগ

নাইট্রোজেন সার হিসেবে এনহাইড্রাস এমোনিয়া লাঙল তল বা তরল আকারে সেচের পানির সাথে প্রয়োগ করা যায়। মৃত্তিকা নিষেক পদ্ধতিতেও এসব সার প্রয়োগ করা যায়। মৃত্তিকা নিষেক ও মৃত্তিকা ড্রিপ একই ধরনের পদ্ধতি। আধুনিক কৃষি বিশ্বে এমোনিয়া সার প্রয়োগ বেশ ব্যাপকতা লাভ করছে।

সার প্রয়োগের পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

ছিটানো পদ্ধতিতে সুবিধা

১. সার প্রয়োগজনিত বিষাক্ততার আশংকা কম বলে একই সাথে বা অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগ করা যায়।

২. সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করলে শ্রম ও সময় ব্যয় কম হয়। অবশ্য শক্তিচালিত ছিটানো যন্ত্র ব্যবহার করলে জ্বালানিজনিত অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে।

৩. জমিতে দ্রুত বীজ বপন বা রোপণ করা যায়, কারণ সারের সহনীয় প্রয়োগের চেয়ে এতে ঝামেলা কম।

৪. কঠিন আকারের সব সার দ্রব্য ও জৈব সার অতি সহজে ছিটানো পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায়।

৫. সার দ্রব্য ছিটিয়ে প্রয়োগ করে চাষ দ্বারা মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে (বিশেষ করে ফসফরাস ও পটাশিয়াম) উদ্ভিদের শিকড়ে অধিক পার্শ্ব বিস্তার ঘটে। স্থানীয় প্রয়োগ শিকড়ের বৃদ্ধি কেবল সার প্রয়োগ স্থানেই অধিকতরভাবে সীমাবদ্ধ রাখে।

৬. বিপুল আয়তনের জমিতে সার প্রয়োগ করার অর্থনৈতিক ও উত্তম পদ্ধতি হিসেবে ছিটানো পদ্ধতি অধিক বিবেচিত হয়।

৭. শ্রমিক স্বল্পতার সময়ে সার প্রয়োগের জন্য ছিটানো পদ্ধতি অধিক সুবিধাজনক।

৮. স্থায়ী তৃণভূমিতে ছিটানো পদ্ধতি অত্যাবশ্যক।

৯. মিশ্র ফসল ও অনুফসল (Relay crop) ছিটানো পদ্ধতি উত্তম।

ছিটানো পদ্ধতিতে অসুবিধা

১. মাটিতে ফসফরাস ও পটাশিয়ামের আবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এঁটেল বুনটসম্পন্ন মাটিতে প্রয়োগ করলে আবদ্ধ হওয়ার কারণে ফসফরাস ও পটাশিয়াম প্রাপ্যতা ও কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।

২. চাষ দ্বারা মাটির সাথে মিশানো হয় বলে পুষ্টি উপাদানের ঘনত্ব কম হয়। এজন্য ফসল উদ্ভিদের প্রারম্ভিক বৃদ্ধি বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদি ফসলের যেমন শাক-সবজি, গোলআলু ও পেঁয়াজের বৃদ্ধি হার কম হতে পারে।

৩. জমির সব স্থানে পুষ্টি উপাদান সমভাবে থাকে বলে আগাছার প্রকোপ বেড়ে যায়।

৪. ছিটানো পদ্ধতিতে সারের অপচয় কিছুটা বেশি হতে পারে।

৫. প্রয়োগের পর মাটির সাথে গভীরভাবে মিশিয়ে না দিলে ফসফরাস ও পটাশিয়াম সারের কার্যকারিতা কম হতে পারে।

৬. সাধারণত মাঠ ফসলে অণু উপাদান সার প্রয়োগ করা হয় না বা প্রয়োগ করলেও সার বিশেষে কার্যকারিতা কম হয়।

স্থানীয় প্রয়োগ পদ্ধতিতে সুবিধা

১. সার দ্রব্যের কার্যকারিতা বাড়ে। অর্থাৎ অল্প সার প্রয়োগ করে অধিক ফসল পাওয়া যায়।

২. শিকড়ের কাছাকাছি স্থানে সার প্রয়োগ করা হয় বলে গাছ তাড়াতাড়ি বড় হয়।

৩. স্বল্পমেয়াদি ফসলের জন্য এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর।

৪. সার থেকে উপাদানের অপচয় হওয়ার আশংকা কমে যায়।

৫. একই জমিতে প্রয়োগের জন্য ছিটানো পদ্ধতির চেয়ে স্থানীয় প্রয়োগে সারের পরিমাণ কম লাগে।

স্থানীয় প্রয়োগ পদ্ধতিতে অসুবিধা

১. শিকড়ের কাছাকাছি স্থানে প্রয়োগ করা হয় বলে সারের পরিমাণ ইউরিয়া বেশি হয়ে গেলে উৎপাদিত এমোনিয়া সাময়িকভাবে শিকড়ে বিষাক্ততা সৃষ্টি হতে পারে।

২. দেশীয় গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে সময় ও শ্রম বেশি লাগে।

৩. শিকড়ের পুষ্টি উপাদান পরিশোষণ এলাকা কম থাকায় শিকড়ের বিস্তৃতি বা গভীরতা কম হয়।
৪. জমিতে ফসল থাকা অবস্থায় প্রয়োগ করা হলে ফসল উদ্ভিদের কিছু কিছু শিকড় ছাটাইজনিত কারণে সার মিশিয়ে দেওয়ার জন্য কোদলানোর সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
৫. প্রয়োগ করার সময় মাটিতে আর্দ্রতা বেশি থাকলে সার প্রয়োগ অসুবিধা হতে পারে।

সিঞ্চন প্রয়োগ পদ্ধতিতে সুবিধা

১. সার প্রয়োগের মাধ্যমে গৌণ উপাদানের অপুষ্টি ঘাটতি পরিপূরণে এই পদ্ধতি অধিক ব্যবহৃত হয়।
২. হাল্কা বুনট বা বেলে মাটিতে চুয়ানী কম হয় বলে সারের কার্যকারিতা থাকে।
৩. এই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা সারের অংশবিশেষ মাটিতে পতিত হলেও তা পরিশোষিত হতে পারে।
৪. অধিক পরিমাণ সার মূল সার হিসেবে মাটিতে প্রয়োগ করার পর অংশবিশেষ সিঞ্চন প্রয়োগ করা অধিক সুবিধাজনক।
৫. প্রতিকূল অবস্থার কারণে মাটিতে সরাসরি সার প্রয়োগ সম্ভব না হলে সিঞ্চন প্রয়োগ করা যায়। সিঞ্চন প্রয়োগ মাটিতে আর্দ্রতা কম থাকলেও চলে।
৬. তরল সার প্রয়োগে সুবিধা হয় সার উপাদানের অপচয় তুলনামূলক কম হয়।
৭. মাটিতে জিঙ্ক ও ফসফরাস আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে জিঙ্ক প্রয়োগের জন্য সিঞ্চন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।
৮. তরল রোগ-পোকানাশক দ্রব্যের সাথে মিশিয়েও প্রয়োগ করা যায়।

সিঞ্চন প্রয়োগের অসুবিধা

১. পাতায় পরিশোষিত হওয়ার পর উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে পরিবহণ সহজতা সব উপাদানের সমান নয়। যেমন-ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সহজে পরিবাহিত হতে পারে না। জিঙ্ক, কপার ম্যাঙ্গানিজের আংশিক পরিবহণ সংঘটিত হতে থাকে। অবশ্য নাইট্রোজেন সহজে চলাচল করতে পারে।
২. এই পদ্ধতি বেশ ব্যয়বহুল। বিশেষ করে অধিক তরলীকৃত সার প্রয়োগ করলে তা বেশ সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে।
৩. সার দ্রব্যের মোট পরিমাণ বেশি হলে তা সিঞ্চন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায় না।
৪. উপাদান বিশেষে সার বা দ্রবণের ঘনত্ব বেশি হয়ে গেলে ফসলের ক্ষতি হয়।
৫. আর্দ্র আবহাওয়ায় বা বৃষ্টি পূর্ণ দিনে এই পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ না করা ভাল। প্রয়োগ করলেও সারের অপচয় বেড়ে যায়।
৬. প্রয়োগের জন্য আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি দরকার।

৭. বাণিজ্যিক সারে ব্যবহৃত পরিপূরণকারী ও অন্যান্য অবিশুদ্ধ দ্রব্য গাছের পাতায় বিষাক্ততা সৃষ্টি করতে পারে।

জমিতে সার প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণে মৃত্তিকা গুণাবলীর প্রভাব

প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণে ফসলের প্রকার ও সারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে তা মৃত্তিকার গুণাবলীর উপরও নির্ভরশীল। মাটির এতদসংশ্লিষ্ট ধর্মের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

ভৌতধর্ম

১. মাটির বুনট, লাঙল স্তর ও নিম্নভূমিতে মৃত্তিকা একক কণার পারস্পরিক অনুপাত।
২. কর্দম কণার প্রকার ১:১, ২:১, ২:২ সিলিকেট ও হাইড্রাস অক্সাইডসমূহ।
৩. পানি ধারণক্ষমতা—মোট ও প্রাপ্য পানি ধারণক্ষমতা।
৪. মাটির তাপ—তাপাঙ্ক/ তাপ ক্ষমতা ও তাপ পরিবর্তন।

রাসায়নিক ধর্ম

১. অম্লমান : ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লোহা এবং এলুমিনিয়ামের উপস্থিতি।
২. লবণ ও আয়ন, চুন দ্রব্যের উপস্থিতি ও লবণাক্ততা, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা।
৩. মাটির বাফার ক্ষমতা : মৃত্তিকা দ্রবণের রাসায়নিক প্রকৃতি ও কলয়ডের উপস্থিতি।

জৈবিক ধর্ম

১. জৈব পদার্থের পরিমাণ—মোট বিযোজনযোগ্য জৈব পদার্থ ও হিউমাস।
২. অণুজীবের প্রকার—সবাত ও অবাত অণুজীবের সংখ্যা-ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও একটিনোমাইসেটিস।
৩. উপকারী অণুজীবের সংখ্যা—জৈব পদার্থ বিযোজনকারী, নাইট্রিকরণ, নাইট্রোজেন সংযোজনও অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত গুণাবলীর মধ্যে মাটির বুনট, কর্দমের প্রকার, মাটির অম্লমান ও চুনের উপস্থিতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মাটির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, আয়ন বিনিময় ক্ষমতা বাফার, অণুজীব কার্যাবলী পরস্পরযুক্ত এবং এগুলো সামগ্রিকভাবে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অণুজীব কার্যাবলী পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলো সামগ্রিকভাবে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী প্রভাবিত করে।

রাসায়নিক সারের প্রয়োগ পদ্ধতিতে কর্দমের প্রভাব

এঁটেল মাটিতে কর্দমের মধ্যে ২ঃ১ প্রকারের কর্দম কণা বেশি থাকলে ধনাত্মক আয়নে সংযোজন বেশি হয় বলে স্থানীয় প্রয়োগ পদ্ধতি অধিক কার্যকর হয়।

মাটির রাসায়নিক ধর্মে সার দ্রব্যের প্রভাব

মাটির রাসায়নিক গুণাবলীর মধ্যে অম্লমানের উপর বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক ও জৈব সারের প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কোন জমিতে বহু দিন যাবৎ অম্লীয় সার ব্যবহার করলে এবং সে জমিতে প্রয়োজনমত চুন প্রয়োগ করা না হলে মাটির অম্লত্ব বেড়ে যেতে পারে। তাই যে কোনো জমিতে সার প্রয়োগ করার সময় এতে অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব সৃষ্টির সম্ভাব্যতা আবশ্যকভাবে বিবেচনা করতে হয়। এগুলো সকল দ্রব্যের গুরুত্বপূর্ণ 'ধর্ম। মাটির রাসায়নিক গুণাবলী, উর্বরতা, উপাদান ক্ষমতা, চুন প্রয়োগ ও পরিশোধন কার্যক্রমের জন্য সার দ্রব্যে অম্লাঙ্ক ও ক্ষারাঙ্ক সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

সারণি ২২ : সারের প্রয়োগ পদ্ধতি, মাটির গুণাবলী ও ফসল উপযোগিতা

প্রয়োগ পদ্ধতি	সার	মাটির প্রকার	প্রধান ফসল
সরল ছিটানো	সকল কঠিন আকারের সার	অধিকাংশ মাটি	অধিকাংশ মাঠ ফসল
পার্শ্ব প্রয়োগ	নাইট্রোজেন	ভারি মধ্যম	সারি ফসল
উপরিপ্রয়োগ	ফসফরাস ও পটাশিয়াম	অধিকাংশ মাটি	বহুবর্ষজীবী সারি ফসল
উপরিপ্রয়োগ	ফসফরাস ও পটাশিয়াম	অধিকাংশ মাটি	তৃণভূমি রেন্জু ও মিডো
লাঙল তল	ফরফরাস ও পটাশিয়াম	অধিকাংশ মাটি	সারি ফসল
ব্যান্ড প্রয়োগ	সকল সার	মধ্যম ও ভার বুনট	স্বল্পমেয়াদী সারি ফসল
রিঙ পদ্ধতি	সকল সার	অধিকাংশ মাটি	ফল বৃক্ষ
মাডবল এবং গভীর প্রয়োগ	প্রধানত নাইট্রোজেন	কর্দমাক্ত মাটি	ধান
সিঞ্চন পদ্ধতি	গৌণ উপাদান	প্রতিকুল মাটি	প্রধানত সবজি ও ফল গাছ।

অম্লাঙ্ক

কোনো জমিতে ১০০ একক পরিমাণ কোনো সার ব্যবহারের পর যে অম্লত্ব উৎপাদিত হয় এবং তা প্রশমিত করার জন্য যে পরিমাণ চুন প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত সার দ্রব্যের অম্লাঙ্ক বলে। কোন জমিতে ১০০ কেজি ইউরিয়া বা ১০০ কেজি এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট অম্লত্ব প্রশমের জন্য ৮০ ও ১১০ কেজি চুন প্রয়োগ করতে

হয়। অর্থাৎ ইউরিয়া ও এমোনিয়াম সালফেটের অম্লাঙ্ক যথাক্রমে ৮০ ও ১১০ এমনিভাবে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি করে। কারণ প্রতিটি রাসায়নিক সারের নির্দিষ্ট অম্লাঙ্ক মান (সংখ্যা) রয়েছে। এখানে চুন বলতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা এর সমমানের চুন দ্রব্য বিবেচনা করা হয়।

ক্ষারাঙ্ক

কোনো জমিতে ১০০ একক পরিমাণ সার দ্রব্য ব্যবহারের পর যে ক্ষারত্ব সৃষ্টি হয় এবং তা প্রশমিত করার জন্য যে পরিমাণ অম্লীয় দ্রব্য প্রয়োগ করতে হয়, তাকে সেই সার দ্রব্যের ক্ষারাঙ্ক বলে।

সারণি ২৩ : বিভিন্ন সার দ্রব্যের অম্লাঙ্ক ও ক্ষারাঙ্ক

সার	অম্লাঙ্ক	ক্ষারাঙ্ক
এমোনিয়া সালফেট	১১০	—
এনহাইড্রাস এমোনিয়া	১৪৮	—
ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	—	২০
সোডিয়াম নাইট্রেট	—	২৯
এমোফস	৫০	—
ইউরিয়া	৮৪	—
সায়ানেমাইড	—	৬৩
পটাশিয়াম নাইট্রেট	—	২৬
কেলনাইট্রো	২১	—
ইউরিয়া এমোনিয়া লিকার	৮২	—
শুষ্ক রক্ত	২৩	—
পেরুভিয়ান গুয়ানো	১৪	—
গেরবেজ টেংকেজ	—	৭
প্রসেস টেংকেজ	—	১৫
তুলাবীজ মিল	৯	—

৪। কমপোস্ট সার

বর্তমানে সচরাচর ব্যবহৃত জৈব সার যেমন- গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, চা-পাতা, খৈল, হাড়ের গুঁড়া, শিং গুঁড়া, শুকনো রক্ত, কোনোটাই এককভাবে সুষম সার নয়। কিন্তু এসব বর্জ্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে এক্টিভেটর দ্বারা পঁচিয়ে পরিশোধন করে ও শুকিয়ে কমপোস্ট তৈরি করলে তা সুষম সারে পরিণত হয়। এভাবে তৈরি সুষম সার ফসলের ফলন ও গুণাগুণ বাড়ায়। ফসলে রোগ-পোকার আক্রমণ কম হয়।

নিচে কমপোস্ট সার ও সাধারণ জৈব দ্রব্যের পার্থক্য দেখানো হলো।

সারণি ২৪ : সাধারণ জৈব দ্রব্য ও কমপোস্ট সারে পার্থক্য

সাধারণ জৈব দ্রব্য	কমপোস্ট সার
মাটিতে পচাতে মিশতে সময় লাগে	মাটিতে সহজে পচে-মিশে যায়
আর্দ্রতা ও আয়তন বেশি, দুর্গন্ধ আছে	আর্দ্রতা ও আয়তন কম দুর্গন্ধ নাই
পুষ্টির পরিমাণ কম ২ থেকে ৫%	পুষ্টির পরিমাণ বেশি করা যায় ৮ থেকে ১৫%
অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করে	পরিবেশ স্বাস্থ্যকর থাকে
সরাসরি ব্যবহার হয়	প্রক্রিয়াকরণে কর্মসংস্থান হয়
পরিবহণ অসুবিধাজনক	পরিবহণ খুবই সুবিধাজনক
প্রধানত এক ধরনের হয়	বিভিন্ন ফর্মুলায় তৈরি করা যায়

কমপোস্ট উৎপাদনের বিস্তারিত পদ্ধতি "পরিবেশ বিজ্ঞান মৃত্তিকা জীব ও জৈব সার গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল কয়েকটি প্রশাসনিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরা হলো।

কমপোস্ট তৈরির আধুনিক পদ্ধতি

দিনে দিনে কমপোস্ট দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কমপোস্ট তৈরির জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি নতুন উন্নত পদ্ধতি হলো আবর্জনা দ্রব্য দ্রুত পচানোর জন্য জীবাণু বা এক্টিভেটর ব্যবহার করা।

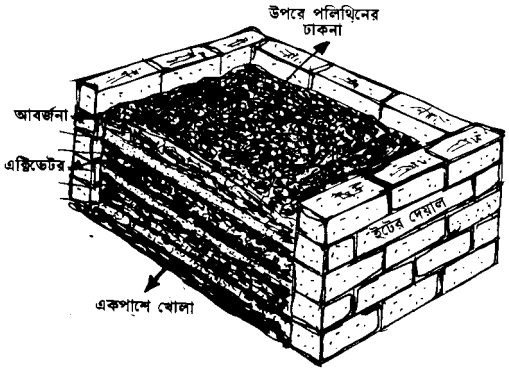

চিত্র ৮ : কমপোস্ট কাঠামো

কমপোস্ট কাঠামো তৈরির নিয়ম : কমপোস্ট তৈরির অর্ধস্থায়ী পাকা কাঠামো। তিন পাশে ইটের দেওয়াল তৈরি করে এবং তাতে আবর্জনা ও এক্টিভেটর দিলে সহজেই পচে যায়। বসত-বাড়ি, হাট-বাজার এবং পৌরসভার স্থানে স্থানে এই পদ্ধতিতে সহজেই কমপোস্ট তৈরি করে তা মাঠে ব্যবহার করা যায়। এক থেকে দুই মিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় এই কাঠামো তৈরি করাও সহজ, ব্যয়ও কম। আবর্জনা ফেলে পানিও এক্টিভেটর দেওয়ার পর একটি পলিথিন শিট দ্বারা ঢেকে দিলে তেমন দুর্গন্ধও হয় না, অথচ আবর্জনা দ্রুত পচে যায়।

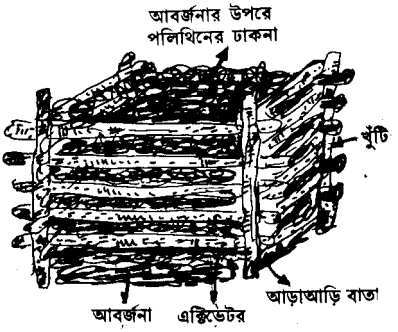

চিত্র ৯ : কমপোস্ট তৈরির অস্থায়ী কাঠামো।

অস্থায়ী কমপোস্ট কাঠামো তৈরির নিয়ম : কমপোস্ট তৈরির জন্য পাকা কাঠামো স্থাপন করা ব্যয়সাধ্য মনে হলে বা সুবিধা না থাকলে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ছোট ছোট খুটি দ্বারা অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা যায়। এই কাঠামোতেও আবর্জনা, এক্টিভেটর ও পানি দিয়ে চেলে দিলে তুলনামূলকভাবে দ্রুত আবর্জনা পচে যায়। গাছের ডাল-শাখা বাঁশের চটি, বর্জ্য খুটির অংশ ও আড়াআড়ি বাতা দিয়ে সহজেই এই কাঠামো তৈরি করা যায়। বসত-বাড়ি, খামার, এমনকি জমির পাশেও এই কাঠামো তৈরি করা যায়। কমপোস্ট তৈরির এটি একটি গ্রামীণ পদ্ধতি। এক থেকে দুই মিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার কাঠামো তৈরি করা উত্তম।

নানাভাবে এভাবে কমপোস্ট উৎপাদন করা যায় যেমন—

ক. জমির এক কোণায় আবর্জনা জমিয়ে তাতে এক্টিভেটর দিয়ে পলিথিন কাগজ দ্বারা ঢেকে রাখা।

খ. নির্দিষ্ট আকার আকৃতির কমপোস্ট ড্রামে আবর্জনা জমিয়ে তাতে এক্টিভেটর ব্যবহার করা। বাড়ির এক কোণায় বা ছাদেও এ ধরনের কমপোস্ট ড্রাম ব্যবহার করা যায়।

গ. টবে বা গাছ রোপণ গর্তে আবর্জনা জমিয়ে এক্টিভেটর প্রয়োগ করলে অল্প দিনের মধ্যেই তা পচে গিয়ে গাছ রোপণের উপযোগী হয়।

এখানে চিত্রের মাধ্যমে বেড়ার অভ্যন্তরে, ড্রামে এবং পাকা কাঠামোয় কমপোস্ট তৈরি এবং আবর্জনা চূর্ণ করার স্বব্যাখ্যাকৃত চিত্র দেওয়া হলো।

জালের কাঠামো তৈরি

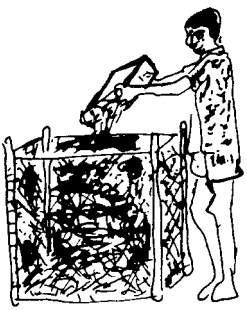

কাঠামোতে আবর্জনা ফেলানো

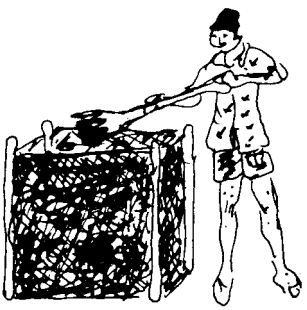

আবর্জনাভর্তি কাঠামো

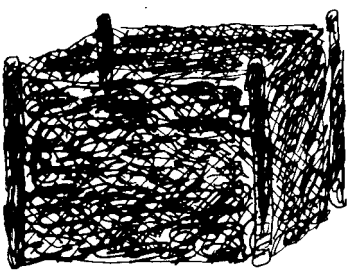

স্তূপীকৃত আবর্জনা পচানো

চিত্র ১০ : জালের তৈরি কমপোস্ট কাঠামো

(উদ্ভিদ জৈব আবর্জনা থেকে কমপোস্ট তৈরির জন্য কোন তার জাল ও খুঁটি দিয়েও কমপোস্ট কাঠামো তৈরি করা যায়।)

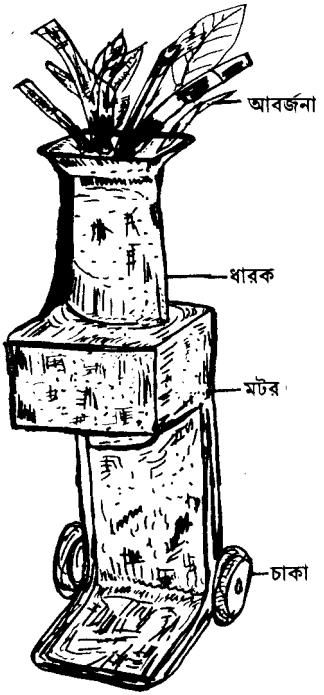

চিত্র ১১ : আবর্জনা চূর্ণকারী ছোট যন্ত্র

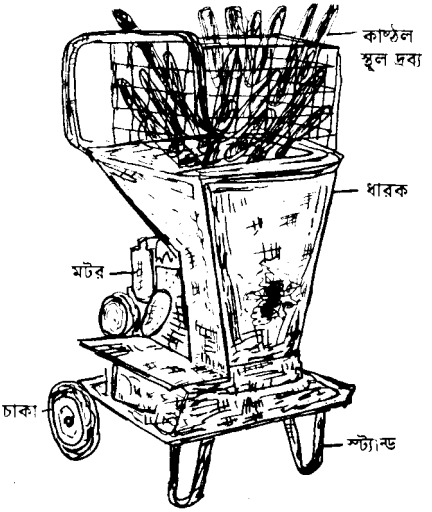

চিত্র ১২ : স্থূল কাষ্ঠল আবর্জনা চূর্ণন যন্ত্র

(কমপোস্ট তৈরি করার আবর্জনায় অনেক সময় স্থূল দ্রব্য থাকে যা সহজে পচে না। এসব দ্রব্য একটি চূর্ণনকারী যন্ত্র দ্বারা গুঁড়া বা খণ্ডিত করে নিলে কমপোস্ট তাড়াতাড়ি পচে। এসব স্থূল দ্রব্য বেছে ফেলে দিলে কমপোস্ট তৈরি যোগ্য আবর্জনার পরিমাণ কমে যায়। চূর্ণ করার জন্য স্থূল আবর্জনা শুকিয়ে নেওয়া ভাল। স্থূল দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে লতা পাতা, আধাপচা ডাল, শাখা, ইত্যাদি।)

(আবর্জনার মধ্যে কাষ্ঠল বা ছোবড়া দ্রব্য বেশি থাকলে একটু শক্তিশালী মোটরসম্পন্ন চূর্ণন যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। চিত্রে এ ধরনের একটি চূর্ণন যন্ত্রের নমুনা/নক্সা দেখানো হলো ; কাষ্ঠল চূর্ণিত দ্রব্য কমপোস্ট স্তূপে ব্যবহার করলে এক্টিভেটরের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হয়। চূর্ণন যন্ত্রে দেওয়ার আগে এসব আবর্জনা শুকিয়ে নিলে ভাল হয়। চূর্ণন দ্রব্য ব্যবহার করলে কমপোস্টের পরিমাণ বাড়ে। এই কমপোস্ট ভালভাবে পচলে জৈব সারের মানও উন্নত হয়।)

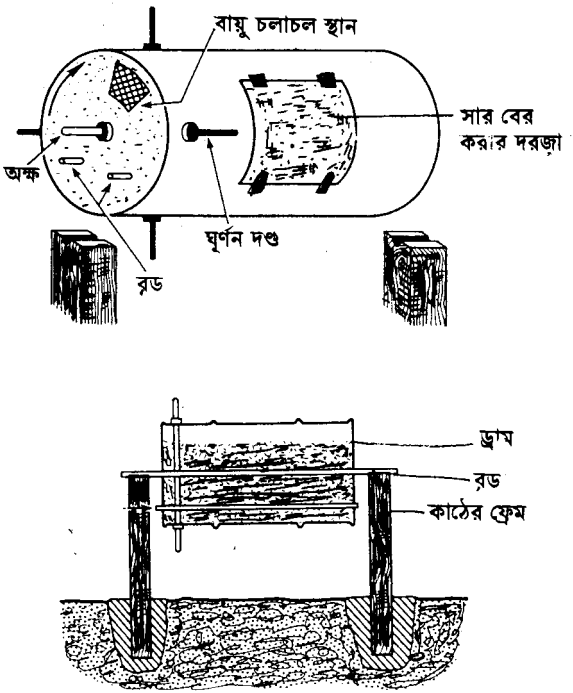

চিত্র ১৩ : পাতা পচা কমপোস্ট তৈরির ড্রাম।

(বাড়ির লন, খড় বা জঙ্গল কাটা লতাপাতা ও গৃহস্থালী আবর্জনা নির্দিষ্টভাবে তৈরি ড্রাম পদ্ধতিতে পচিয়ে কমপোস্ট তৈরি করা যায়। এই পদ্ধতিতে ড্রামে আবর্জনা ও এক্টিভেটরসহ পানি ছিটাতে হয়। তার এই ড্রাম কাঠের ফ্রেমের উপর বসিয়ে সময়ে সময়ে ঘুরাতে হয়। ড্রাম পদ্ধতিতে মাস খানেকের মধ্যে উন্নতমানের কমপোস্ট তৈরি হয়। অফিস, লনসম্পন্ন বাড়ি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতিতে কমপোস্ট তৈরি করা যায়।)

কমপোস্ট জৈব সারের উপকারিতা

জৈব সার মাটি ও ফসলের জন্য খুবই উপকারী। তবে অনেক সময় জৈব সার ভালভাবে পচিয়ে বা কমপোস্ট না করে প্রয়োগ করলে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। যেমন–

ক. কমপোস্ট না করা ছড়িয়ে থাকা কাঁচা গোবর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করে। এগুলোর নাড়াচাড়ায় কৃষিসহ নানা বীজাণু ছড়াতে পারে। কাঁচা গোবরে মাটির ক্ষতি হয়ে গাছ বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে।

খ. কমপোস্ট না করা কাঁচা গোবর আয়তনে বেশি। কমপোস্ট তৈরির মাধ্যমে ১০ কেজি গোবরকে ১ কেজি কমপোস্ট গুঁড়ায় পরিণত করা যায়।

গ. খৈল, হাড়ের গুঁড়া ও শিং গুঁড়াজাতীয় জৈব সার মাটিতে পচতে অনেক সময় লাগে। তাই উপস্থিত ফসল বা গাছ এসব কাঁচা জৈব সার থেকে উপকার কম পায়। তাই এসব জৈব সার কমপোস্টে মিশিয়ে ব্যবহার করলে এদের কার্যকারিতা বাড়ে।

ঘ. হাঁস-মুরগির পায়খানা, ছাগলের পায়খানা একইভাবে দুর্গন্ধযুক্ত এবং ঝাঁঝালো। এদের সরাসরি ব্যবহারে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ করাতের গুঁড়ার লিটারসহ এসব সার কমপোস্টে মিশ্রভাবে ব্যবহার করলে গাছে দ্রুত সুফল দেখা দেয়।

ঙ. অধিকাংশ রাসায়নিক সার সরাসরি মাটিতে ব্যবহার না করে কমপোস্টের মাধ্যমে ব্যবহার করলে এদের কার্যকারিতা বাড়ে।

চ. চুন, বেসিক স্ল্যাগ, তামাক ও ঝিনুক উচ্ছিষ্ট প্রভৃতিও কমপোস্টে ব্যবহার করে উন্নতমানের জৈব সারে পরিণত করা যায়।

৫। সার প্রয়োগের মূলনীতি

ফসলের জমিতে সার প্রয়োগ করে অধিক ফলন পেতে হলে কতকগুলো নিয়মবিধি পালন করা দরকার। জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের প্রধান প্রধান নিয়মনীতি নিচে উল্লেখ করা হলো ।

ক) জৈব সার প্রয়োগের ক্ষেত্র

নিম্নরূপ অবস্থার জমিতে সন্তোষজনক ফসল পেতে হলে জৈব সার প্রয়োগ আবশ্যক

১. মাটিতে উপস্থিত জৈব পদার্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকলে (সর্বনিম্ন ২%)।

২. মাটির ভৌত গুণাবলী অনুকুল না হলে, ঘনত্ব বেশি হলে এবং সংযুতি বিনষ্ট হয়ে গেলে।

৩. মাটির অণুজৈবিক ধর্ম উন্নত করতে হলে (বায়ু চলাচল ও জৈবিক কার্যাবলী বৃদ্ধির মাধ্যমে)।

৪. মাটি নিবিড়ভাবে চাষ করা হলে।

খ) রাসায়নিক সার প্রয়োগের মূলনীতি

রাসায়নিক সার প্রয়োগের প্রধান প্রধান নীতিসমূহ নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায়—

১. মৃত্তিকা পরীক্ষা, গ্রীন হাউস এবং মাঠ পরীক্ষা দ্বারা পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি নির্ণয়।

২. উদ্ভিদ বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পরিপূরণ করতে হলে ঘাটতির তীব্রতা মোতাবেক সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন

৩. বিভিন্ন ফসলের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা ভিন্ন প্রকৃতির। তাই ফসলের পুষ্টি উপাদান চাহিদা ও ফলন মাত্রা অনুসারে সারের পরিমাণ ও প্রকার নির্ধারণ করতে হয়।

৪. মাটিতে প্রয়োগের পর রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পুষ্টি উপাদানের অপচয় বা সংযোজন ঘটলে সারের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। তাই মাটির গঠন দ্রব্য অনুসারে সার প্রয়োগের পদ্ধতি নির্ধারণ করা দরকার।

৫. খাদ্য প্রাপ্যতার অনুকূল সর্বোত্তম মাত্রায় মাটির অম্লমান বিদ্যমান রাখতে পারলে সারের কার্যকারিতা বাড়ে।

৬. মাটিতে পরিমিত আর্দ্রতার উপস্থিতি সারের কার্যকারিতা বাড়ায়। তাই সার প্রয়োগের সময় মাটির আর্দ্রতা বা উপস্থিতি পানির পরিমাণ বা আন্তঃচর্যাপদ্ধতি বিবেচনা করতে হয়।

৭. মৃত্তিকা সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও সেচ নিকাশের নিশ্চয়তা সারের কার্যকারিতা বাড়ায় বলে সংরক্ষণ ও সেচ–নিকাশ সম্ভাব্যতার উপর সার প্রয়োগ বিষয় নির্ভর করে।

৮. সারের মূল্য, প্রয়োগ ব্যয় এবং উৎপাদিত ফলনের মূল্য বিবেচনা করতে হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ফসল বিনষ্ট হওয়ার আশংকার বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৯. মাটির রাসায়নিক গুণাবলীতে সারের উপস্থিতি ও অবশিষ্ট প্রভাব বিবেচনা করতে হয়।

১০. সার প্রয়োগের সুফল অন্যান্য ফসল পরিচর্যা যেমন–আগাছা দমন, রোগ–পোকা দমন; পরিচর্যা, ইত্যাদির উপরও নির্ভর করে সেগুলোর সম্ভাব্যতাও বিবেচনা করতে হয়।

উচ্চ ফলন প্রাপ্তির নির্দেশনা

এই অধ্যায়ে সার ব্যবহারের জন্য একটি গড় পরিমাণ এবং এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মধ্যম উর্বর জমিতে এই সার প্রয়োগ করে কমপক্ষে মধ্যম মাত্রার ফলন পাওয়া যেতে পারে। তবে উচ্চ ফলন পেতে হলে সার প্রয়োগের কতগুলো নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। এখানে ফসলের জমিতে সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিসমূহ উল্লেখ করা হলো।

১. ফসলের জমিতে জৈব ও রাসায়নিক উভয় প্রকার সার ব্যবহার করা দরকার।

২. প্রতি শতক জমিতে ২০ কেজি জৈব সার ব্যবহার করলে অনুমোদিত রাসায়নিক সার এক–তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেওয়া যায়।

৩. জৈব সার শুষ্ক গুড়াঁ অবস্থায় জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়।

৪. লাল বেলে মাটি, পাহাড়ী ও পাদভূমির বেলে মাটিতে পটাশ সারের পরিমাণ দেড় গুণ দিতে হয়।

৫. মাটির নিচে ও কন্দাল ফসলে পটাশ সারের পরিমাণ দেড়গুণ দিতে হয়,

৬. গঙ্গাবাহিত প্লাবনভূমি ও সেচ প্রকল্প এলাকায় দস্তা সারের ব্যবহার বেশি প্রয়োজন।

৭. হাওর এলাকার জমি উর্বর হলে সারের পরিমাণ এক–তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেওয়া যায়।

৮. দেশী জাতের ক্ষেত্রে সারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়।

৯. বেলে বুনটের মাটিতে এমপি সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।

১০. পূর্ববর্তী ফসলে টি এস পি, এম পি ও জিপসাম সার অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে পরবর্তী ফসলের জন্য উল্লিখিত সারগুলো অনুমোদিত মাত্রার অর্ধেক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১১. দস্তা সার কোনো ফসলে ব্যবহার করলে পরবর্তী দুই ফসলে ব্যবহার করা দরকার নাই।

১২. সবুজ সার প্রয়োগ করা জমিতে ইউরিয়ার পরিমাণ এক–তৃতীয়াংশ কমানো যায়।

সার সুপারিশ নীতি

কোনো মৃত্তিকা নমুনা ও উদ্ভিদ নমুনা পরীক্ষা করে এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পাওয়া গেলে তা সার দ্রব্য দ্বারা পরিপূরণ করতে হয়। যে কোনো উর্বর শ্রেণির মাটিতেও নানা কারণে ফসল বিশেষে বা ঋতুভিত্তিতে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকতে পারে। উপযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি সমস্যার সমাধান করা যায়। যে কোনো ফসলের মোট পরিশোষিত উপাদান প্রধান দু'প্রকার উৎসের সরবরাহকৃত পরিমাণের সমষ্টির সমান

অর্থাৎ কোনো ফসলের মোট উপাদান–

ফসলের মোট		মৃত্তিকাস্থ প্রাপনীয়		সারের মাধ্যমে
(↓↑)	=	(↓↑)	+	(↓↑)
উপাদান		উপাদান		সরববাহ

প্রয়োজনীয়তা জানা থাকলে এবং মৃত্তিকাস্থ প্রাপনীয় উপাদানের পরিমাণ জানা থাকলে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ হয়।

ধান, গম, পাট, আখ, শাক–সবজি, চা, আনারস, ফল প্রভৃতি ফসলের পুষ্টি চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন। কতকগুলো ফসলের প্রতি টন উৎপাদনের জন্য কতটুকু পুষ্টির দরকার হয় তা নিচের সারণিতে উপস্থাপিত হলো (উদাহরণ হিসেবে)।

সারণি ২৫ : প্রতি টন উৎপাদনে পুষ্টি চাহিদা (কেজি /হেক্টর)

ফসল	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	সালফার	দস্তা
ধান	১৮	৩	২৪	২	০.০৪৫
গম	২৮	১২	২৫	৪	–
পাট (শুকনো) আঁশ	৩৩	১৫	৮০	১.৮	–
আখ	০.৮	০.৬	২.৬	০.৪	–

যদি কোনো কৃষক হেক্টর প্রতি ৫ টন ধান ফলাতে চান তাহলে ছকে উল্লেখিত তথ্যের সাহায্যে হিসাব করতে হয়। যেমন–

৫ টনের জন্য নাইট্রোজেন পুষ্টি ৫×১৮=৯০ কেজি

ধরা যাক, মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ=৪৮ কেজি

সুতরাং , ৯০–৪৮=৪২ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হয়।

সারের কার্যকারিতা ৩৫% হিসাবে ৪২×২.৮৫=১১৯.৭ কেজি (১০০÷৩৫=২.৮৫)

ইউরিয়া পরিমাণ ১১৯.৭×২.১৭=২৫৯.৭ =২৬০ কেজি

(১০০÷৪৬=২.১৭)

সারণি ২৬ : ধানের জমিতে মাটিতে বিদ্যমান পুষ্টি বাদে সারের চাহিদার হিসাব

(উৎপাদন মাত্রা : ৫ টন / হেক্টর)

মাটিতে পুষ্টির মাত্রা	মাটিতে পুষ্টির পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	গাছের গ্রহণযোগ্য পুষ্টির পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	উৎপাদন মাত্রার জন্য মোট পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা (কেজি/হেক্টর)	উৎপাদন মাত্রার জন্য অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজনীয় (কেজি/হেক্টর)	সার চাহিদা (কেজি/হেক্টর)
নাইট্রোজেন ০.০৮%	৬৪	৪৮	৯০	৪২	১২০(২৬০ ক)
ফসফরাস ১০ পিপিএম	২০	১০	১৫	৫	২৫ (১২৫ খ)
পটাশিয়াম ০.১৫ মি: ই: / ১০০ গ্রাম	১১৭	৫৯	১০০	৪১	৮২ (১৬৪ গ)
সালফার ৮ পি পি এম	১৬	৪	১০	৬	২৪ (১৩৩গ)
দস্তা ২ পিপিএম	৪	০.৪	০.২৩	—	

ক–ইউরিয়া, খ– টি এস পি, গ –এম পি, ঘ–জিপসাম

উৎস :পরিমিত পুষ্টি উপাদানের সাহায্যে উন্নত ফসল, বি আর সি, ঢাকা।

উপরোক্ত ফসল সূত্র থেকে বলা যায় সকল জলবায়ু, ফসল, মৃত্তিকা ও কৃষকের জন্য একই সার সুপারিশ প্রদান করা যায় না। সার সুপারিশ প্রদানের জন্য সকল উপাদানের বিবেচনা ও সুসমন্বয় প্রয়োজন। ফসলের ফলন উপাদানের সমন্বয় ও ফলন লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রধান ছয় প্রকার সার সুপারিশ পৃথক করা যায়, যেমন–

১. সর্বোচ্চ ফলনের লক্ষ্যে সার সুপারিশ

এ ধরনের সার সুপারিশের উদ্দেশ্য হয় সকল পুষ্টি উপাদান মোটামুটি সর্বোত্তম মাত্রায় সবররাহ। সম্পদের সীমাবদ্ধতা না থাকলে প্রগতিশীল কৃষকের জন্য এই সুপারিশ প্রদান করা যায়। এই সুপারিশের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ ফলন প্রাপ্তি। সর্বোচ্চ ফলন প্রাপ্তির জন্য ফসলে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর (best management practices) প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হয়।

২. ফলন লক্ষ্যে সার সুপারিশ

নির্দিষ্ট ফসলের জন্য সার (অবশিষ্ট প্রভাব ব্যতিরেকে) সুপারিশ। সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন কৃষক বা বর্গা জমি বা মাধ্যম উৎপাদনশীল জমির জন্য এ ধরনের সুপারিশ প্রদান করা যায়।

৩. ফসল বিন্যাসের জন্য সার সুপারিশ

ফসল বিন্যাসের জন্য সার সুপারিশ প্রদান করলে সারের পরিমাণ বাড়ানো যায় কারণ এতে সারের অবশিষ্ট প্রভাব বিবেচনা করা হয়। যেমন– গোল আলুতে বেশি পরিমাণ সার দিলে পরবর্তী ফসল (যেমন– ধান) এই সারের সুফল পারে। এই সুপারিশমালায় সারের অবশিষ্ট প্রভাব ও কার্যকারিতা বিবেচনা করা হয়।

৪. সংরক্ষণী (Maintenance) সার প্রয়োগ

কোনো জমিতে ১ নং প্রকার অনুরূপ সর্বোত্তম মাত্রায় সার দিলে তা পরবর্তী সময়ে সংরক্ষণীয় সার প্রয়োগ করে যাওয়া। এর মূলনীতি হয় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ উপাদান ফসল পরিশোষণ করে বা অপচয়িত হয় তা পরিপূরণ করে যাওয়া।

৫. সর্বনিম্ন মাত্রায় সার প্রয়োগ

ভরণপোষণিক (subsistance) কৃষকের জন্য সীমাবদ্ধতার আলোকে কেবল উপস্থিত ফসল থেকে সন্তোষজনক ফলন প্রাপ্তির জন্য সর্বনিম্ন মাত্রায় সার প্রয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান।

৬. সার প্রয়োগ না করা

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জমিতে (ফসল বিনষ্টের জন্য বা ফলন কম হওয়ার) সার সুপারিশ প্রদান না করাই উত্তম।

সার সুপারিশ প্রদানের সময় বিবেচ্য প্রধান বিষয়

ফসলের ফলন সূত্রভিত্তিক সুপারিশসমূহের আলোকে উল্লেখ্য করা যায় যে সার সুপারিশ প্রদানের সময় আবশ্যকভাবে নিম্নরূপ চারটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়, যেমন–

১. ফসল ও জলবায়ু—এলাকায় জন্মানো ফসল ও জলবায়ু সম্পর্কে জ্ঞান।

২. মৃত্তিকা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা—মৃত্তিকার রাসায়নিক পরীক্ষা ও ফলাফলের ব্যাখ্যা।
৩. ফসলের উপাদান প্রয়োজনীয়তা- জন্মানো ফসলের প্রকার ও পরিমাণগত প্রয়োজনীয়তা।
৪. কৃষকের সম্পদ ও দক্ষতা–ফসলের চাষকারী কৃষকের উপস্থিত সম্পদ সীমাবদ্ধতা ও ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা।

সার সুপারিশ প্রণয়নের পদ্ধতি

১. মাঠ পরীক্ষা পদ্ধতি

মাঠে ফসলের জমিতে বিভিন্ন পরিমাণ ও অনুপাতে সার প্রয়োগ করে এর ফলাফলের ভিত্তিতে সারের উত্তম মাত্রা নির্ণয় করা হয়। মৃত্তিকা উর্বরতা পরীক্ষা ও অন্যান্য ফসলভিত্তিক গবেষণাগারসমূহ এই পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে।

২. কৃত্রিম হ্যামবোল্ড মৃত্তিকা পরীক্ষা পদ্ধতি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগ ও জার্মানির অনুদানে পরিচালিত ও উদ্ভাবিত কৃষি হামবোল্ড মৃত্তিকা পরীক্ষা কিটের সাহায্যে এবং মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ কোষ কলা পরীক্ষা করে সারের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা হয়। এটি একটি গুণগত দ্রুত পদ্ধতি। ফলে সঠিকতা, মান ও ব্যাপকতা সীমিত।

৩. কৃষি গবেষণা বা বারি (BARI) পদ্ধতি

মৃত্তিকা পরীক্ষা ফলাফল এবং গ্রীন হাউজে সরগম ফসল দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রাথমিকভাবে ভূমিকা উর্বরতা বিষয়ে ধারণা করা হয়। তারপর ফলনের লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে একটি সাধারণীকৃত সার মাত্রা প্রদানের সুপারিশ করা হয়।
এই পদ্ধতির প্রধান প্রধান পর্যায় হচ্ছে।

১. মৃত্তিকার বিস্তারিত পরীক্ষা ও ফলাফল নির্ণয়।
২. গ্রীন হাউজে ফসল বৃদ্ধিতে সারের কার্যকারিতা নির্ণয়।
৩. মাঠে সারের প্রকার/ পরিমাণ বিষয়ক পরীক্ষা এবং মৃত্তিকা পরীক্ষা ফলাফলের সাথে ফলনের সম্পর্ক নির্ণয়। সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, যে পদ্ধতিতে মৃত্তিকা পরীক্ষায় ফলাফল ও ফসলের ফলনে বৃদ্ধি সাড়া দান তীব্রতা নির্ণয় করে মাটির উর্বরতা ও সারের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা হয় তাকে মৃত্তিকা পরীক্ষা ফসল সাড়া সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলে (STCRCS)।

সার সুপারিশ প্রকাশের একক

১. সরল সারের মূল ওজন পদ্ধতি–যেমন ইউরিয়া ১০০ কেজি/হেক্টর।
২. যৌগিক সারের একক পদ্ধতি যেমন ১২০০ কেজি "X" নামক যৌগিক সার /হেক্টর।
৩. উপাদান পদ্ধতি যেমন ১০০ কেজি N/ হেক্টর।
৪. অনুপাত পদ্ধতি যেমন ২ঃ১ঃ২ N-P-K,X কেজি N/হেক্টর।
৫. গ্রেড পদ্ধতি ২০–১০–২০ (N-P-K) টন /হেক্টর।

৬। মৃত্তিকা পরীক্ষা

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে বিজ্ঞানী ডোবেনি মাটিকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাহায্যে পরীক্ষা করে ফসফেট সার প্রয়োগ করেছিলেন। অবশ্য এরপর ১৮৯৪ সালে বানার্ড ডায়ার মৃত্তিকা পরীক্ষায় পরিপূর্ণ পদ্ধতি উদ্ভাবনে সফল হয়েছিলো। উপাদানের মোট ও প্রাপনীয় পরিমাণ নির্ধারণের পর তার মন্তব্য ছিল সাইট্রিক এসিডের ১% দ্রবণ মৃত্তিকা নির্যাস ব্যবহার করে ফসফেটের পরিমাণ ০.০১% পাওয়া গেলে সেখানে ফসফেট সার প্রয়োগ করে লাভবান হওয়া যাবে। এরপর মৃত্তিকা পরীক্ষা পদ্ধতির প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা সিস্টেমে উন্নত ও দ্রুত পদ্ধতিতে মাটি পরীক্ষা করে সার সুপারিশ বিষয়ক নির্দেশনা দান করা হচ্ছে। এ কাজের জন্য প্রতিটি গবেষণা ইনস্টিটিউটে এবং আঞ্চলিক মৃত্তিকা পরীক্ষাগারে মৃত্তিকা পরীক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দিনে দিনে তা উন্নততর করা হচ্ছে।

মৃত্তিকা পরীক্ষা পদ্ধতি

মৃত্তিকা পরীক্ষা কাজ শুরু থেকে সার সুপারিশমালা প্রদান পর্যন্ত করণীয় কার্যাবলীকে ৪টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা–

১. মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ।
২. মৃত্তিকা পরীক্ষা করা।
৩. মৃত্তিকা পরীক্ষা ফলাফল বিশ্লেষণ।
৪. সার সুপারিশ প্রদান।

মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ

মাটির রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ফসল মৌসুমে সঠিক পরিমাণে ও অনুপাতে পুষ্টি উপাদান সরববাহের প্রচ্ছন্ন উৎপাদন উপযুক্ততা নির্ণয় করা। তাই পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত মাটির গুণাবলী সেই এলাকার মাটির প্রতিনিধিত্বশীল হয়। অধিকাংশ মাঠ ফসলের জন্য ২ থেকে ৩ বৎসর পর পর মাটি পরীক্ষা করা উচিৎ। নিবিড়ভাবে ব্যবহৃত জমি বা গ্রীন হাউজের মাটি বাৎসরিকভাবে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সকল সময় একই মৌসুমে একই স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা ভাল। মাটির বন্ধুরতা বুনট, পূর্ব-ফসল, নিকাশ বর্ণ, ইত্যাদি বিবেচনা না করে ৪ থেকে ৬ হেক্টর জমির জন্য ২০টি উপনমুনা সংগ্রহ করা একটি কম্পোজিট নমুনা তৈরি করতে হয়।

কোনো সংগৃহীত নমুনা মাটি গবেষণাগারে (০–১৫ সেমি. গভীরতায় নমুনা) প্রেরণের সময় অন্তত নিচে বিষয়ের উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়–

১. জন্মানো পূর্ব-ফসল (জাতসহ),
২. জন্মিতব্য ফসলের নাম ও জাত,
৩. কাঙ্ক্ষিত ফলন লক্ষ্য,
৪. পূর্বে চুন প্রয়োগের বর্ণনা,

BANSDOC Library Accession No. 17782
BANSDOC Library Dhaka

৫. প্রয়োগকৃত জৈব সারের বর্ণনা,

৬. চাষের গভীরতা,

৭. সেচ দেওয়া হয় কি–না,

৮. মৃত্তিকা সিরিজের নাম ও ব্যবস্থাপনা,

৯. নিকাশ পরিস্থিতি,

১০. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়।

মৃত্তিকা পরীক্ষার কৌশল

১. মাটির অম্লত্ব পরীক্ষা,

১. লডিবন্ড বর্ণ পদ্ধতি : বিজ্ঞানী জোনস (১৯৭৩) অনুসারে মাটির অম্লত্ব পরীক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে ইলেকট্রোড পদ্ধতি।

২. পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম নির্ধারণ প্রাপ্য পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। (ক) প্রশম ১.০ সাধারণ এমোনিয়াম এসিটেট, (খ) ০.০৫ সাধারণ হাইড্রোক্লোরিক এসিড + ০.০২৫ সালফিউরিক এসিড (ডাবল এসিড), গ) মরগান দ্রবণ–সোডিয়াম এসিটেট ১.৪ সাধারণ + এসিটিক এসিড অম্লমান ৪.৮ এ বাফারকৃত।

৩. ফসফরাস

ক) ০.০২৫ হাইড্রোক্লোরিক এসিড + ০.০৩ এমোনিয়াম ক্লোরাইড ব্রে –ফসফরাস), খ) ০.০৫ সাধারণ হাইড্রোক্লোরিক এসিড + ০.০২৫ সাধারণ সালফিউরিক এসিড, গ) ০.৫ মোলার সোডিয়াম বাই কার্বনেট (অলসেন),

৪. গৌণ উপাদান–পারমাণবিক পরিশোষণ বর্ণমিতি পদ্ধতি।

৭। উদ্ভিদ কোষকলা পরীক্ষা

১৮৪০ সালে লিবিগ কর্তৃক উদ্ভাবনের পর সার চাহিদা নিরূপণের জন্য উদ্ভিদ কোষকলা পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। কোষকলা পরীক্ষা প্রধানত নিম্নরূপ–

১. মোট উদ্ভিদ বিশ্লেষণ,

২. সবুজ কলা পরীক্ষা,

৩. চাক্ষুষ অপুষ্টি লক্ষণ পর্যবেক্ষণ।

কোনো উদ্ভিদে পুষ্টি উপাদানসমূহের মাত্রা ঘাটতিপূর্ণ বা পর্যাপ্ত কি–না তা জানার জন্য উদ্ভিদের মোট বিশ্লেষণ ও সবুজ কলা পরীক্ষা বেশ মূল্যবান। মাটি পরীক্ষা ও চাক্ষুষ অপুষ্টি লক্ষণ সহযোগে এসব পরীক্ষা উদ্ভিদ বৃদ্ধির অধিকাংশ শারীরবৃত্তীয় ও সার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান দিতে পারে। পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ, উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে বা বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ে নমুনা সংগ্রহ, ফসল পরিচর্যায় পূর্ব ইতিহাস পর্যালোচনার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করলে সার সুপারিশের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

সবুজ কলা পরীক্ষা কিছুটা দ্রুত ধরনের পদ্ধতি এবং অর্ধ সংখ্যাতাত্ত্বিক। আজকাল ইলেকট্রোন মাইক্রোপ্রোব রঞ্জন-রশ্মি বিশ্লেষক যন্ত্র দ্বারা অত্যন্ত সঠিকতার সাথে এবং যথেষ্ট কম সময়ে উদ্ভিদ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এসব ফলাফল তারপর কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে ভূমি উর্বরতার মান সার চাহিদা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সারণি ২৭ : বিভিন্ন ফসলের পুষ্টি উপাদানের পর্যাপ্ততা মাত্রা (উদাহরণ হিসেবে)।

উপাদান %	গমের ফুল আসার আগে উপরের পাতা	সবজি উপরের পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাতা	গোলআলুর পূর্ণতাপ্রাপ্ত পাতার বোঁটা
নাইট্রোজেন	২.৫৯–৩.০০	২.৫–৪.০	২.৫–৪.০
ফসফরাস	০.২১–৩.৫	০.২৫–০.৮	০.১৮–০.২২
পটাশিয়াম	১.৫০–৩.০	২.০–৯.০	৬.০–৯.০
ক্যালসিয়াম	০.২১–১.০	০.৩৫–২.০	০.৩–০.৫
ম্যাগনেশিয়াম	০.২১–১.০	০.২৫–১.০	০.১৭–০.২২
জিঙ্ক (পিপিএম)	২১–৭০	৩০–১০০	৩০–১০০

উৎসঃ ভিতস সহকর্মী (১৯৯৩)

সারণি ২৭ : অনুসারে দেখা যায় যে গম, সবজি ও গোলআলুর পাতায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ ২.৫% হলে সার প্রয়োগ করতে হয়। অপরদিকে পটাশিয়ামের সঙ্কটকালীন পরিমাণ যথাক্রমে ০.২% এবং ১.৫%।

৮। নাইট্রোজেন সার সুপারিশ

প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সুপারিশদান পদ্ধতিতে ও কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন–

নাইট্রোজেন –মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, আর্দ্রতা, অভীষ্ট ফলন, জৈব পদার্থ।

ফসফরাস–মৃত্তিকা খনিজ (ফসফেট), অম্লমান, ফলনের উদ্দেশ্য।

পটাশিয়াম–প্রাপনীয় বা ক্ষয়ীভূত খনিজ, ফসলের প্রকৃতি।

সারণি ২৮ : ফসল বিন্যাস ও প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন (কেজি/হেক্টর)

ফসল বিন্যাস	ফলন মাত্রা (বুশেল/হেক্টর)		
লিমিউম	২৫০–২৭৫	৩০০–৩৭৫	৪৩০–৫০০
ভট্টা,	১০০	২৫০	৩৭৫
ভট্টা–সয়াবিন	২৫০	৩০০	৬০০
দানা ফসল	৩০০	৪০০	৬৫০

উৎস: হেঃ হুড, ১৯৯১ অবলম্বনে

উপরোক্ত সারণি থেকে জানা যায় যে, ভুট্টা চাষের জমিতে পূর্ব ফসল লিগ্যুম থাকলে সেখানে ১০০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হয় সেখানে পূর্ব ফসল ভুট্টা ও অন্যান্য ফসল (একাধিক ফসল) থাকলে সেখানে প্রায় ৩০০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হয়।

নিম্নলিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে নাইট্রোজেন সার সুপারিশ প্রদান করতে হয়–

১. মাটির ৬০ সেমি. গভীরতা পর্যন্ত নাইট্রোটের পরিমাণ, বীজ বপন সময়ে,

২. মাটির সংরক্ষিত আর্দ্রতা,

৩. জন্মানো ফসলের প্রকার,

৪. ফসল মৌসুমে সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

উত্তর অঙ্গরাজ্যে ৬০ সেমি. গভীরতায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ ০–৪৪, ৪৫–৮৯, ৯০–১২৪, ১২৫–১৬৬ এবং ১৬৭ + কেজি হেক্টর হলে তাকে উর্বরতার মান হিসাবে যথাক্রমে খুবই কম, মধ্যম উচ্চ এবং উচ্চ ধরা হয় (Coop Ext Ser, N. D State univ 1970)।

উদাহরণ ঃ ধরা যাক, কোনো জমিতে হেক্টর প্রতি ১০,০০০ কেজি ভুট্টা উৎপাদন করা হয়। উক্ত মাটিতে ৬০ সেমি. গভীরতা পর্যন্ত ৫০ কেজি নাইট্রেট নাইট্রোজেন রয়েছে (উর্বরতা মান কম)। অন্যান্য উপাদান অনুকূল সাপেক্ষে বলা যায় ভূট্টার নাইট্রোজেন প্রয়োজনীয়তা (গড়ে ১.৫% হিসাবে) ১০,০০০ কেজি ফলনে ১৫০ কেজি। অতএব এর মধ্যে মাটিতে ৫০ কেজি থাকলে প্রয়োগযোগ্য পরিমাণ হয় ১০০ কেজি।

৯। তাপন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ১০ থেকে ১৪ দিনব্যাপী মৃত্তিকা নমুনা তাপনের ব্যবস্থা করে তারপর বিমুক্ত বা খনিজায়িত নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ডিনাইট্রিকরণের অনুকূল মাটিতে নাইট্রেটের চেয়ে তাপন পদ্ধতিতে সারের পরিমাণ নির্ণয় করলে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যায়। অবশ্য তাপন পদ্ধতিতে প্রকৃত মাঠ অবস্থা বিদ্যমান থাকে না।

নাইট্রোজেনের উৎস ও প্রাপ্যতা : কোনো মাটিতে এককালীন সময়ে যে পরিমাণ নাইট্রেট বা এমোনিয়াম উপস্থিত থাকে (মৃত্তিকা দ্রবণে) তা সেই ফসলের মোট চাহিদার কেবল ১% থেকে ২% হতে পারে। জৈব পদার্থ থেকে প্রায় ২০% নাইট্রোজেন পরিশোষিত হতে পারে। অবশ্য হিউমিকৃত জৈব পদার্থ থেকে ফসল প্রায় ৯৫% নাইট্রোজেন পরিশোষণ করে। সংক্ষেপে বলা যায় (কোক, ১৯৮৩) :

মৃত্তিকা দ্রবণ ১% থেকে ২% দ্রুত গতিতে প্রাপনীয়
বিযোজনশীল জৈব পদার্থ ২% থেকে ২৮% মধ্যম গতিতে প্রাপনীয়
হিউমিকৃত জৈব পদার্থ ৪০% থেকে ৯৫% ধীর গতিতে প্রাপনীয়
রাসায়নিক সার ২০ থেকে ৪০% দ্রুত থেকে মধ্যম গতিতে প্রাপনীয়।

উদাহরণ : ধরা যাক, কোনো মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ ২% এবং জৈব পদার্থে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ০.৪%। এই পরিস্থিতিতে ১৫ সেমি. গভীরতা পর্যন্ত মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হয়

$$২০,০০,০০০ \times \frac{২}{১০০} = ৪০,০০০ \text{ কেজি জৈব পদার্থ।}$$

$$= ৪০,০০০ \times \frac{৪}{১০\times১০০} = ১৬০ \text{ কেজি নাইট্রোজেন।}$$

এই জৈব পদার্থের বিযোজন হার ১৫% হলে (ফসল মৌসুমের গড়) বিযোজিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ হয় $১৬০ \times \frac{২০}{১০০} = ৩২$ কেজি

সারণি ২৯ : বাংলাদেশের বিভিন্ন মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ

মৃত্তিকা	নাইট্রোজেন %
১. পলিমার	০.০২ থেকে ০.০৫
২. সোপান এলাকা	০.০৫ থেকে ০.০৯
৩. উত্তর পূর্ব পাহাড়ী এলাকা	০.১০ থেকে ০.১৫
৪. ইউরিয়া নাইট্রোজেনের গড় অপচয়-	ধান জমি ৪০ থেকে ৯০% আর্দ্রতা অনিশ্চিত শীত ফসল, সবজি ও গম জমি (সেচ) ৩০ থেকে ৫০% আর্দ্রতা মোটামুটি নিশ্চিত
৫. পাট জমি	৪০ থেকে ৮০% আর্দ্রতা মধ্যম নিশ্চিত।

উৎস : SRDI, ১৯৯০

সারণি ৩০ : মৃত্তিকায় প্রাপ্য ফসফরাস, পটাশিয়াম (কেজি/হেক্টর) ও উর্বরতা মান (হুড, ১৯৭১)

ফসফরাস	উর্বরতা মান	পটাশিয়াম
০ থেকে ১১	খুবই কম	০–৮৯
১২ থেকে ২৩	কম	৯০–১৬৬
২৪ থেকে ৩৫	মধ্যম	১৬৭–২৩২
৩৬ থেকে ৭৬	বেশি	২৩৩–৩৪০
৮০	খুব বেশি	৩৪১+

১০। মৃত্তিকার অন্যান্য উপাদান

ক্যালসিয়াম

মাটির অম্লমান ৫.৫ হলে কেলসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। মাটিতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ মোট দ্রবণীয় লবণের ১০% এর কম হলেও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয়।

ম্যাগনেশিয়াম

চুনদ্রব্য হিসেবে কেবল কেলসাইট ব্যবহার করলে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয়। হাল্কা বর্ণের (কম হিউমাস ও ম্যাগনেশিয়াম খনিজসম্পন্ন) স্থূল বুনটের মাটিতে প্রাপ্য ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ ৮০ থেকে ৯০ কেজি/হেক্টর এর কম হয় ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতিতে ফলন কমে যায়।

সালফার

কম জৈব পদার্থসম্পন্ন মাটিতে ও স্থূল বুনটের মাটিতে সালফার দেখা দেয়। মাটিতে সাধারণত ক্যালসিয়াম ফসফেট নির্যাসিত সালফারের পরিমাণ ৭ পিপিএম এর কম হলে সালফার সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এর পরিমাণ ১২ পিপি এম হলে সার প্রয়োগ সাড়া পাওয়া যায় না।

সালফার প্রাপ্যতা সূচক (SAL) যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থানে সালফার প্রাপ্যতা সূচকের মাধ্যমে সালফার সারের নির্ণয় করা হয়।

সালফার প্রাপ্যতা সূচক = ৬.২ (পাউন্ড সালফেট / একর) + ০.১ (টন জৈব পদার্থ / একর)।

সালফার প্রাপ্যতা সূচক = ৬.০ হলে কম এবং ৬ থেকে ৯ হলে মধ্যম ধরা হয়। প্রয়োগ হার ২২ থেকে ৪৫ কেজি/হেক্টর সালফার।

বোরন

মাটিতে প্রাপ্য বোরনের (উত্তপ্ত, পানি নির্যাসিত) পরিমাণ ১ পিপিএম এর কম হলে খুবই কম, ১ থেকে ৫ হলে স্বাভাবিক ধরা হয়। পরিমাণ ১৫ পিপিএম হলে তা বিষাক্ত হতে পারে। উচ্চ সাড়াদানকারী ফসলের জন্য হেক্টর প্রতি ১.৭ থেকে ০.৪ কেজি উপাদানিক হতে পারে। উচ্চ সাড়াদানকারী ফসলের জন্য হেক্টর প্রতি ০.৬ থেকে ১.১ কেজি উপাদানিক বোরন প্রয়োগ করা যায়। অম্লীয় বেলে মাটিতে অথবা ক্ষারীয় মাটিতে বোরনের বিষাক্ততা দেখা দিতে পারে (স্পর্শকাতর ফসলে)।

কপার

অধিক জৈব পদার্থসম্পন্ন মাটিতে কপার ঘাটতি দেখা দেয়। খনিজ মাটিতে নিবিড় চাষ ও অধিক হারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম প্রয়োগ কপারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হতে পারে। মাটিতে হাইড্রোক্লোরিক নির্যাসিত উপাদানিক কপারের পরিমাণ <১০ পিপি এম হলে ৬ থেকে ৭ কেজি/হেক্টর এবং ১০ থেকে ২০ পিপি এম হলে ৩ থেকে ৪ কেজি/হেক্টর প্রয়োগ করা যায়। কপারের পরিমাণ> ১৬০ পিপি এম হলে বিষাক্ততা দেখা দিতে পারে।

লোহা

ক্ষারীয় মাটিতে প্রায়শ লোহা ঘাটতি দেখা দেয়। লোহা ঘাটতি নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা পরীক্ষা করতে হয়। গাছের পাতায় বাহ্যিক লক্ষণ দেখেও লোহার ঘাটতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

মাঠ ফসলে সার প্রয়োগ

১। মাঠ ফসলে সার প্রয়োগের নীতিমালা

মাটি, ফসল ও সারের গুণাবলীর ভিত্তিতে এখানে বিভিন্ন ফসলে ব্যবহারোপযোগী সারের পরিমাণ সম্পর্কে নির্দেশনা এবং নিম্ন উর্বর জমির উচ্চ ফলন মাত্রার জন্য সারের গড় পরিমাণ উল্লেখ করা হলো। এখানে ফসলের মধ্যে রয়েছে :

কৃষিতাত্ত্বিক ফসল যেমন–মাঠ ফসল এবং উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল যেমন–শাক–সবজি, ফল ও ফুল

সার ব্যবহার নির্দেশনার মধ্যে মাঠ ফসলে এখানে রয়েছে :

দানাজাতীয় ফসল
আঁশজাতীয় ফসল
ডালজাতীয় ফসল
তেলবীজজাতীয় ফসল।

এসব ফসলে সঠিক নিয়মনীতি মেনে সুষমভাবে সার ব্যবহার করলে নিম্নলিখিত উপকার পাওয়া যেতে পারে :

- ফসলের উৎপাদন বাড়বে
- ফসল চাষে আয় বাড়বে
- সার বিশেষে এর কুপ্রভাব থেকে পরিবেশ সুরক্ষা হয়ে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কমপোস্ট সার বা জৈব সার প্রয়োগ যেখানে যতটুকু পাওয়া যায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবেশের জন্য উত্তম।

২। মাঠ ফসলে সার প্রয়োগ

উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১০০০ গ্রাম
টিএসপি	৪৫০ গ্রাম
এসপি	৫০০ গ্রাম
জিপসাম	৩৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম

চিত্র ১৪ : উচ্চফলনশীল ধান গাছ।

(উচ্চ ফলন প্রাপ্তির জন্য ধানের জমিতে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন সার দিতে হয়। ধানের জমিতে নাইট্রোজেন অপচয় প্রায় ৬৫% এবং শিকড় অগভীর। এজন্য ইউরিয়ার কিস্তি প্রয়োগ করতে হয়। উচ্চ ফলনশীল ধানে জিপসাম ও দস্তা সারসহ ঘাটতি থাকলে বোরন সার (বোরাক্স, সলুবর ইত্যাদি) নির্ধারিত হারে (শতকে ১০ থেকে ২০ গ্রাম) প্রয়োগ করতে হয়।)

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার ও জৈব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়ে।

২. বাকি দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়ার একভাগ চারা রোপণের ৩০ থেকে ৪০ দিন পর এবং অন্যভাগ ৭০ থেকে ৮০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়ে।

জাত

বিপ্লব, আশা, সুফল, ময়না, মোহিনী, শাহীবালাম, আই আর ৮, চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজী, হাসি, শাহজালাল, মঙ্গল।

ফলনমাত্রা : ২২ থেকে ২৭ কেজি/শতক

রোপণ দূরত্ব : সারির দূরত্ব ২৫ সেমি.
চারার দূরত্ব ১৫ থেকে ২০ সেমি.

রোপণ সময় : জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি।

উফশী রোপা আমন ও রোপা আউশ ধানে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৭৩০ গ্রাম
টিএসপি	৩৬০ গ্রাম
এমপি	৩৪০ গ্রাম
জিপসাম	২০০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম
গৌণ উপাদান	পুষ্টি ঘাটতি অনুসারে

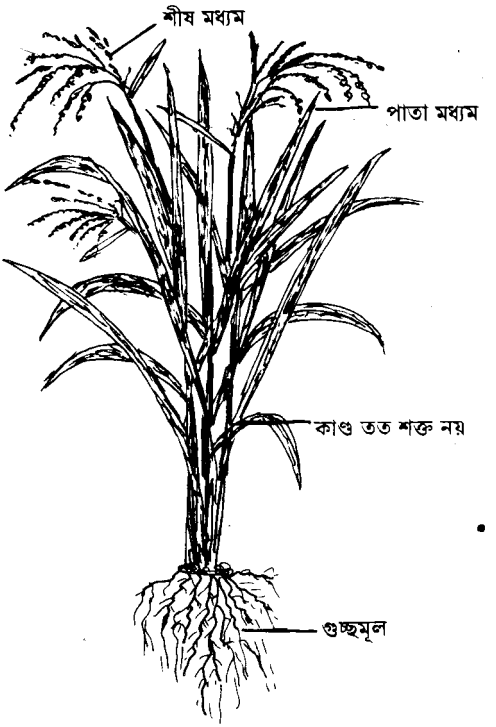

চিত্র ১৫ : রোপা আমন ও আউশ ধান গাছ।

(উচ্চফলনশীল রোপা আমন ও রোপা আউশ ধানের ফলন ও সারের পরিমাণ মূলত সম্পূরক পানি সেচ দেয়ার সুযোগের উপর নির্ভর করে। এসব ধানে পানি সেচ দানের সুযোগের উপর নির্ভর করে। এসব ধানে পানি সেচ প্রাপ্তি বা বৃষ্টির উপর নির্ভর করে ইউরিয়ার কিস্তিসমূহ প্রয়োগ করতে হয়।)

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. এক–তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়।

২. এক–তৃতীয়াংশ ইউরিয়া চারা রোপণের ২৫ থেকে ৩৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

৩. অবশিষ্ট এক–তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ৫৫ থেকে ৬৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

৪. মাটি কিছুটা উর্বর হলে সকল ইউরিয়াই কিস্তিতে প্রয়োগ করা যায়। এতে চারা রোপণের সপ্তাহখানেক পর ইউরিয়ার প্রথম কিস্তি প্রয়োগ করতে হয়।

জাত	:	মুক্তা, প্রগতি, ব্রিশাইল, বিপ্লব, চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজী, ব্রিবালাম পাজাম।
ফলনমাত্রা	:	১৫ থেকে ২০ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	সারির দূরত্ব : ২৫ সেমি. চারার দূরত্ব : ১০ থেকে ২০ সেমি.
রোপণ সময়	:	রোপা আমন : জুলাই থেকে আগস্ট রোপা আউশ : মার্চ থেকে এপ্রিল
কাটার সময়	:	রোপা আমন : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর রোপা আউশ : জুলাই থেকে আগস্ট
অন্যান্য পরিচর্যা	:	সম্পূরক সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

আগাছা দমন ও পানি সেচের সাথে সমন্বয় রেখে ইউরিয়ার কিস্তি প্রয়োগ করতে হয়। টিএসপি'র বদলে এসএসপি প্রয়োগ করলে এসএসপি'র পরিমাণ তিন গুণ করতে হয়।

স্থানীয় রোপা জাতের আউশ ও আমন ধানে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৫০০ গ্রাম
টিএসপি	২৪০ গ্রাম
এমপি	২৫০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ গ্রাম
দস্তা সার	প্রয়োজনে
গৌণ উপাদান	প্রয়োজনে

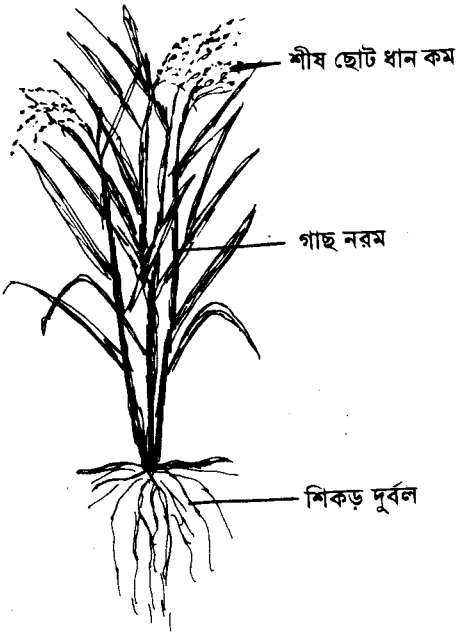

চিত্র ১৬ : স্থানীয় জাতের ধান গাছ

(স্থানীয় জাতের অনুমোদিত ও অননুমোদিত ধানে সার প্রয়োগ বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এসব জাতের ধানের উৎপাদন ক্ষমতা না থাকলে এবং সার দিলে গাছ হেলে পড়ে যায়। তাই এই ধানে ফলন ক্ষমতা ভিত্তিতে কম পরিমাণে ইউরিয়া, টিএসপি ও ফসফেট দিতে হয়। ধান গাছের বৃদ্ধি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সেই অনুসারে ইউরিয়ার কিস্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।)

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সবটুকু সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

২. চারা রোপণের ৩০ থেকে ৪০ দিন পর বাকি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

জাত	:	আউশ, রোপা আমন ও বোরো ধানে স্থানীয় অনুমোদিত জাত আউশ – কটকতারা, হাসিকলসী, ধারিয়াল রোপা আমন – লতিশইল, নাইজারশাইল, পাজাম বোরো – টেপি, খৈয়া বোরো, হবিগঞ্জ
ফলনমাত্রা	:	১২ থেকে ১৫ কেজি /শতক
রোপণ দূরত্ব	:	সারির দূরত্ব : ১৫ থেকে ২৫ সেমি.

চারার দূরত্ব : ১০ থেকে ২০ সেমি.
রোপণ সময় : আউশ : মার্চ থেকে এপ্রিল
রোপা আমন : আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর
কাটার সময় : আউশ : জুন থেকে জুলাই
রোপা আমন : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর
পরিচর্যা : স্বাভাবিক পরিচর্যা ও ফসল সংরক্ষণ সম্ভব হলে বা খরার সময় স্বল্প ব্যয় সুযোগ থাকলে সম্পূরক সেচ।

ধানের বীজতলায় সার প্রয়োগ

ফলনশীল জাত : প্রতি শতক বীজতলার (৪০ বর্গমিটার) জন্য

সারের নাম	সারের পরিমাণ/বীজতলা
জৈব সার	২০ কেজি
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ গ্রাম
এম পি	৫০ গ্রাম
ছাই	২ কেজি

দেশীয় জাত

সারের নাম	সারের পরিমাণ গ্রাম/বীজতলা
জৈব সার	১৫ কেজি
ইউরিয়া	৭০ গ্রাম
টিএসপি	৩০ গ্রাম
এমপি	৩০ গ্রাম
ছাই	২ কেজি

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।
২. বীজ বোনার পর ছাই ছিটিয়ে দিতে হয়।

৩. কোনো সময় নাইট্রোজেনের অভাবে চারাগাছ হলদে হয়ে যেতে থাকলে প্রতি শতকে আরো ৫০ থেকে ৬০ গ্রাম ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হয়।

৪. কোনোখানে ৫০ থেকে ৬০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

ফলন : এক শতক : বীজতলায় উৎপাদিত চারা দিয়ে অন্তত ২০ শতক জমি রোপণ করা যায়।

সময় : চারা রোপণের নির্ধারিত সময়ের ৩৫ থেকে ৫০ দিন আগেই বীজতলার আয়োজন করতে হয়।

পরিচর্যা : পানিসেচ ও প্রয়োজন হলে ফসল সংরক্ষণ।

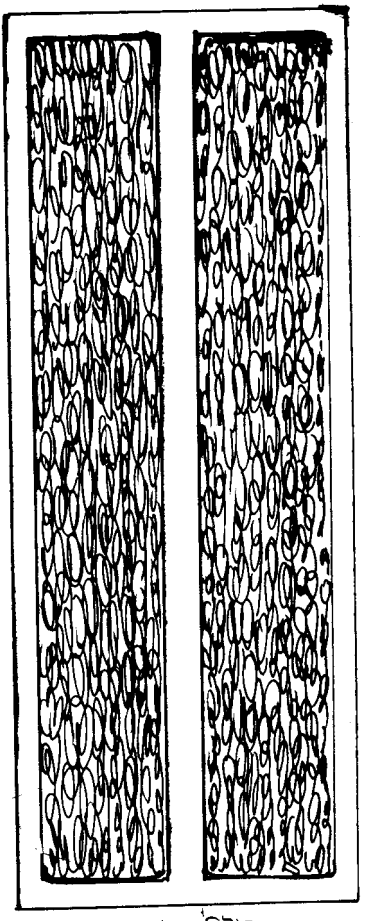

চিত্র ১৭ : ধানে এক শতকে আধুনিক পদ্ধতিতে চারা উৎপাদনের বীজতলার ডিজাইন

গমে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৯০০ গ্রাম.
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	৫০০ গ্রাম
জিপসাম	৩৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৫০ গ্রাম
বোরন সার	ইতিপূর্বে দানা চিটা হয়ে থাকলে সেই অনুসারে

• চিত্র ১৮ : গম গাছ

(গম গাছের শিকড় অগভীর, গুচ্ছমূল। তাই জমি চাষের সময় মূল সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। মুকুট শিকড় উৎপাদনের সেচ দিয়ে ইউরিয়ার কিস্তি প্রয়োগ করলে কুশি উৎপাদন বাড়ে। দেশের উত্তরাঞ্চলে শীষের আকার ছোট হলে বা দানা ঝরে যাওয়ার উপসর্গ দেখা গেলে জমিতে বোরাক্স প্রয়োগ করতে হয়।)

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়ে।

২. বাকি ইউরিয়া দুই ভাগ করে বীজ বপনের ২৫ ও ৫০ দিন পর দু'বারে প্রয়োগ করতে হয়ে।

৩. সেচ সুবিধা না থাকলে সকল সার একবারেও প্রয়োগ করা যায় তবে এতে ফলন কিছুটা কম হয়।

জাত : কাঞ্চন, বলাকা, আকবর, আঘ্রাণী
ফলনমাত্রা : ১৫ থেকে ২০ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব : সারির দূরত্ব ১৫ থেকে ২০ সেমি.
চারার দূরত্ব ৫ থেকে ৮ সেমি.
বীজ হার : ৫০০গ্রাম/শতক
বীজ বপন সময় : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর
ফসল কাটার সময় : মার্চ থেকে এপ্রিল
পরিচর্যা : সেচ, আগাছা দমন ও ফসল সংরক্ষণ, ইঁদুর দমন

বার্লির জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৪৫০ গ্রাম
টিএসপি	৩০০ গ্রাম
এমপি	৩২০ গ্রাম
জিপসাম	২০০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি

গমের অনুরূপ, তবে সেচ সুবিধা না থাকলে সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় দিয়ে দেওয়াই ভাল।

জাত : বারি বার্লি – ১
বারি বার্লি – ২
ফলনমাত্রা : ৮ থেকে ১২ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব : সারির দূরত্ব : ২০ থেকে ৩০ সেমি.
চারা দূরত্ব : ৪ থেকে ৬ সেমি.
বীজ হার : ৪০০গ্রাম/শতক

রোপণ সময় : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর
ফসল কাটার সময় : মার্চ থেকে এপ্রিল।
পরিচর্যা : স্বাভাবিক পরিচর্যা।

চিত্র ১৯ : বার্লি গাছ ও বার্লির শীষ

(বার্লি গাছ উৎপাদনশীল কুশির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সার দেওয়া জরুরি। লোনা এলাকায় বার্লির চাষ করলে সেক্ষেত্রে পটাশের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিলেও চলে। অম্লীয় মাটিতে বার্লির চাষ করতে হলে জমিতে জমি প্রস্তুতের সময় চুন দিতে হয়। বার্লি গাছ গম গাছের চেয়ে কিছুটা নরম। তাই অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের কারণে গাছ হেলে পড়তে পারে। এজন্য বার্লিতে সুষম সার দিতে হয়।)

বাংলাদেশে বার্লি চাষের অধীন জমির পরিমাণ কম। যা চাষ করা হয় তাতে খুব বেশি পরিচর্যা করা হয় না বা তেমন সারও দেওয়া হয় না। তবে উফশী জাতে সুষমভাবে সার দিলে বার্লির ফলন বাড়ানো সম্ভব। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বার্লির চাষ করা হলে তাতে পটাশ সার ও জিপসাম সারের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিলেও চলে।

চীনা ফসলে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৩৩০ গ্রাম
টিএসপি	২৫০ গ্রাম
এমপি	২৫০ গ্রাম
জিপসাম	৫০ গ্রাম

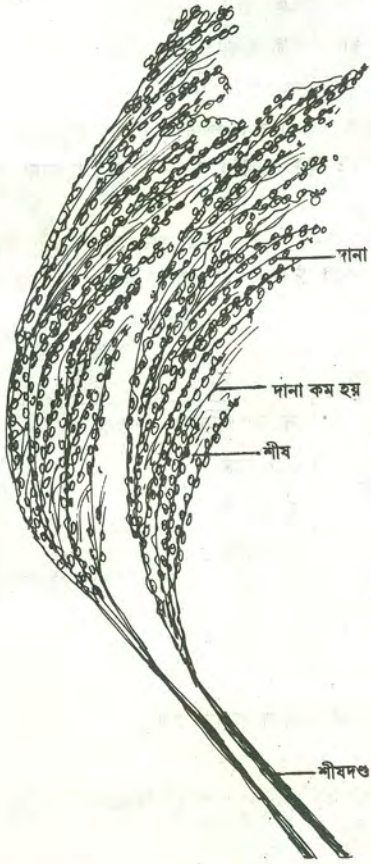

চিত্র ২০ : চিনার শীষ

(বাংলাদেশে চিনার চাষে খুব যত্ন করে সার দেওয়া হয় না। কিন্তু উচ্চ ফলন পেতে হলে জমিতে সুষম সার দিতে হয়ে।)

প্রয়োগ পদ্ধতি

সবটুকু সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

জাত	:	তুষার কুমার ধন, বাগাইকান্দি, হোয়াইট সিলেট।
ফলনমাত্রা	:	৪ থেকে ৬ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	সারির দূরত্ব ২০ থেকে ২৫ সেমি. চারার দূরত্ব ৪ থেকে ৬ সেমি.
বীজ হার	:	৪০গ্রাম/শতক
রোপণ সময়	:	ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি
কাটার সময়	:	মার্চ থেকে এপ্রিল
পরিচর্যা	:	স্বাভাবিক পরিচর্যা

বাংলাদেশের চরাঞ্চলসহ অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে চীনার চাষ করা হয়। তাই বর্তমানে চিনার ফলনও কম। কিন্তু যথাযথ মাত্রায় সার প্রয়োগ করে এর ফলন বাড়ানো সম্ভব।

বাংলাদেশে তুষার নামে চিনার একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই তুষার জাতের চীনার চাষ করে উচ্চ ফলন পেতে হলে অবশ্যই সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়।

কাউনের জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৪০০ গ্রাম
টি এস পি	৩০০ গ্রাম
এম পি	২০০ গ্রাম
জিপসাম	৭০ গ্রাম

প্রয়োগপদ্ধতি

সবটুকু সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

জাত	:	তিতাস লক্ষ্মীপুর – ২; শিবনগর, মগরা, অরজুনা, পরমেশ্বর, বগুড়া – ১
ফলনমাত্রা	:	৭ থেকে ১০ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	সারির দূরত্ব : ২০ থেকে ২৫ সেমি.
চারার দূরত্ব	:	৮ থেকে ১০ সেমি.

বীজ হার	:	৩৫ গ্রাম
রোপণ সময়	:	জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি
কাটার সময়	:	এপ্রিল থেকে মে
পরিচর্যা	:	স্বাভাবিক পরিচর্যা।

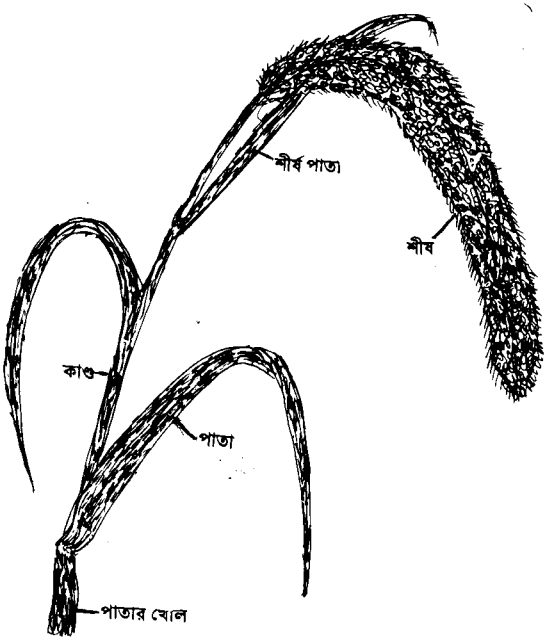

চিত্র ২১ : কাউন বা ফক্স টেইল মিলেট (Fox tail millet)

(জমিতে পূর্ববর্তী ফসলে রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে কাউনের জমিতে নতুন করে সার ব্যবহার করা হয় না। তবে উচ্চ ফলন পেতে হলে জমিতে সুষম সার বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও ফসফেট সার অন্যান্য সারের অনুপাতে সুষমভাবে প্রয়োগ করতে হয়।)

বাংলাদেশের অনেক স্থানে কাউনের চাষ হয়। তবে কুমিল্লায় এর চাষাবাদ ও ফলন বেশি। কুমিল্লায় পরিপূর্ণ মাত্রায় সার দেওয়া গোলআলুর জমিতে কাউনের চাষাবাদের সময় কাউনে সার কিছুটা কম দিলেও চলে।

সরগামে সার প্রয়োগ

বীজের জন্য

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৬৩০ গ্রাম
টিএসপি	৩৫০ গ্রাম
এমপি	২৫০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ গ্রাম

চিত্র ২২ : সরগাম

সরগাম উৎপাদনের জন্য অল্প সময়ে ১০ থেকে ১৩টি সবল সতেজ-সবুজ পাতা উৎপাদনের জন্য মাটির উর্বরতার ভিত্তিতে সুষম সার দিতে হয়।

গো-খাদ্যের জন্য

সারের নাম	পরিমাণ গ্রাম/শতক
ইউরিয়া	৬৫০ গ্রাম
টিএসপি	১৭০ গ্রাম
এমপি	১৫০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি

সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়ে।

রোপণের দূরত্ব : বীজের জন্য ৪০ × ২০ সেমি.
গো-খাদ্যের জন্য ৩০ × ১০ সেমি.

বীজ হার : বীজের জন্য ৬০ গ্রাম
গো-খাদ্যের জন্য ১২০ গ্রাম

ফলন-মাত্রা : বীজ ৮ থেকে ১২ কেজি/শতক

রোপণ সময় : নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি

কাটার সময় : জানুয়ারি থেকে জুন

পরিচর্যা : স্বাভাবিক পরিচর্যা।

বর্তমানে হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে সরগামের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশে সরগামের চাষাবাদ বাড়ছে। সুষম রাসায়নিক সার ব্যবহার করে অধিক ফলন প্রাপ্তির মাধ্যমে সরগামের চাষ এদেশে আরও লাভজনক করা সম্ভব।

ভুট্টায় সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৯৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫৩০ গ্রাম
এমপি	৫০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০ গ্রাম
দস্তা সার	৪০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

২. বাকি ইউরিয়া ২ ভাগ করে একভাগ গাছ হাঁটু সমান হওয়ার পর এবং দ্বিতীয় বার গাছে ফুল আসার সময় পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হয়।

জাত	:	বর্ণালী, শুভ্রা, খৈ ভুট্টা, মোহর, সঙ্কর জাত
রোপণ দূরত্ব	:	৭০ × ২৫ সেমি.
বীজ হার	:	১২০ গ্রাম/শতক
ফলন	:	২৫ থেকে ৩০ কেজি
রোপণ সময়	:	রবি ও খরিপ মৌসুম

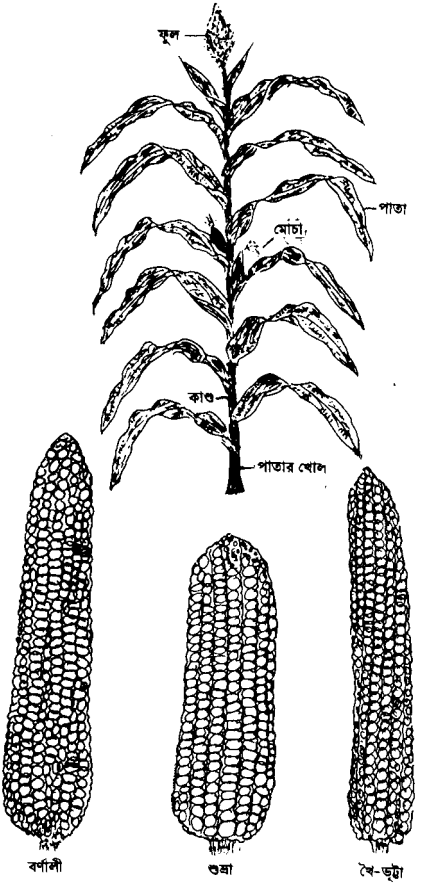

চিত্র ২৩ : ভুট্টা গাছ ও ভুট্টা মোচার বৈশিষ্ট্য।

গো-খাদ্য হিসেবে ভুট্টার চাষ করতে হলে বীজের পরিমাণ ২ থেকে ৩ গুণ করতে হয়। খরিপ মৌসুমের ভুট্টার চেয়ে শীতকালীন ভুট্টার চাষে সারের পরিমাণ বেশি লাগে। ভুট্টা

আন্ত:ফসল চাষে মূল ফসলের সাথে সমন্বয় করে সার দিতে হয়। অম্লীয় মাটিতে ভুট্টায় ম্যাগনেশিয়ামের অভাব দেখা দিলে ম্যাগসালফ ব্যবহার করতে হয়।

ফসল কাটার সময় : বীজ রোপণের ৩ থেকে ৪ মাস পর গো-খাদ্যের জন্য ২ থেকে ২.৫ মাস পর।

পরিচর্যা : সম্পূরক সেচ, আগাছা দমন ও ফসল সংরক্ষণ।

মিষ্টি আলুর জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৬৮০ গ্রাম
টি এস পি	৬৮০ গ্রাম
এম পি	৬০০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম
দস্তা সার	২০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

২. ইউরিয়া সার ২ বারে চারা রোপণের ১০ দিন এবং ৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : কমলা সুন্দরী, তৃপ্তি, দৌলতপুরী, বারি মিষ্টিআলু – ৪, বারি মিষ্টি আলু – ৫

ফলন : ১৫০ থেকে ১৮০ কেজি

রোপণ দূরত্ব : ৬০ × ২৫ সেমি.

বীজহার : ২৭০ টি লতাখণ্ড/শতক

রোপণ সময় : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর

ফসল তোলার সময় : মার্চ থেকে এপ্রিল

পরিচর্যা : আগাছা দমন, গাছের গোড়া বাঁধাই, সেচ দান ও ফসল সংরক্ষণ।

বেলে প্রধান মাটিতে মিষ্টি আলুর চাষ বেশি হয়। বেলে মাটির উর্বরতা কম। তাই উচ্চ ফলনশীল জাতের মিষ্টি আলু চাষ করে অধিক ফলন পেতে হলে নির্ধারিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয়ে। দেশীয় মিষ্টি আলুর জাতে সারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়।

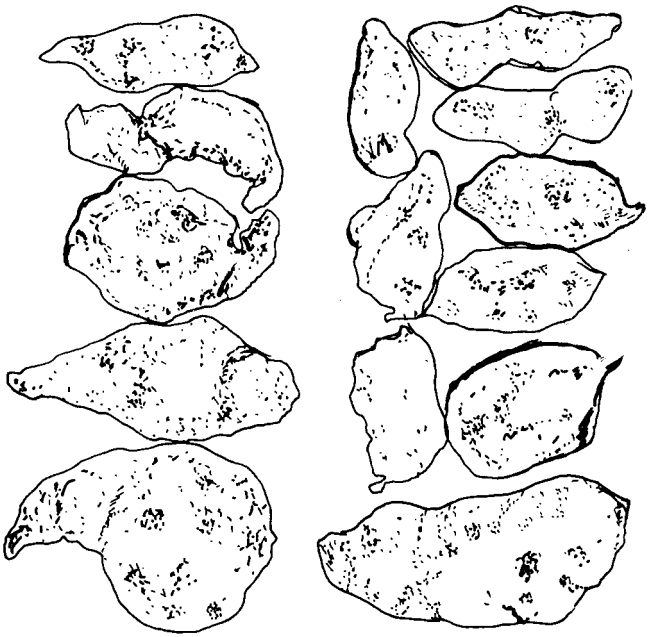

চিত্র ২৪ : মিষ্টি আলু

কন্দাল ফসল হিসেবে অধিক ফলনের জন্য মিষ্টি আলু মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি উপাদান বিশেষ করে পটাশিয়াম পরিশোষণ করে।

গোল আলুর জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১০০০ গ্রাম
টিএসপি	৪৫০ গ্রাম
এমপি	৭৪০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৫০ গ্রাম
ম্যাগসালফ	৫০ গ্রাম

প্রয়োগপদ্ধতি

১. অধিক ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

২. বাকি ইউরিয়া বীজ রোপণের ৩০ থেকে ৩৫ দিন পর পার্শ্ব প্রয়োগ করে ভেলি বেঁধে দিতে হয়।

চিত্র : ২৫ গোলআলু গাছ।

'গোলআলু গাছে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আলু উৎপাদন শুরু করতে হয়। এজন্য আলুর জমিতে সুষম সার দিতে হয়। ইউরিয়া কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। পটাশিয়াম বেশি দিতে হয় এবং এলাকাভেদে ম্যাগনেশিয়াম সার দিতে হয়।

জাত	:	ডায়মন্ট, পেট্রোনিস, কার্ডিনাল, হীরা, আমদানি করা অনুমোদিত জাতসমূহ
ফলন	:	১০০ থেকে ১৩০ সেমি./শতক
রোপণ দূরত্ব	:	৬০ × ২৫ সেমি.
বীজ হার	:	৭ কেজি/শতক

রোপণ সময় : অক্টোবর থেকে নভেম্বর
ফসল তোলার সময় : জানুয়ারি থেকে মার্চ
পরিচর্যা : আগাছা দমন, সেচ দান, গাছের গোড়া বাঁধাই, মালচিং ও রোগ দমন।

গোলআলুর জমিতে অনাবশ্যক অতিরিক্ত ইউরিয়া সার দিলে কন্দের ফলন কমে যেতে পারে এবং রোগের আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে।

আখ ফসলে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১২০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	১০০০ গ্রাম
জিপসাম	৬০০ গ্রাম
ম্যাগনেশিয়াম ইপসমলকা	৫০০ গ্রাম (অম্ল মাটিতে)
দস্তা সার	১৩০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. ইউরিয়া ব্যতীত সকল সারের অর্ধেক পরিমাণ জমি প্রস্তুতের সময় ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।
২. ইউরিয়া ব্যতীত সকল সারের বাকি অংশ পরিখার তলদেশের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।
৩. চারা রোপণের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মাসে ৩টি সমান কিস্তিতে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়।
৪. আগাছা দমন ও গাছের গোড়া বাঁধাইয়ের সময় ইউরিয়ার কিস্তিগুলো প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : ঈশ্বরদী ২/৫৪, ঈশ্বরদী – ১৬, ঈশ্বরদী ৯/৫৭, কোয়েম্বাটোর – ১১৫৮, বিও – ১৭ সহ ঈশ্বরদীর অন্যান্য অনুমোদিত জাতসমূহ
ফলন : ৩০০ থেকে ৪০০ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব : ১০০ × ২০ সেমি.
বীজ হার : ১৪০টি সেট/শতক
রোপণ সময় : অক্টোবর থেকে জানুয়ারি
ফসল কাটা : ১২ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে

পরিচর্যা : আগাছা দমন, সার প্রয়োগ, গোড়া বাঁধাই গাছ বাঁধাই, সেচ প্রদান ও ফসল সংরক্ষণ

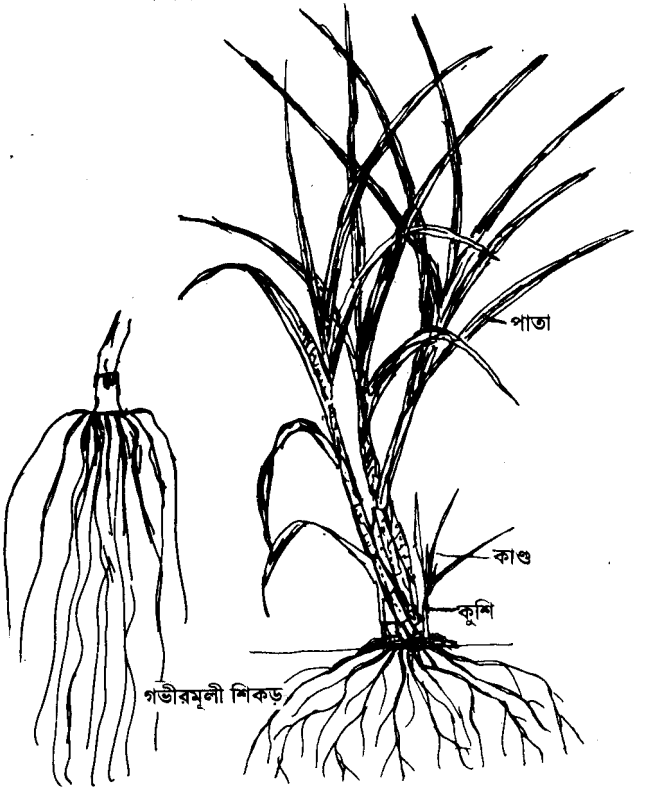

চিত্র ২৬ : আখ

আখ দীর্ঘ মেয়াদি ফসল। তাই সারসমূহ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয় যাতে দীর্ঘদিন গাছ সমভাবে গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে ইউরিয়া সার কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। কোনো কোনো অম্লীয় জমিতে ম্যাগনেশিয়াম প্রয়োগ করতে হয়।

তামাকে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ গ্রাম/শতক
ইউরিয়া	৪২০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এস পি	৪০০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম

চিত্র ২৭ : উন্নত মানের তামাক পাতা

তামাকের মূল উৎপাদন হচ্ছে এর পাতা। সার বা পুষ্টির অভাবজনিত কারণে গাছের পাতায় দাগ দেখা দিলে বা পাতার আকার-আকৃতি নষ্ট হয়ে গেলে তামাক চাষ থেকে আয় কমে যায়। এজন্য তামাকে সুষম সার এবং সঠিক প্রকারের সার ব্যবহার করা দরকার।

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

২. বাকি ইউরিয়া দুই কিস্তিতে চারা রোপণের ৩৫ ও ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : সিগারেট, হুক্কা, বিড়ি ও চুরুট
ফলন : ৮ থেকে ১২ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব : ৭০ × ৬০ সেমি.
রোপণ সময় : নভেম্বর থেকে জানুয়ারি
কাটার সময় : ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল (বৃষ্টির আগে হলে ভাল)
পরিচর্যা : আগাছা দমন, রোগ পোকা দমন, কুঁড়ি ভাঙা, পাতা সংগ্রহ।

দেশীয় তামাক জাতে সার কম দিতে হয়।

তামাকের জমিতে পটাশিয়াম ক্লোরাইডের বদলে পটাশিয়াম সালফেট (এস পি) দিতে হয়। এজন্য অতিরিক্ত জিপসাম দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তামাকের জমিতে সুষম সার না দিলে তামাক পাতার মান কমে যেতে পারে।

পাট গাছে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৪২০ গ্রাম
টিএসপি	২৭০ গ্রাম
এমপি	৩০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. অধিক ইউরিয়া ও অন্যান্য সার পাটের জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়।
২. বাকি ইউরিয়া দ্বিতীয় নিড়ানির পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : ডি – ১৫৪, সিভিএল – ১, কেজি/শতক
সিভি ই – ৩, সিসি – ৪৫, অ – ৪, ফাল্গুনী তোষা
ফলন : দেশী পাট ১২–১৫ কেজি/শতক, ফালগুনী তোষা ১০ থেকে ১৫ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব : ২৫ × ৭ সেমি.
বীজ হার : ৩০ গ্রাম
রোপণ সময় : মার্চ থেকে এপ্রিল
কাটার সময় : জুলাই থেকে আগস্ট
পরিচর্যা : আগাছা দমন, আচঁড়া দেওয়া, গাছ পাতলাকরণ, ফসল সংরক্ষণ।

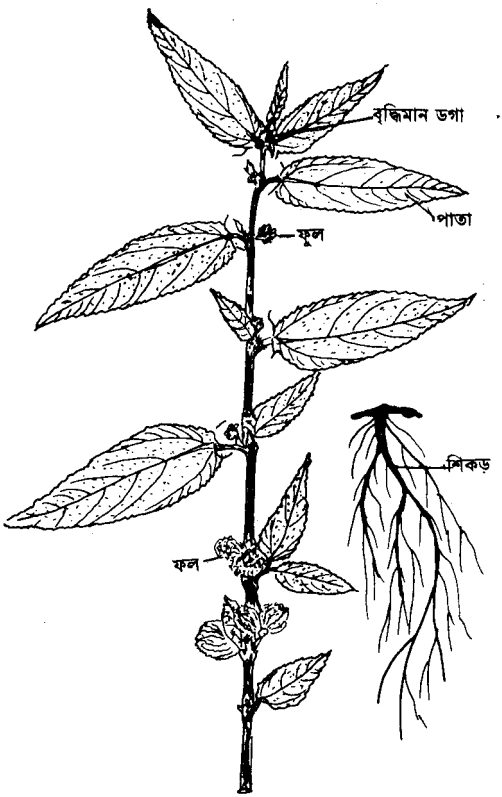

চিত্র ২৮ : পাট গাছ।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পাট অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। তাই এসময়ে যাতে সার বা পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি না পড়ে সেদিকে খেয়াল রেখে সার দিতে হয়। পাটের জমির জন্য জৈব সার খুব উপকারী।

ফাল্গুনী তোষা পাট সার প্রয়োগ

পাটের দেশীয় জাত বা তিতা পাটের চেয়ে তোষা প্রজাতির ফলন কিছুটা বেশি। সেজন্য সার চাহিদাও বেশি।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৭২০ গ্রাম
টি এস পি	৩৫০ গ্রাম
এমপি	৪৯০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম

জৈব সার তথা গোবর বা কমপোস্ট প্রয়োগ করলে তোষা পাটের ফলন বৃদ্ধি পায়। প্রতি শতকে ১০ থেকে ১৫ কেজি শুকনো গুঁড়া কমপোস্ট ব্যবহার করতে হয়।

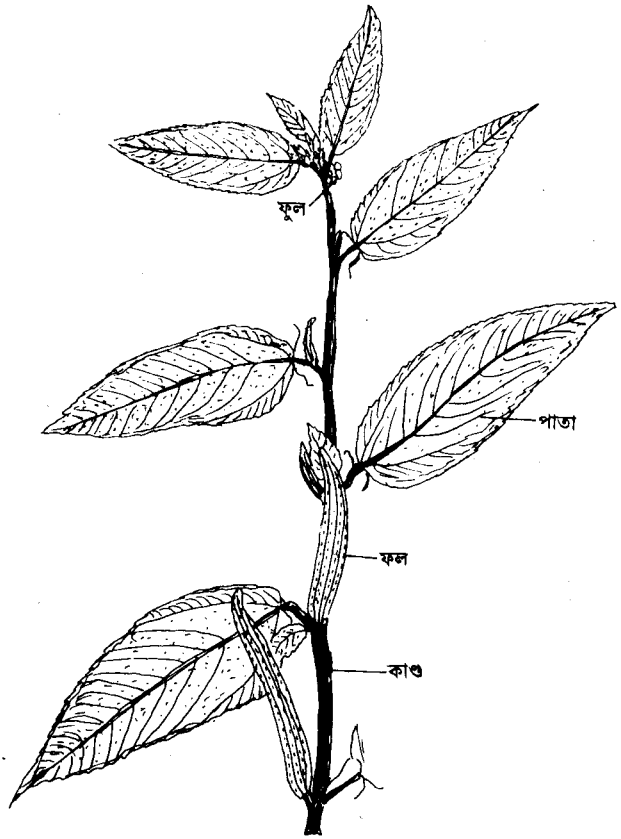

চিত্র ২৯ : তোষা পাট (ফাল্গুনী তোষা)।

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সার পাটের জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়।

২. বাকি ইউরিয়া দ্বিতীয় নিড়ানির পর উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

জাত : ফাল্গুনী তোষা, অ-৪
ফলন : ১৫ থেকে ২০ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব : ২৫ সেমি. × ৮ সেমি.

বীজ হার : ২৫ গ্রাম /শতক
রোপণ সময় : মার্চ থেকে এপ্রিল (কিছুটা আগাম)
কাটার সময় : জুলাই থেকে আগস্ট
পরিচর্যা : আগাছা দমন, আচঁড়া দেওয়া, গাছ পাতলাকরণ ও ফসল সংরক্ষণ।

শন পাট

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
টিএসপি	১৫০ গ্রাম
এসপি	১০০ গ্রাম
জিপসাম	৭৫ গ্রাম
দস্তা সার	২০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি

সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়ে।

জাত : কানপুর ১২, টি – ৬
ফলন : ৫ থেকে ৭ কেজি/শতক
বপন দূরত্ব : ২৫ × ৭ সেমি.
বীজ হার : ১৩০ গ্রাম
বপন সময় : মার্চ থেকে এপ্রিল
কাটার সময় : জুলাই থেকে আগস্ট
পরিচর্যা : স্বাভাবিক পরিচর্যা।

শন পাট লিগ্যুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে এদের ইউরিয়া সারের পরিমাণ কম দিতে হয়, কারণ শন পাটের শিকড়ে নাইট্রোজেন গুটি উৎপাদিত হয়।

সুবজ সার হিসেবে শন পাটের চাষ করা হলে বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়ে।

শন পাটের আঁশের গুণাবলী উন্নত করার জন্য পরিমিত ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করা দরকার।

জমিতে পানি লাগলে শন পাটের ক্ষতি হতে পারে। এজন্য শন পাটের জমিতে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়।

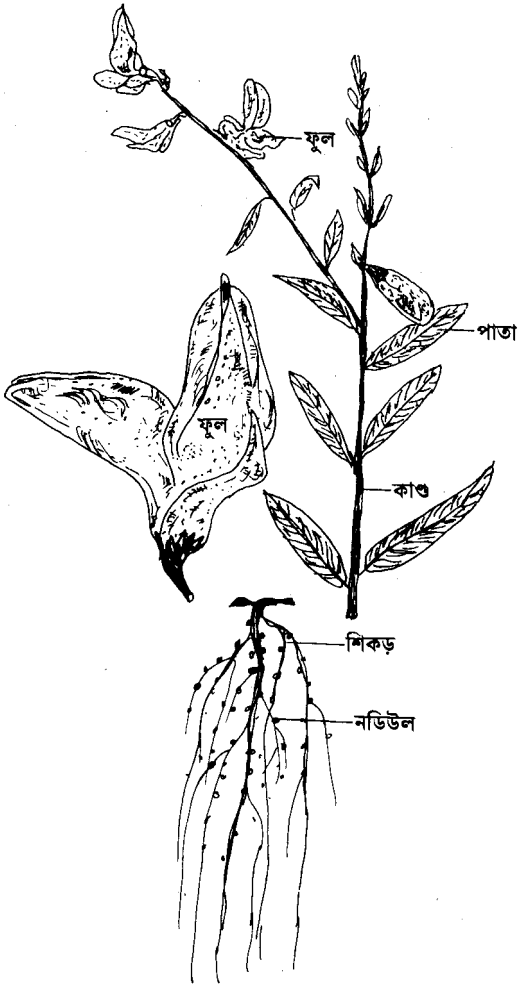

চিত্র ৩০ : শন পাট।

মেস্তার জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৪৫০ গ্রাম
টিএসপি	১৫০ গ্রাম
এমপি	১৭৫ গ্রাম
জিপসাম	১০০ গ্রাম
দস্তা সার	২০ গ্রাম (প্রয়োজনে)

প্রয়োগ পদ্ধতি

সবটুকু সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়।

জাত	:	টানি মেস্তা – ১
ফলন	:	৭ থেকে ৯ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	২৫ × ৮ সেমি.
বীজ হার	:	৬০ গ্রাম
রোপণ সময়	:	মার্চ থেকে এপ্রিল
কাটার সময়	:	জুলাই থেকে আগস্ট
পরিচর্যা	:	স্বাভাবিক পরিচর্যা, আগাছা দমন

মেস্তা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

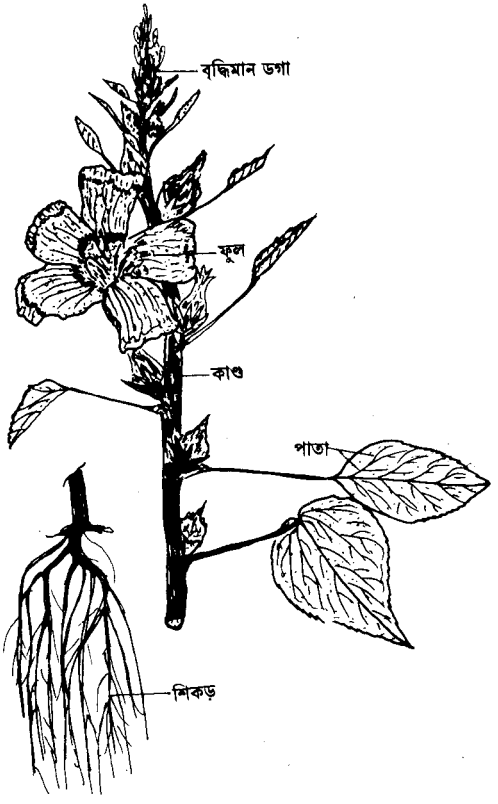

চিত্র ৩১ : মেস্তা।

বাংলাদেশে আঁশ ফসল হিসেবে মেস্তার চাষাবাদ কম। তবে পরিমিত সুষম সার দিয়ে আবাদ করলে ফলন বেশি হয় এবং আঁশের মান ভাল হয়।

অন্যান্য ফসলের সাথে উপযুক্ত ফসল বিন্যাস (cropping pattern) অনুসরণ করে চাষাবাদ করলে অর্থনৈতিকভাবে বেশ লাভবান হওয়া যায়।

কেনাফ জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	২৫০ গ্রাম
টিএসপি	১৫০ গ্রাম
এমপি	১০০ গ্রাম
জিপসাম	৬০ গ্রাম
দস্তা সার	২০ গ্রাম (প্রয়োজনে)

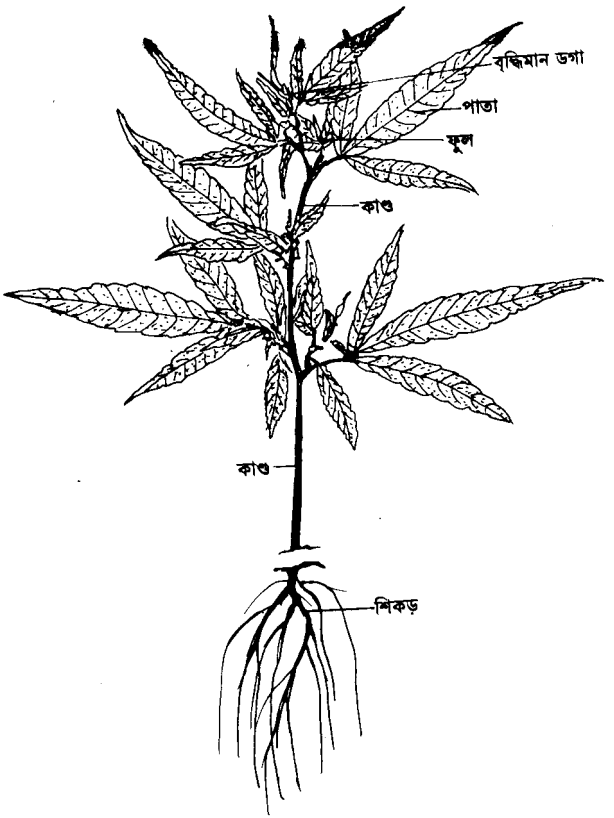

চিত্র ৩২ : কেনাফ।

প্রয়োগ পদ্ধতি

সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

জাত	:	জলী কেনাফ – ১ বা কেনাফ সি – ২, এইচ সি ৮৭৬
ফলন	:	৪ থেকে ৬ কেজি
রোপণ দূরত্ব	:	৩০ × ৭ সেমি.
বীজ হার	:	৬০গ্রাম/শতক
রোপণ সময়	:	মার্চ থেকে এপ্রিল
কাটার সময়	:	জুলাই থেকে আগস্ট
পরিচর্যা	:	আগাছা দমন, ফসল সংরক্ষণ ও অন্যান্য স্বাভাবিক পরিচর্যা।

বাংলাদেশে আঁশ ফসল হিসেবে কেনাফের চাষাবাদ কম। কারণ ফলন কম কিন্তু পরিমিত সার দিয়ে চাষাবাদ করলে কেনাফের ফলন বাড়বে। উপযুক্ত ফসল বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করে চাষাবাদ করতে পারলে কেনাফ চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। আঁশ ফসলে বহুমুখিতা আনয়নের জন্য কেনাফ বেশ গুরুত্বের দাবীদার।

তুলায় সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৭৭০ গ্রাম
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	৬৩০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৫০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. এক–তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার তুলার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

২. ইউরিয়া বাকি অংশ ২ ভাগে বীজ বপনের ৩০ দিন এবং ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

৩. ডিসিওয়াই ১, ডেল্টা পাইন, ডেফ বিএসি –৭ বা রূপালী বিএসি – ২৪ বিএসি – ৭৯

ফলন	:	৮ থেকে ১২ কেজি /শতক
রোপণ দূরত্ব	:	৭৫ × ২৫ সেমি.
বীজ হার	:	৮০গ্রাম/শতক
রোপণ সময়	:	আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর
ফসল তোলার সময়	:	ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল
পরিচর্যা	:	আগাছা দমন, সেচদান ও ফসল সংরক্ষণ।

চিত্র ৩৩ : তুলা গাছ

তুলা মধ্যম মেয়াদি ফসল। তবে গাছে ফুল ও বল উৎপাদন গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধি হারের উপর নির্ভর করে। তাই তুলা জমিতে এমনভাবে সার প্রয়োগ করতে হয়ে যাতে গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধি দ্রুত হয়, গাছের কাঠামো শক্ত হয় এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে।

খেসারি জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৮০ গ্রাম
টিএসপি	১৭০ গ্রাম
এমপি	৯০ গ্রাম
জিপসাম	৬০ গ্রাম

চিত্র ৩৪ : খেসারি গাছ

খেসারি গাছ লিগ্যুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তবে মাটিতে প্রারম্ভিক অবস্থায় পুষ্টির অভাব হলে গাছ বড় হয় না। শিকড়ে নডিউলের সংখ্যা কম হয়। ফলনও কম হয়। তাই মাটির উর্বরতা মান অনুসারে খেসারি জমিতে সার বিশেষ করে ফসফেট সার দিতে হয়।

প্রয়োগপদ্ধতি

সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়।

জাত : কলা রোয়া, খেসারি ৬১৩০, জামালপুর
ফলন : ৫ থেকে ৭ কেজি/শতক
বীজ হার : ১২০ গ্রাম
রোপণ সময় : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর
কাটার সময় : মার্চ থেকে এপ্রিল

বাংলাদেশে বোনা আমনের জমিতে অনুফসল (Relay crop) হিসেবে খেসারির চাষ করলে সাধারণত সার দিতে হয় না। তবে উচ্চ ফলনের জন্য আলাদা একক ফসল হিসেবে চাষ করতে হলে এই সার দিতে হয়। পাবনা, রাজশাহী, নেত্রকোনা, ফরিদপুরসহ হাওড়/বাঁওড় এলাকায় খেসারির চাষ বেশি হয়।

খেসারি লিগ্যুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে এতে নাইট্রোজেন সার কম দিতে হয়। জমিতে খেসারির চাষ করলে জমির উর্বরতা বাড়ে।

মসুর জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১২০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমপি	১৯০ গ্রাম
জিপসাম	২২০ গ্রাম
সোডিয়াম মলিবডেট	১০ গ্রাম
জীবাণু সার	প্রস্তুতকারকের সুপারিশ অনুযায়ী

সব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : এল – ৫ বা উৎফলা, বারি মসুর – ২, বারি মসুর – ৩, বারি মসুর – ৪
ফলন : ৫ থেকে ৭ কেজি/শতক
রোপন দূরত্ব : ছিটিয়ে বোনা
বীজ হার : ৮০ গ্রাম
রোপণ সময় : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর
ফসল কাটার সময় : ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ

কোনো জমিতে জীবাণু সার দিলে নাইট্রোজেন যোগাবে এবং ফলনও বাড়বে।

বোনা আমন ধানের জমিতে অনুফসল হিসেবে মসুরের চাষ করলে তেমন সার ব্যবহার করা হয় না।

তবে উচ্চ ফলনের জন্য একক ফসল হিসেবে চাষ করলে পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয়।

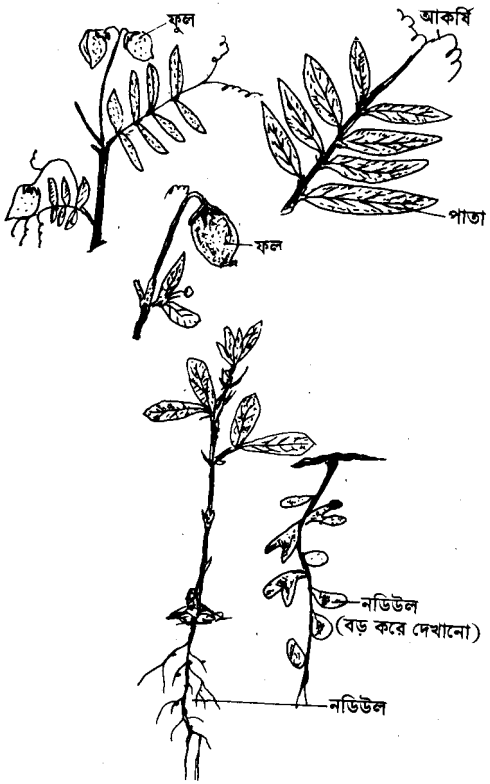

চিত্র ৩৫ : মসুর গাছ।

ছোলার জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১২০ গ্রাম
টিএসপি	৩২০ গ্রাম
এমপি	২৯০ গ্রাম
জিপসাম	৩৫০ গ্রাম
দস্তা সার	২০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম
জীবাণু সার	প্রস্তুতকারকের সুপারিশ অনুযায়ী

প্রয়োগ পদ্ধতি

সব সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়।

জাত	:	নবীন, বারি ছোলা – ১, বারি ছোলা – ২, বারি ছোলা – ৩, বারি ছোলা – ৪, বারি ছোলা – ৫, বারি ছোলা – ৬,
ফলন	:	৭–৮ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	৪০ × ২০ সেমি.
বীজ হার	:	১২০ গ্রাম
রোপণ সময়	:	নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর
ফসল তোলার সময়	:	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ
পরিচর্যা	:	আগাছা দমন ও রোগ-পোকা দমন।

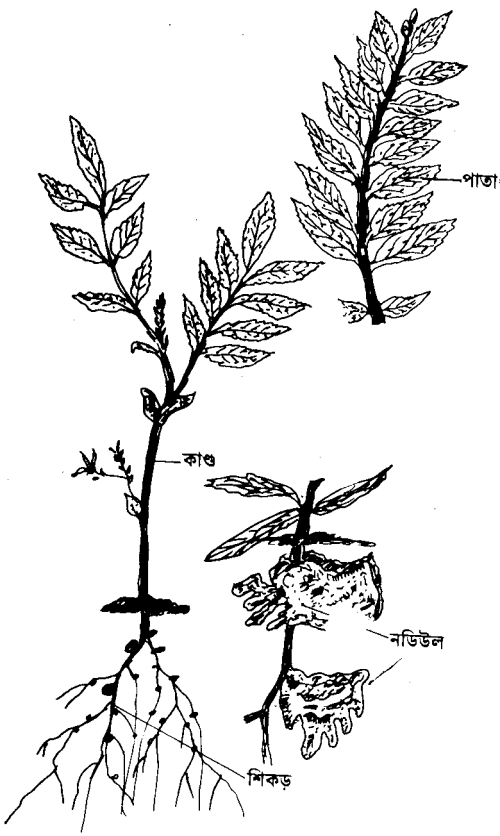

চিত্র ৩৬ : ছোলা গাছ।

ছোলা জমিতে খুব সাবধানে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করতে হয়। কারণ নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ অসম হলে গাছে ফুল-ফল উৎপাদন বিলম্বিত হয় ও পরিমাণে কমে যায়। সার প্রয়োগের সাথে সাথে রোগ দমন নিশ্চিত করতে হয়।

মুগ কলাই ফসলে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
টিএসপি	১৮৫ গ্রাম
এমপি	৯৫ গ্রাম
জিপসাম	১২০ গ্রাম
দস্তা সার	২০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম
জীবাণু সার	প্রস্তুতকারকের সুপারিশ অনুযায়ী

প্রয়োগ পদ্ধতি

সব সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়ে।

জাত : কান্তি, বারি মুগ – ৩, বারি মুগ – ৩, বারি মুগ – ৪, বিনা মুগ – ১, বিনা মুগ – ২

ফলন : ৩ থেকে ৫ কেজি/শতক

বপন দূরত্ব : ২৫ ×৬ সেমি.

বীজ হার : ৬৫ গ্রাম/শতক

বপন সময় : অক্টোবর ও ফেব্রুয়ারি

মুবারিখ জাতের মুগকলাই গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালেও চাষ করা যায়।

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারি ও মে

পরিচর্যা : স্বাভাবিক পরিচর্যা

বিভিন্ন সমস্যার কারণে ফসলে উচ্চ ফলন প্রাপ্তি নিশ্চিত না হলে সারের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়।

মুগকলাই লিগ্যুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে এর শিকড়ে নাইট্রোজেনসম্পন্ন নডিউল তৈরি হয়। এজন্য মুগকলাইয়ে নাইট্রোজেন সার কম দিতে হয়। তবে মুগকলাইয়ের ফলন বৃদ্ধির জন্য ফসফরাস প্রয়োগ খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ফসফরাসের ঘাটতিতে মুগকলাই গাছে পাতা বেশি হয়ে যায়, ফুল কম হয়, তাই ফলনও কম হয়।

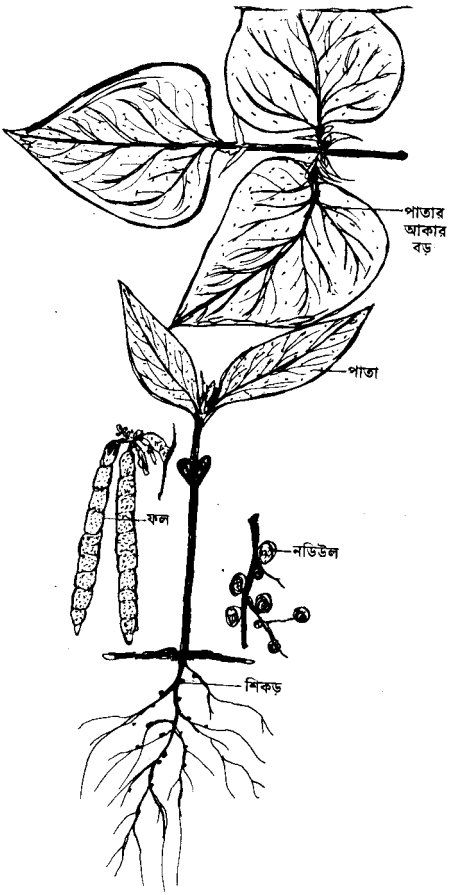

চিত্র ৩৭ : মুগ কলাই।

মাসকলাই ফসলে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
টিএসপি	১৫০ গ্রাম
এম পি	৭০ গ্রাম
জিপসাম	১১০ গ্রাম
জীবাণু সার	প্রস্তুতের সুপারিশ অনুযায়ী

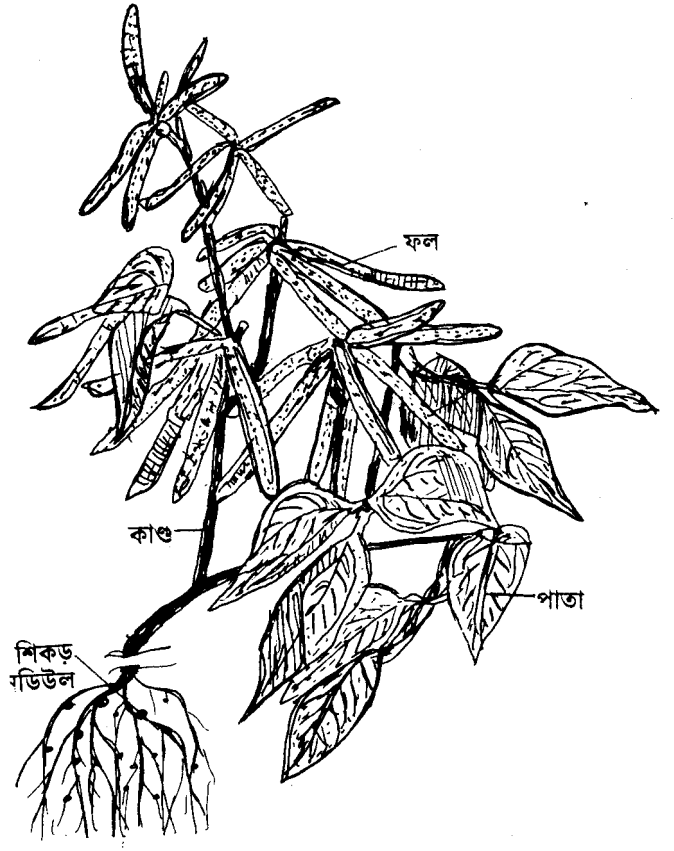

চিত্র ৩৮ : মাসকলাই গাছ।

মাসকলাই লিগ্যুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত গাছ। মাস কলাই গাছে শিকড়ে *Rhizabium* ব্যাকটোরিয়া নাইট্রোজেন গুটি তৈরি করে বলে নাইট্রোজেনের তেমন ঘাটতি দেখা যায় না। তবে উক্ত ফলন প্রাপ্তির জন্য ফসফেটসহ অন্যান্য সার সুষমভাবে প্রয়োগ করতে হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি

সব সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়।

জাত	:	বারি মাস – ২, বারি মাস – ৩
ফলন	:	৩ থেকে ৪ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	৩০ × ৬ সেমি.

বীজ হার : ৬৫ গ্রাম/শতক

রোপণ সময় : অক্টোবর ও ফেব্রুয়ারি (মাস কালাই বারো মাসি জাত, সারা বছরই চাষ করা যায়)

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারি ও মে

পরিচর্যা : স্বাভাবিক পরিচর্যা।

গো-খাদ্য বা সবুজ সার হিসেবে মাসকলাইয়ের চাষ করা হলে বীজ হার ২ থেকে ৩ গুণ বাড়িয়ে দিতে হয়। গতানুগতিক চাষাবাদে জমি চাষ না করে তাতে বীজ বুনে দিলে সেক্ষেত্রে সারের ব্যবহার করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে এতে ফলন খুব কমে যায়।

মটর জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৯৫ গ্রাম
টিএসপি	১৭০ গ্রাম
এমপি	৭০ গ্রাম
জিপসাম	৮৫ গ্রাম
দস্তা সার	১০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি

সব সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়।

জাত : বাগাতি পাড়া, এফ সি ৩৬৮১

ফলন : ৫ থেকে ৭ কেজি/শতক

রোপণ দূরত্ব : ২৪০ গ্রাম/শতক

বীজ হার : ২৪০ গ্রাম/শতক

রোপণ সময় : নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর

ফসল তোলার সময় : জানুয়ারি থেকে মার্চ

পরিচর্যা : আগাছা দমন ও ফসল সংরক্ষণ।

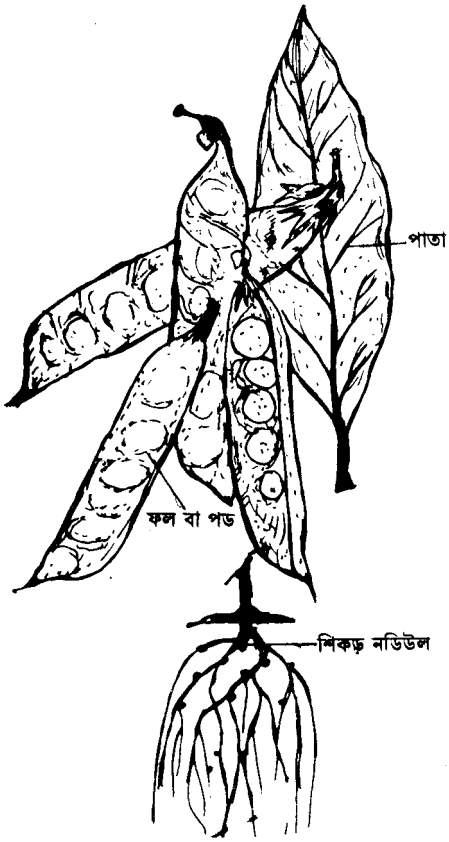

চিত্র ৩৯ : মটর।

(মটর শুঁটি লিগ্যুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত গাছ। এই গাছের শিকড়ে *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নাইট্রোজেন গুটি তৈরি হয়। এজন্য মটরশুঁটির জমিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের চাহিদা কম। তবে হিসাবমতো অন্যান্য সব সার না দিলে গাছে পাতা বেশি হয়ে ফলন কমে যায়। তাই ফসফেটসহ অন্যান্য সার সুষমভাবে প্রয়োগ করতে হয়।)

মটরের বিভিন্ন স্থানীয় জাত থাকতে পারে, যেমন– এগুলোর ফলন কম।

মটর লিগ্যুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে এর নাইট্রোজেন সার চাহিদা কম। মটর গাছের শিকড়ে নাইট্রোজেন গুটি বা নডিউল তৈরি হয়। পূর্বে চাষ করা মটর গাছে গন্ধক ও দস্তার অভাব দেখা দিয়ে থাকলেই কেবল জিপসাম ও দস্তার সার প্রয়োগ করতে হয়।

অড়হরে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
টিএসপি	৩৮০ গ্রাম
এমপি	১৯০ গ্রাম
জিপসাম	২৩০ গ্রাম
দস্তা সার	৩৫ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম

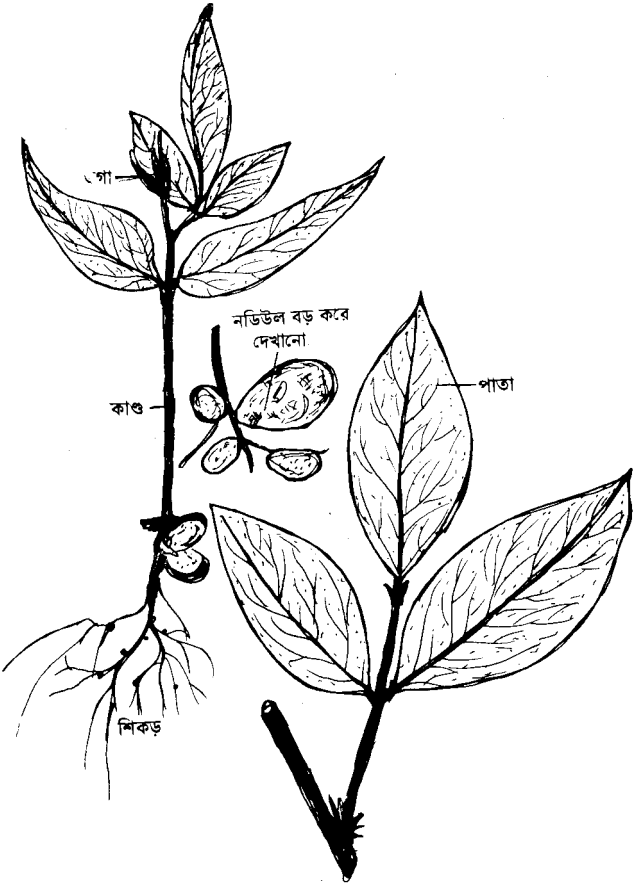

চিত্র ৪০ : অড়হর।

প্রয়োগ পদ্ধতি

সব সার রোপণ সারির জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়ে।

জাত	:	শালিয়া, পাটনাই, আইপিসিএল – ২, নং ৭৬০১২
ফলন	:	৫ থেকে ৭ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	লম্বা গাছ ১০০ × ২৫ সেমি. খাটো গাছ ৩৫ × ১২ সেমি.
বীজ হার	:	৮০গ্রাম/শতক
রোপণ সময়	:	জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি
ফসল তোলার সময়	:	জুন থেকে জুলাই
পরিচর্যা	:	আগাছা দমন ও ফসল সংরক্ষণ।

বাংলাদেশে মাঠ ফসল হিসেবে ছাড়াও জাতভেদে রাস্তার পাশে বা বাঁধের পাশে অড়হর গাছ লাগানো হয়ে থাকে। রাস্তা বা বাঁধের পাশে এক সারি বা দুই সারিতে লাগানো হলে লম্বা সারিকে রোপণ দূরত্ব অনুসারে শতকে জমির পরিমাণ নিরূপণ করে সেই অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছে ফুলের সংখ্যা কম হওয়া ও ফুল ঝরে পড়ার লক্ষণ দেখা দিলে বোরন সার অর্থাৎ বোরাক্স সার স্প্রে করা যায়।

গো-মটর বা কাউপিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
টিএসপি	৩৮০ গ্রাম
এমপি	২০০ গ্রাম
জিপসাম	২২০ গ্রাম
দস্তা সার	২০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম
জীবাণু সার	প্রস্তুতকারকের সুপারিশ অনুযায়ী

প্রয়োগ পদ্ধতি

সব সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়।

জাত	:	বারি ফেলন – ১, বারি ফেলন – ২, ভিটা – ৬, ভিটা – ৭, ভিটা – ৮।
ফলন	:	৫ থেকে ৭ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	৭০ × ২০ সেমি.

বীজ হার	:	৮০ গ্রাম
রোপণ সময়	:	ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি
ফসল তোলার সময়	:	মার্চ থেকে এপ্রিল
পরিচর্যা	:	স্বাভাবিক পরিচর্যা।

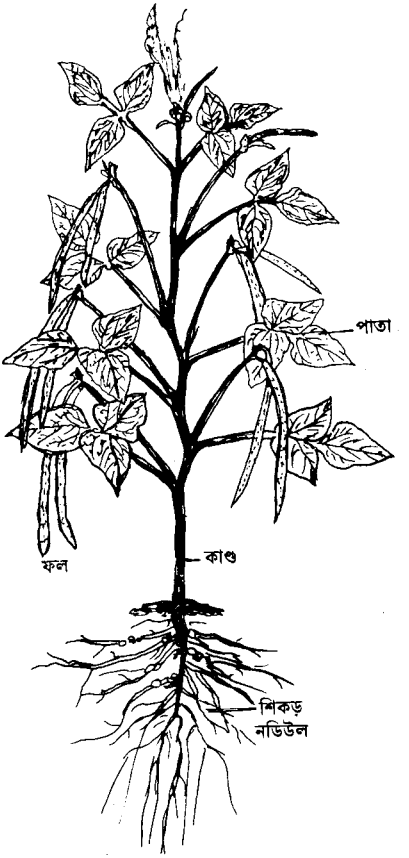

চিত্র ৪১ : গোমটর বা কাউপি গাছ।
(অন্যান্য লিগিউম ফসলের অনুরূপ গোমটরেও সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়।)

বাংলাদেশে চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ জমিতে গো-মটর বা কাউপির চাষ হয়। ধানের এসব জমিতে গো-মটর (ফেলন) চাষ করা হয় এবং এতে তেমন কোনো সার দেওয়া হয় না। যেহেতু বর্তমানে গো-মটরের উন্নত জাত রয়েছে সেজন্য এসব উন্নত জাত চাষ করে অধিক ফলন পেতে হলে সুষমভাবে সার প্রয়োগ করতে হয়। তবে স্থানীয় জাতসমূহে সার প্রয়োগের সময় সারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়।

সরিষায় সার প্রয়োগ

সারের নাম	জাতভেদে সারের পরিমাণ (গ্রাম/শতক)	
	সোনালী সরিষা, বারি সরিষা-৬ বারি সরিষা-৭ বারি সরিষা-৮ সফল অগ্রণী	টরি - ৭, কল্যাণীয়া, রাই-৫, দৌলত
ইউরিয়া	৮২৫ গ্রাম	৬৭৫ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম	৩২০ গ্রাম
এমপি	৩৫০ গ্রাম	২৮০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম
দস্তা সার	৫০ গ্রাম	৪০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম
ফলন (কেজি/শতক)	৬ থেকে ৯	৪ থেকে ৬

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়ে।

২. বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ২০ থেকে ২৫ দিন পর উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

বীজ বপন দূরত্ব : ২৫ × ৫ সেমি.
বীজ হার : ৪০গ্রাম/শতক
রোপণ সময় : অক্টোবর থেকে নভেম্বর
ফসল তোলার সময় : জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি
পরিচর্যা : আগাছা দমন, পানি সেচ, ফসল সংরক্ষণ।

সরিষার ফলন অনেকাংশ সার সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। সোনালি সরিষা, সফল ও অগ্রণী জাতে উচ্চ ফলন পেতে হলে নির্ধারিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয়।

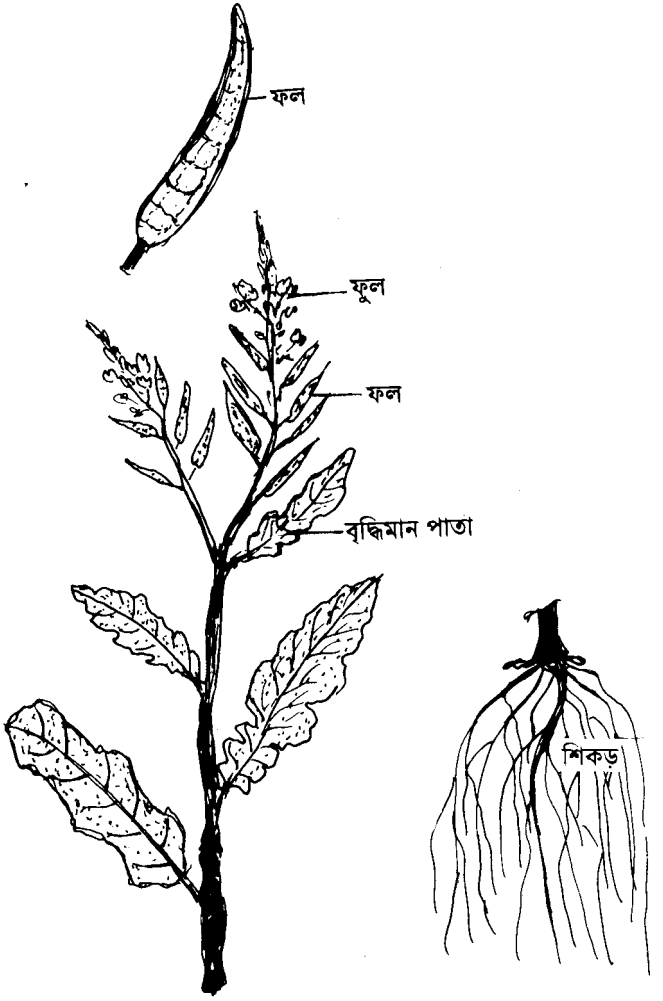

চিত্র ৪২ : সরিষা গাছ

সরিষা গাছে চারা বয়স পার হওয়ার সাথে সাথে গাছে একাধারে ফুল ও ফল ধরতে শুরু করে আবার গাছের বৃদ্ধিও অব্যাহত থাকে। এজন্য সরিষার জমিতে সুষম সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।

গাছে ফুল হওয়ার পর ঝরে পড়তে শুরু করলে বা দানা পুষ্ট হতে সমস্যা দেখা দিলে বোরন সার মলিবডেনাম সার স্প্রে করতে হয়। এ সময় গাছে অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ বা জাবপোকার আক্রমণ দেখা দিলে তাও দমন করতে হয়।

তিলে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৫২০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমপি	২৭০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম

চিত্র ৪৩ : তিল।

উচ্চ ফলন পেতে হলে তিলের ফসলে চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. অর্ধেক ইউরিয়া এবং সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

২. বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ৩০ থেকে ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : টি-৬ জামালপুর, তিল নং ১১।
ফলন : ৫ থেকে ৭ কেজি
রোপণ দূরত্ব : ৩৫ × ২০ সেমি.
বীজ হার : ৪০ গ্রাম/শতক
রোপণ সময় : অক্টোবর ও মার্চ
ফসল কাটার সময় : ফেব্রুয়ারি ও মে
পরিচর্যা : আগাছা দমন ও ফসল সংরক্ষণ।

এখানে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় জাতের তিলের চাষ করলে এবং অন্যান্য পরিচর্যার সুযোগ কম থাকলে, অর্থাৎ ফলন কম হওয়ার আংশকা থাকলে সারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়।

তিসিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক	
ইউরিয়া	২৭৫ গ্রাম	
টিএসপি	২০০ গ্রাম	
এমপি	৯০ গ্রাম	
জিপসাম	১২০ গ্রাম	
দস্তা সার	৩০ গ্রাম	
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	প্রয়োজনে দিতে হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি

সব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : নীলা ধামরাই, নং ৮১২৫
ফলন : ৪ – ৬ কেজি
রোপণ দূরত্ব : ২০ × ১০ সেমি.

বীজ হার : ৬০গ্রাম/শতক
রোপণ সময় : নভেম্বর–ডিসেম্বর
ফসল তোলার সময় : ফ্রেব্রুয়ারি – মার্চ
পরিচর্যা : আগাছা দমন, সুযোগমতো সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

বরেন্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টি নির্ভর অবস্থায় অন্যান্য ফসলের সাথে ফসল বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করে আন্ত:ফসল হিসেবে তিসির চাষ করলে মূল ফসলের চাহিদার সাথে মিল রেখে তিসিতে সার প্রয়োগ করতে হয়। তিসি গাছে ফুল ঝরে পড়তে শুরু করলে বা দানা পুষ্ট হতে সমস্যা দেখা দিলে বোরন ও মলিবডেনাম সার গাছের পাতায় স্প্রে করতে হয়। তিসির আঁশ উৎপাদন বাড়াতে হলে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হয় যাতে গাছ দ্রুত লম্বা হয়।

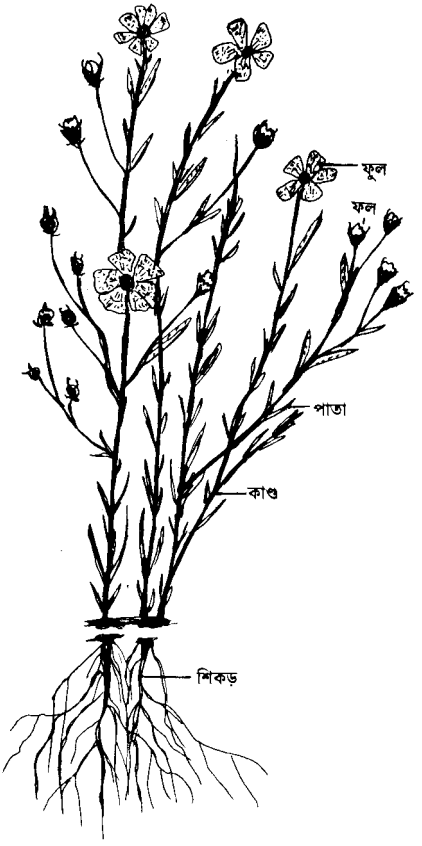

চিত্র ৪৪ : তিসি।

সূর্যমুখীতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৬৮০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমপি	৩২০ গ্রাম
জিপসাম	৩৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৫০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম

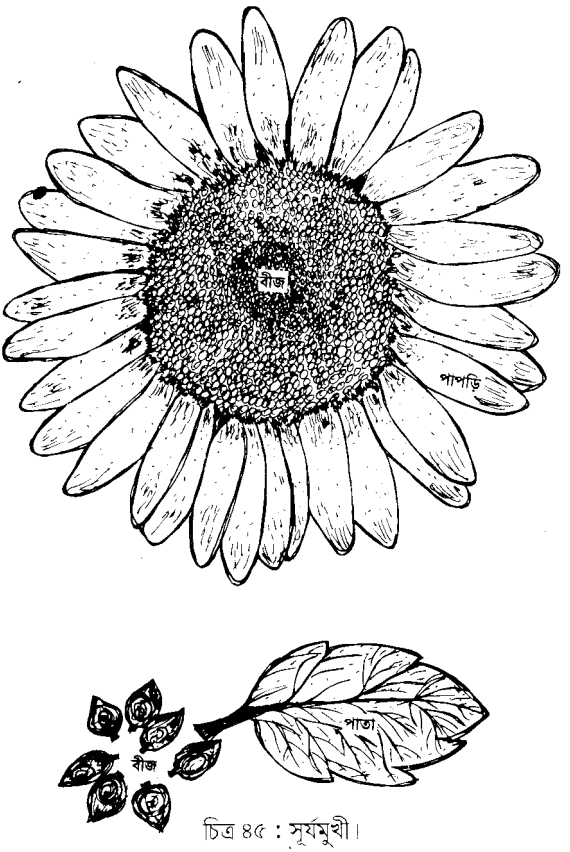

চিত্র ৪৫ : সূর্যমুখী।

সূর্যমুখী গাছ মাটি থেকে প্রচুর পুষ্টি গ্রহণ করে। সূর্যমুখীর উচ্চফলন প্রাপ্তির জন্য পর্যাপ্ত সালফার ও বোরন প্রয়োগ করতে হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

২. বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ৪০ থেকে ৫০ দিন পর পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হয়।

সূর্যমূখী গাছে সুষম সার না দিলে গাছের কাঠামো শক্ত হয় না ফলে গাছ সামান্য বাতাসেই হেলে পড়ে এবং ফলন কম হয়।

জাত	:	কিরণী বা ডি এস – ১
ফলন	:	৫ থেকে ৭ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	৫০ × ২৫ সেমি.
বীজ হার	:	৬০ গ্রাম/শতক
রোপণ সময়	:	নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর
ফসল তোলার সময়	:	মার্চ থেকে এপ্রিল
পরিচর্যা	:	আগাছা দমন, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

সূর্যমুখী গাছে ফুলে বীজ উৎপাদনে সমস্যা দেখা দিলে গাছের পাতায় বোরন স্প্রে করতে হয়।

সয়াবিনে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১১০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমপি	৩০০ গ্রাম
জিপসাম	২৮০ গ্রাম
দস্তা সার	৫০ গ্রাম (প্রয়োজনে)
সোডিয়াম মলিবডেনাম	২.৫ গ্রাম (প্রয়োজনে)

প্রয়োগ পদ্ধতি

সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

জাত	:	সোহাগ, ব্যাগ, ডেভিস, লী – ৭৪, ক্লার্ক – ৬৩। সোহাগ জাত বাংলাদেশে উদ্ভাবিত এবং এর ফলন বেশি।
ফলন	:	৮ থেকে ১০ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	৩০ × ৫ সেমি.
বীজ হার	:	৩০০ গ্রাম
রোপণ সময়	:	ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি

ফসল তোলার সময় : মার্চ – এপ্রিল
পরিচর্যা : আগাছা দমন ও ফসল সংরক্ষণ।

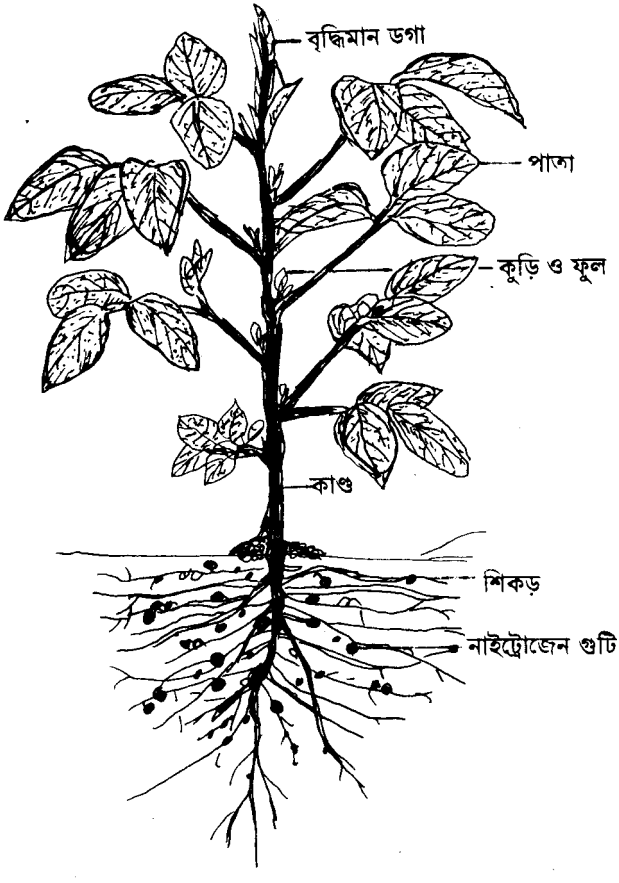

চিত্র ৪৬ : সয়াবিন।

'সয়াবিন গাছের শিকড়ে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন গুটি তৈরি হয়। তবে বাংলাদেশের অনেক মাটিতে সয়াবিনে নাইট্রোজেন গুটি উৎপাদন কম। এজন্য যথাযথ অণুজীব ইনোকুলাম ব্যবহার করা ভাল। এছাড়া ফসফেট ও পটাশ সারও সয়াবিনের জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

সয়াবিন লিগ্যুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত গাছ বলে এর শিকড়ে নাইট্রোজেনসমৃদ্ধ নডিউল তৈরি হয়। তবে বাংলাদেশে অনেক স্থানে এই নডিউল তৈরি হয় না বলে জানা গেছে। সেজন্য এতে নাইট্রোজেন সার দিতে হয়, তবে পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। বীজের ফলন বৃদ্ধির জন্য সয়াবিনে ফসফেট ও পটাশ সার খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

কুসুমফুলে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	৩২০ গ্রাম
টিএসপি	২৫০ গ্রাম
এমপি	১৭০ গ্রাম
জিপসাম	১৪০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম

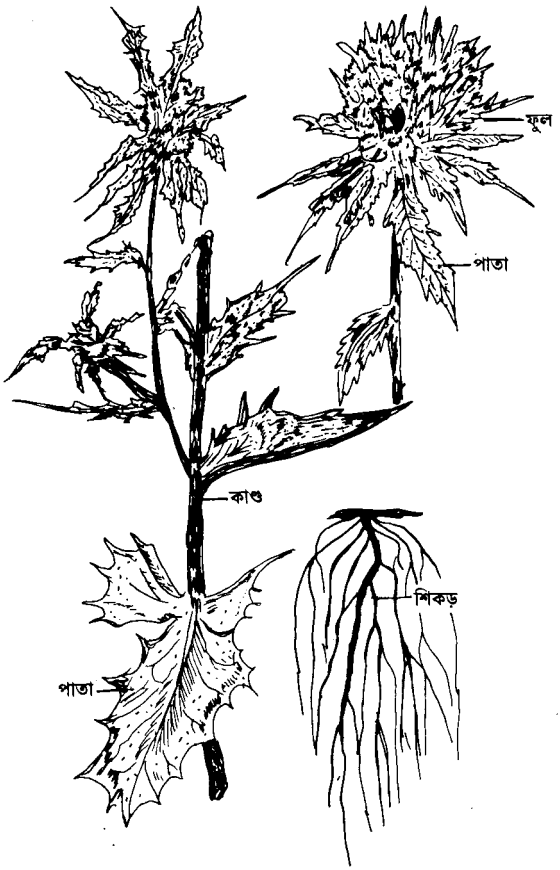

চিত্র ৪৭ : কুসুম ফুল।

প্রয়োগ পদ্ধতি

১. অর্ধেক ইউরিয়াসহ সব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

২. বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ৩৫ থেকে ৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

জাত	:	সেফ–১, ডেমরা কুসুম ও এস – ৪০০
ফলন	:	৫ থেকে ৭ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	৪৫ × ৩০ সেমি.
বীজ হার	:	১০০ গ্রাম/শতক
রোপণ সময়	:	নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর
ফসল তোলার সময়	:	মার্চ থেকে এপ্রিল
পরিচর্যা	:	আগাছা দমন, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

বাংলাদেশে তেল হিসেবে কুসুম ফুলের চাষাবাদ কম। তবে সুষম সার দিয়ে অধিক ফলন পাওয়া গেলে এর চাষ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হতে পারে। ইদানীং ফুল হিসেবেও কুসুম ফুলের চাষাবাদ আকর্ষণীয় হচ্ছে। সুষম সার দিলে কুসুম ফুল বড় হয়, উজ্জ্বল হয় এবং স্থায়িত্ব বাড়ে।

চীনাবাদামে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১২০ গ্রাম
টিএসপি	৩৯০ গ্রাম
এমপি	৩০০ গ্রাম
জিপসাম	৩০০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম
জীবাণু সার	প্রস্তুতকারকের সুপারিশ অনুযায়ী

প্রয়োগ পদ্ধতি

সব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

জাত	:	বাসন্তী, মাহইচর, ত্রিদানা, ঢা – ১, ঢা – ২, ঝিঙ্গা বাদাম
ফলন	:	৭ থেকে ১০ কেজি/শতক
রোপণ দূরত্ব	:	৪০ × ১৫ সেমি
বীজ হার	:	৪৫০ গ্রাম
রোপণ সময়	:	নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর

ফসল তোলার সময় : মার্চ থেকে এপ্রিল

পরিচর্যা : আগাছা দমন, গোড়া বাঁধাই ও ফসল সংরক্ষণ।

চীনাবাদাম চাষে জিপসাম সার এবং জীবাণু ইনোক্যুলামের ব্যবহার খুব উপকারী। যেহেতু বাংলাদেশে মূলত অনুর্বর চরাঞ্চলে চীনাবাদামের চাষ হয় সেজন্য উচ্চ ফলন পেতে হলে উপযুক্ত মাত্রায় সার দিতে হয়। উচ্চ ফলনশীল জাতে সার অবশ্যই বেশি দিতে হয়। তবে ঢাকা– ১ এর জন্য সার কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়।

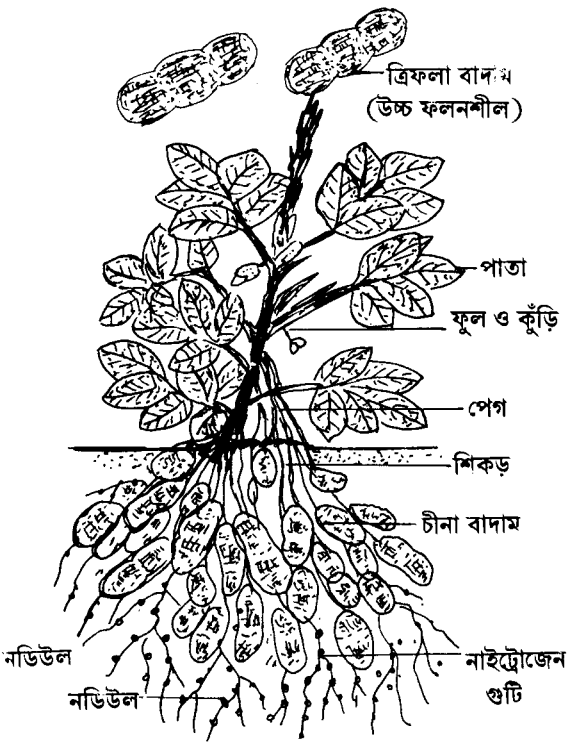

চিত্র ৪৮ : চীনাবাদাম

বাংলাদেশে মূলত অনুর্বর চরাভূমিতে চীনাবাদামের চাষাবাদ করা হয়। এজন্য পুষ্টির অভাবে চীনাবাদামের ফলন কম হয়। তাই উচ্চ ফলন পেতে হলে চীনাবাদামে সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়। চীনাবাদামে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ কম লাগে তবে ফসফেট, পটাশ ও জিপসাম সার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করতে হয়। জিপসাম সারের অভাবে চীনাবাদামের খোসা শক্ত বা পুষ্ট হয় না, বাদামের আকার ছোট হয়।

পান চাষে সার প্রয়োগ

জাত : গাছপান বা টবে লাগানোর জাত

ফলন : গাছ প্রতি দৈনিক ১ থেকে ২ টি পাতা

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতি টবে/ড্রামে/গর্তে
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৩০০ গ্রাম
এমপি	২০০ গ্রাম

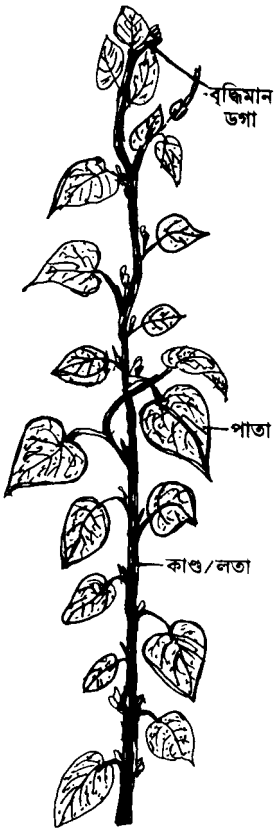

চিত্র ৪৯ : পান গাছ।

পান গাছে সুষমভাবে জৈব ও রাসায়নিক সার না দিলে পান পাতার মান কমে যায়। পাতা ফলন কম হয়। পাতায় দ্রুত পচন ধরে।

চারা রোপণের ১ থেকে ২ মাস পর থেকে প্রতিটি গাছে প্রতি মাসে ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম করে কেবল কমপোস্ট গুঁড়া দিলেই চলে।

রোপণ সময় : বছরের যে কোনো সময় গাছ পানের চারা লাগানো যায়।

ফসল তোলা : নিয়মিত।

পান গাছ থেকে নিয়মিত পাতা তোলা হয় বলে দীর্ঘ সময়ব্যাপী পুষ্টি উপাদানের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। পানের গাছে রাসায়নিক ছাড়াও সরিষার খৈল ব্যবহার করলে পানের ঝাঁঝ বাড়ে ও গুণগত মান বাড়ে।

পরিচর্যা : আগাছা দমন, ফসল সংরক্ষণ ও খুঁটি মেরামত।

পঞ্চম অধ্যায়

শাক-সবজিতে সার প্রয়োগ

শাক-সবজি চাষে সার প্রয়োগের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে শাক-সবজি চাষে অনুমোদিত হারে সার প্রয়োগ করা হয় না। কৃষি কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অনেকে কম-বেশি শাক-সবজি চাষ করে থাকেন।

চিত্র ৫০ : নানা রকম শাক-সবজি

শাক-সবজি বিভিন্ন ধরনের রয়েছে ; যেমন-

শাক ও পাতা সবজি	:	পুঁই শাক, লাল শাক, লাউ, বাটি শাক, চীনা শাক
কাণ্ড	:	ডাটা, কচু
শিকড়	:	মূলা, গাজর
ফল	:	বেগুন, টমাটো, লাউ
ফুল	:	ফুল কপি, মিষ্টি কুমড়া

অনেক শাক-সবজির একাধিক অংশ সবজি হিসেবে পাওয়া যায় যেমন-

লাউ ও কুমড়াজাতীয়	:	ফুল, ফল, পাতা, কাণ্ড
ডাটা, কচু, লাল শাক	:	পাতা ও কাণ্ড।

যেসব ক্ষেত্রে শাক–সবজি চাষের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. যার বাড়ির আঙিনায় কিছু পরিমাণ ফাঁকা জায়গা রয়েছে ;
খ. যার বাড়িতে ফাঁকা ছাদ রয়েছে ;
গ. যিনি বাড়িতে টবে গাছ রাখেন ;
ঘ. যিনি নিয়মিত টাটকা সবজি–ফল খেতে চান ;
ঙ. যিনি বাজারে সবজি ফলে বিষ দ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে সন্দেহে ভোগেন ;
চ. যিনি বাজারের সবজির মান বা স্বাদ কম বলে মনে করেন ;
ছ. যিনি সবজি–ফল চাষে আনন্দ বোধ করেন ;
জ. যার শাক–সবজি ও ফুল–ফল চাষে আগ্রহ ও অভ্যাস রয়েছে ।

১। সাধারণ বিষয়াবলী

শাক–সবজি এবং ফুল ও ফলের জমিতে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের পরিবর্তে বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

পট মিক্সার তৈরি : আজকাল বাড়ির আঙিনায় বা ছাদে পটে বা টবে বা বড় ড্রামে ফুল–ফল এমনকি শাক–সবজির চাষ বাড়ছে। এই পট কালচারের প্রধান ৩টি পদ্ধতি হচ্ছে :

ক. গাছের ধরন অনুসারে পট বা টব অথবা ড্রাম মনোনয়ন ;
খ. পট মিক্সচার তৈরি ও পট পরিপূরণ ;
গ. চারা রোপণ ও পরিচর্যা।

পট মিক্সার তৈরির প্রধান পদ্ধতিগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো।

ক. দো–আঁশ মাটি সংগ্রহ, শুকনো ও গুঁড়া করে চেলে নেওয়া (০.৫ থেকে ১ সেমি. চালুনি ব্যবহার করা যায়)।

খ. অর্ধেক পরিমাণ মাটি এবং অর্ধেক পরিমাণ পচা গোবর অথবা ১০ কেজি মাটিতে ৫০০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া মিশানো।

গ. পটের তলায় ৩ থেকে ৫ সেমি. স্তরে ইটের খোয়া দিয়ে তার উপর পট মিক্সার ভর্তি করা।

ঘ. পটে পানি দিয়ে ১ থেকে ২ সপ্তাহ রেখে দেওয়া, তারপর চারা রোপণ।

এখানে উল্লেখ্য, পট মিক্সারে কমপোস্ট গুঁড়া ব্যবহার করলে তাতে রাসায়নিক সার দেয়ার দরকার নেই। তবে গোবর ব্যবহার করলে তাতে নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক সার দিতে হয়। পটে বা টবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হয়।

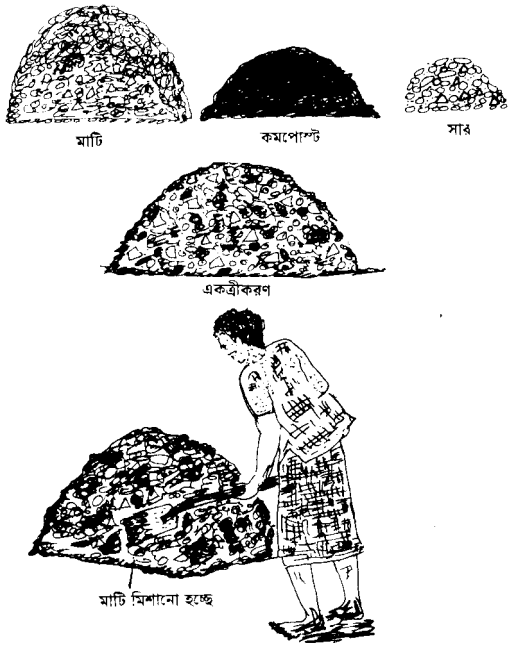

চিত্র ৫১ : পটমিশ্রণ তৈরি।

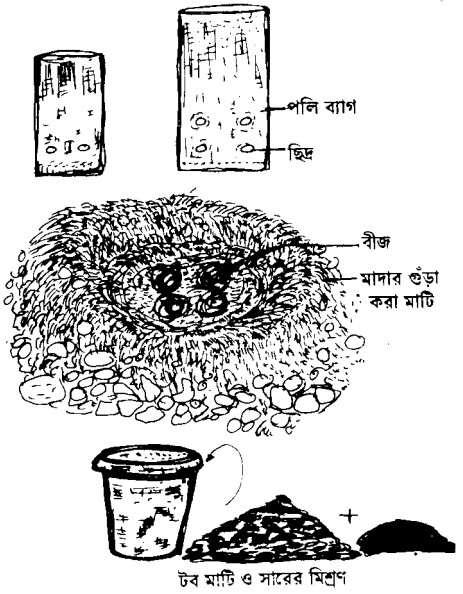

চিত্র ৫২ : পলিব্যাগ, সাদা ও টবে বীজ বপন।

২। শাক-সবজিতে সার প্রয়োগ

পুঁই শাক ও লাউ-কুমড়ায় সার প্রয়োগ

জাত : পুঁই শাক সবুজ ও লাল ;

লাউ-কুমড়া : আগাম দেশি লাউ ও মিষ্টি কুমড়া ;

ফলন : ১৫০ থেকে ১৮০ কেজি প্রতি শতকে বা ৫-৭ কেজি/গাছ

সারের পরিমাণ	সারের পরিমাণ/শতক	প্রতি গাছে
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম	৭৫ গ্রাম
ইউরিয়া	৫৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম
টিএসপি	২৫০ গ্রাম	৯ গ্রাম
এম পি	৩০০ গ্রাম	১১ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম	৯ গ্রাম

প্রতি শতক জমিতে গাছের সংখ্যা ২৭টি।

জমি প্রস্তুতের সময় সার প্রয়োগ করতে হয়। কেবল ইউরিয়া দু'ভাগ করে প্রথম ভাগ জমি প্রস্তুতের সময় এবং দ্বিতীয় ভাগ বীজ/চারা রোপণের ৩০ থেকে ৪০ দিন পর ব্যবহার করতে হয়।

পরবর্তীকালেও ফসলের অবস্থা ভাল থাকলে প্রতি শতকে আরও ৪০০ গ্রাম বা প্রতি গাছে ১৫ গ্রাম ইউরিয়া ব্যবহার করা যায়। তবে চারা গজানোর পর প্রতি গাছে ১৫ দিন পর পর ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার দরকার হয় না।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ১৫০ সে মি.

গাছ থেকে গাছ ১০০ সে মি.

রোপণ সময় : পুঁই শাক – যে কোনো সময় লাগানো যায়, তবে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফলন বেশি।

দেশী লাউ : জুলাই মাস থেকে শুরু করে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বীজ রোপণ।

মিষ্টি কুমড়া : অক্টোবর মাস থেকে শুরু করে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বীজ রোপণ করা যায়।

চিত্র ৫৩ : পুঁই শাক।

পুঁই শাকের প্রকৃত ফলন হচ্ছে এর পাতা ও কচি ডগা যা অনেকাংশে প্রয়োগকৃত সারের পরিমাণ ও সুষমতার উপর নির্ভরশীল।

লাল শাক, ডাঁটা শাক, পালং শাক ও পাট শাকে সার প্রয়োগ

জাত : লাল শাক – আলতাপাটি + বারি লাল শাক–১, ডাটা–কাটোয়া, বাঁশ পাতা, সুরেশ্বরী, দেশী পালং শাক : সেভয় ও দেশী।

ফলন : প্রতি শতকে ৮০ কেজি।

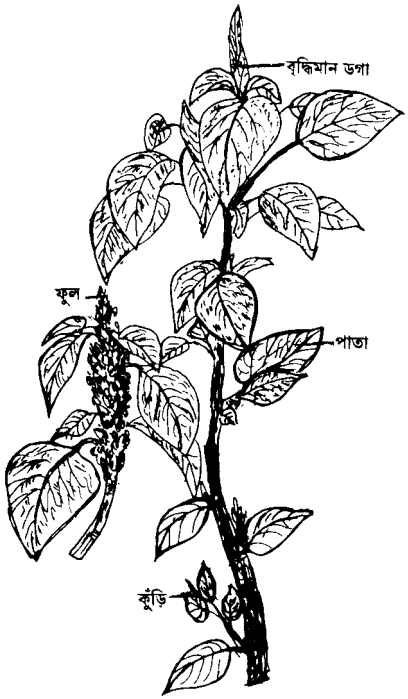

চিত্র ৫৪ : ডাঁটা শাক।

ডাটা শাকে গাছের চাহিদামতো সুষম সার না দিলে গাছে অল্প সময়ের মধ্যে ফুল এসে যায়। এজন্য শাক-সবজিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয় এবং এর কিস্তি প্রয়োগ করতে হয়।

চিত্র ৫৫ : পালং শাক।

পালং শাক স্বল্প মেয়াদি ফসল। মাটি থেকে পুষ্টি দ্রব্য পরিশোষণের জন্য কার্যকর শিকড় গভীরতা কম। তাই সহজপ্রাপ্য সার এমনভাবে প্রয়োগ করতে হয় যাতে গাছ তা সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করতে পারে। জমি প্রস্তুত করার সময়ই অধিকাংশ সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৭০০ গ্রাম
টিএসপি	৩৫০ গ্রাম
এম পি	২০০ গ্রাম
জিপসাম	১২০ গ্রাম

অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ৩০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : ছিটিয়ে বা সারিতে বপন সারি থেকে সারি ৩০ সেমি. গাছ থেকে গাছ ৬ সেমি.

বীজের হার : প্রতি শতকে ৪ থেকে ৫ গ্রাম।

রোপণ সময় : লাল শাক : বছরের যে কোনো সময় বীজ বপন করা যায়।

ডাঁটা শাক : নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস। জাতভেদে অন্যান্য সময়ও রোপণ করা যায়।

পালং শাক : আগস্ট থেকে ডিসেম্বর।

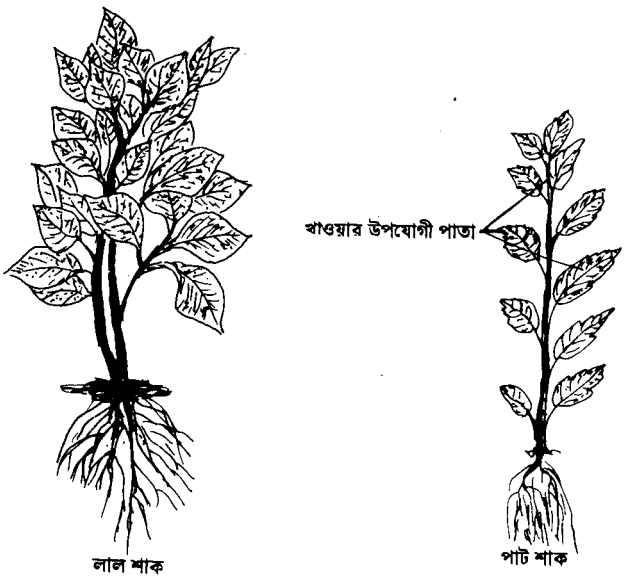

চিত্র ৫৬ : লাল শাক ও পাট শাক।

লাল শাক স্বল্প ও পাট শাক স্বল্প মেয়াদি ফসল। এসব শাকে সুষম সার না দিলে শাক হিসেবে এর মান কমে যায়। এসব শাকের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রচুর নাইট্রোজেন দরকার, আবার নাইট্রোজেন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে গাছ নেতিয়ে পড়ে যায়, শাকের স্বাদ কমে যায়। পরিমিত জৈব সার দিলে শাকের গুণগত মান ভাল হয়।

চীনা শাক ও বাটি শাকে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৭০০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এম পি	৩০০ গ্রাম
জিপসাম	৩০০ গ্রাম

অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া চারা রোপণের ৩০ থেকে ৩৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

চিত্র ৫৭ : বাটি শাক।

বাটি শাক আমাদের দেশীয় শাক নয়। বিদেশ থেকে আনা অত্যন্ত সুস্বাদু শাক। তবে এই শাকের স্বাদ ঠিক রাখতে হলে জমিতে জৈব সারসহ সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়। জমিতে পটাশ ও নাইট্রোজেন সারের অভাবে এই শাকের ফলন কমে যায়। নাইট্রোজেন সার কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। বাটি শাকের ফলন বাড়ানোর জন্য ও গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য জিপসাম সার ব্যবহার করতে হয়।

চিত্র ৫৮ : কলমী শাক।

কলমী শাকের ফলন হচ্ছে এর পাতা। ঘন ঘন পাতা তুলতে হলে কয়েক কিস্তিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করতে হয়। কলমী শাকের নাইট্রোজেন চাহিদা বেশি

জাত : সব জাত
ফলন : ১৫০ থেকে ১৮০ কেজি (প্রতি শতকে)
রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৬০ সেমি
গাছ থেকে গাছ ৫০ সেমি.
(প্রতি শতকে ১৩৪ টি গাছ)
রোপণ সময় : অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর।

কলমী শাকে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৯০০ গ্রাম
টিএসপি	৩৫০ গ্রাম
এমপি	২৭০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ গ্রাম

ইউরিয়া সার ৪ ভাগ করে প্রথম ভাগ জমি প্রস্তুতের সময় এবং পরে প্রতি বার শাক কাটার পর পর প্রয়োগ করতে হয়। অন্যান্য সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : ক্যাংকং বা গিমা কলমী
ফলন : ১৬০ থেকে ২০০ কেজি প্রতি শতকে (৪০ বর্গমিটার)
বা ৪ থেকে ৫ কেজি প্রতি বর্গ মিটারে
রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৩০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ১৫ সেমি.
রোপণ সময় : বছরের যে কোনো সময় বীজ রোপণ বা কাটিং রোপণ করা যায় তবে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফলন বেশি হয়।
ফসল তোলা : এক মৌসুমে ৩ থেকে ৪টি কাটিং।
পরিচর্যা : কিস্তি সার প্রয়োগ, আগাছা দমন ও সেচ।

লেটুস, পেঁয়াজ ও গাজরে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৭০০ গ্রাম
টিএসপি	৩৫০ গ্রাম
এমপি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	৩৫০ গ্রাম

ইউরিয়া সার ২ ভাগ করে ১ ভাগ জমি প্রস্তুতের সময় এবং দ্বিতীয় ভাগ বীজ বপনের ২০ থেকে ২৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়। অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

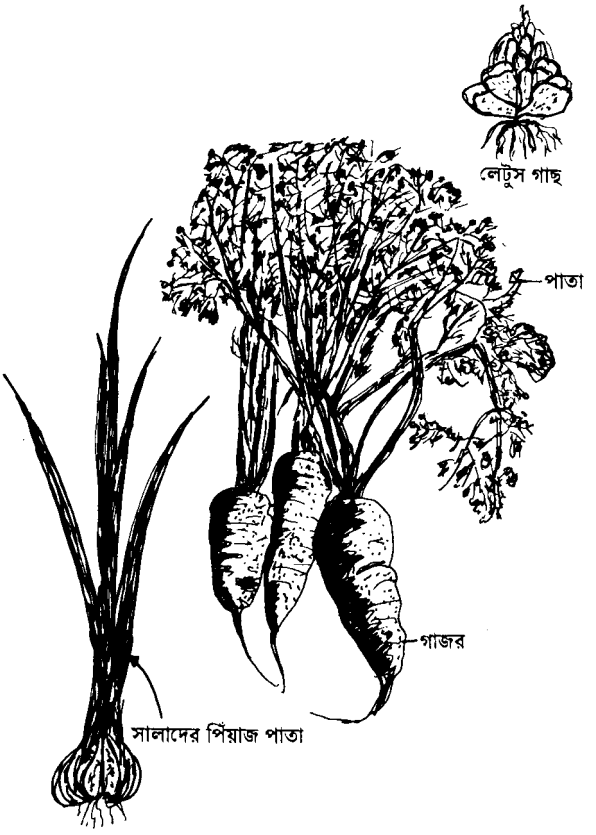

চিত্র ৫৯ : গাজর, লেটুস ও পেঁয়াজ

সালাদের জন্য জন্মানো লেটুস, গাজর ও পেঁয়াজের জন্য জমিতে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন ও জিপসাম দিতে হয়।

জাত	:	সব জাত
ফলন	:	১০০ থেকে ১৩০ কেজি (প্রতি শতকে)
		সারের পরিমাণ (প্রতি শতকে)
রোপণ দূরত্ব	:	সারি থেকে সারি ২৫ সেমি.
		গাছ থেকে গাছ ৬ সেমি.

রোপণ সময় : আগস্ট থেকে ডিসেম্বর
ফসল তোলা : নভেম্বর থেকে এপ্রিল
পরিচর্যা : আগাছা দমন, সেচ ও মাটি নরম রাখা।

গাজরের গাছ ঘন হয়ে গেলে ছোট ছোট গাজর তুলে খাওয়া যায় বা বাজারে বিক্রি করা যায়। এতে অন্যান্য গাজর আরও বড় হওয়ার সুযোগ পায়।

মূলার জমিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১১০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০০ গ্রাম
এমপি	৬৫০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০ গ্রাম

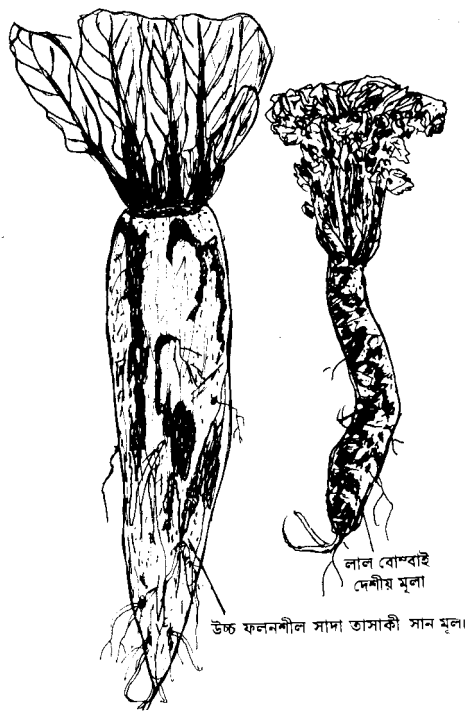

চিত্র ৬০ : মূলা।

মূলার উচ্চ ফলন প্রাপ্তির জন্য নাইট্রোজেন ও পটাশ সারসহ সুষম সার দিতে হয়। জিপসাম সার দিলে মূলার ফলন ভাল হয়।

ইউরিয়া ব্যতীত সব সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং ইউরিয়া সার তিন ভাগ করে বীজ বপনের ২০ দিন, ৩৫ দিন এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়। জমিতে সুযোগমতো ছাই দিতে হয়।

জাত : তাসাকি সান পিংকি, বারি মূলা–২, মিয়া সিগে, মিনো আর্লি, লাল বোম্বাই

ফলন : প্রতি শতকে ৩০০ থেকে ৩৩০ কেজি

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৫০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ২৫ সেমি.

বীজ হার : প্রতি শতকে ২০ গ্রাম

রোপণ সময় : সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

ফসল তোলা : অক্টোবর থেকে মার্চ। তাসাকি সান মূলা ডিসেম্বর পর্যন্ত বপন করে এপ্রিল পর্যন্ত তোলা যায়।

পরিচর্যা : আগাছা দমন, উপরি সারপ্রয়োগ, শাক গাছ তোলা, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

ফুলকপি, ব্রোকোলি

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১০০০ গ্রাম
টিএসপি	৭০০ গ্রাম
এমপি	৬০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম
সোডিয়াম মলিবডেট	২.৫ গ্রাম

অর্ধেক ইউরিয়াসহ সব সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া চারা রোপণের ৩০ দিন ও ৫০ দিন পর দু'বারে প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : সব জাত

ফলন : প্রতি শতকে ১৫০ থেকে ২০০ কেজি

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৭০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ৫০ সেমি.

রোপণ সময় : সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর। তবে বাঁধাকপি জাতভেদে জানুয়ারি পর্যন্ত রোপণ করা যায়।

ফসল তোলা : নভেম্বর থেকে মার্চ

পরিচর্যা : আগাছা দমন, সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, রোগ ও পোকা-মাকড় দমন।

চিত্র ৬১ : ফুলকপি।

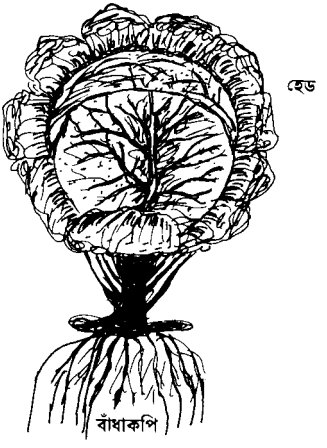

চিত্র ৬২ : বাঁধাকপি।

বাঁধাকপি

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১২০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০০ গ্রাম
এমপি	৬৫০ গ্রাম
জিপসাম	৫০০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম
সোডিয়াম মলিবডেট	২.৫ গ্রাম

অর্ধেক ইউরিয়াসহ সব সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া চারা রোপণের ৩০ দিন ও ৫০ দিন পর দু'বারে প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : কে কে ক্রস, এটলাস-৭০, প্রভাতি, ড্রামহেড

ফলন : ৩৬৫ থেকে ৪০০ কেজি / শতক

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৭৫ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ৬০ সেমি.

রোপণ সময় : সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস।

ফসল তোলা : নভেম্বর থেকে মার্চ
পরিচর্যা : আগাছা দমন, সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, রোগ ও পোকা-মাকড় দমন।

লাউ, চাল কুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, শসা, স্কোয়াশ, ক্ষিরাতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গ্রাম
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৫০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম

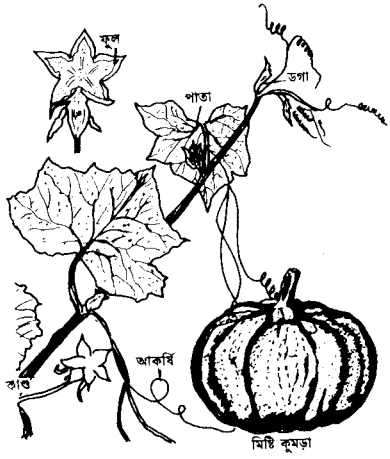

চিত্র ৬৩ : মিষ্টি কুমড়া।
জমিতে মিষ্টি কুমড়ার বীজ রোপণের পূর্বে জৈব ও রাসায়নিক সার মাদায় মিশিয়ে নিতে হয়। পরবর্তীকালে ইউরিয়া কিস্তিতে প্রয়োগ করা যায়।

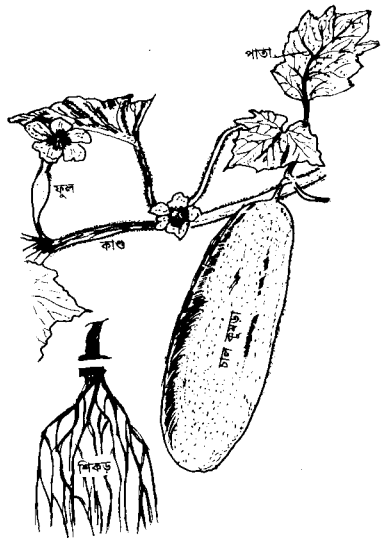

চিত্র ৬৪ : চাল কুমড়া।
চালকুমড়া গাছে ফলন বৃদ্ধির জন্য গাছে প্রচুর পটাশ দিতে হয়। বীজ রোপণের মাদায় মৌলিক সার হিসেবে সুষম সার দিতে হয়।

ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় রোপণ গর্তে এবং ইউরিয়া ৩ ভাগ করে বীজ/চারা রোপণের ২৫ দিন ও ৬০ দিন পর ৩ বারে প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : সব জাত
ফলন : ৩০০ কেজি প্রতি শতকে
রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৩০০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ১০০ সেমি.
প্রতি শতকে ১৪টি গাছ।
রোপণ সময় : লাউ আগস্ট থেকে অক্টোবর
চাল কুমড়া, শসা, ক্ষিরা, মার্চ থেকে মে
মিষ্টি কুমড়া ও স্কোয়াশ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি
ফসল তোলা : চারা বা বীজ রোপণের ২ থেকে ৩ মাস পর থেকে ৫ মাস পর্যন্ত।

শিম, বরবটি, মটরশুঁটিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ /শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	৩০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১২০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমপি	৩০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম

সব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : সব জাত
ফলন : ৪৫ থেকে ৮০ কেজি (প্রতি শতকে)
রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ১৫০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ১০০ সেমি.
মটর শুঁটি- ৭০ সেমি×২০ সেমি.
রোপণ সময় : জুলাই থেকে নভেম্বর।
ফসল তোলা : বীজ বপন বা চারা রোপণের দুই থেকে আড়াই মাস পর
পরিচর্যা : আগাছা দমন, মালচিং, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

শিম গাছে লোহা বা ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে নির্দিষ্ট সার স্প্রে করতে হয়।

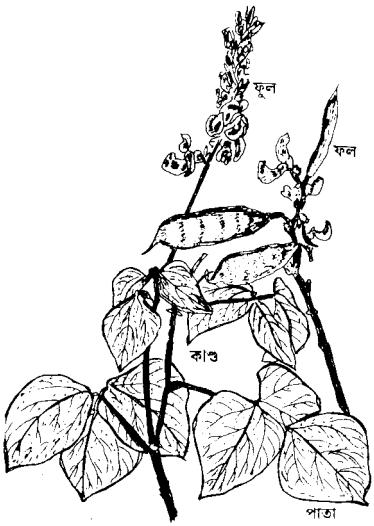

চিত্র ৬৫ : শিম।

শিমগাছ লিগ্যুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর শিকড়ে নাইট্রোজেন গুটি উৎপাদিত হয়। এজন্য এর নাইট্রোজেন সারের চাহিদা কম। কিন্তু শিম মাটি থেকে অন্যান্য পুষ্টি প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করে। শিম গাছের পাতায় লোহা ম্যাঙ্গানিজ ও ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে হলদে জালিকা বা ভাইরাস রোগের লক্ষণের মতো দেখায়। তাই এসব উপাদানের ঘাটতি দেখা দিলে গাছে নির্দিষ্ট সার স্প্রে করতে হয়। শিম গাছে আগাম ফুল ও ফল ধরাতে হলে সুষম হারে ফসফেট সার প্রয়োগ করতে হয়।

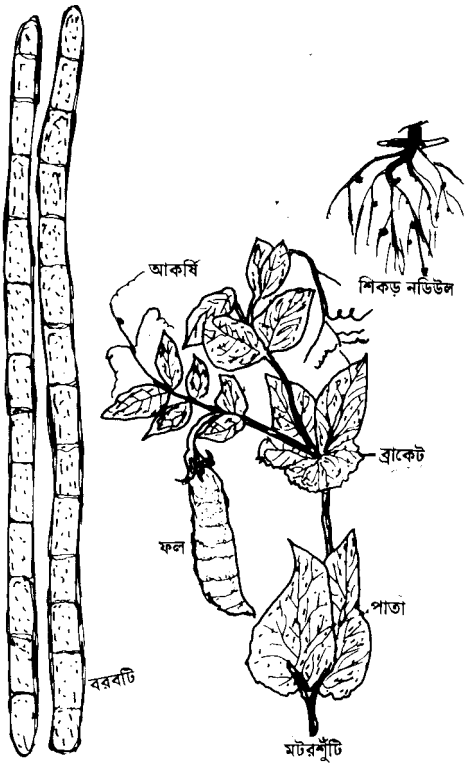

চিত্র ৬৬ : বরবটি ও মটরশুঁটি।

বরবটি ও মটরশুঁটি লিগ্যুম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত গাছ। এজন্য এদের জমিতে নাইট্রোজেন চাহিদা কম। কিন্তু প্রচুর ফসফেট, পটাশ ও গৌণ উপাদান সার দিতে হয়।

করলা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল ও কাকরোলে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমেপাস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৬০০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমপি	৫০০ গ্রাম
জিপসাম	৩০০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম
দস্তা সার	৪০ গ্রাম

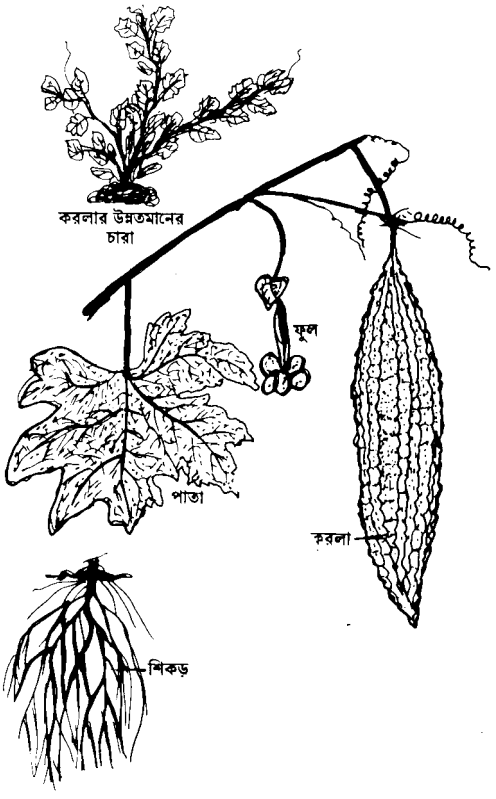

চিত্র ৬৭ : করলা।

করলার উচ্চ ফলন পেতে হলে মাদায় জৈব সারসহ সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়।

ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় (রোপণ গর্ত) এবং ইউরিয়া ৩ ভাগ করে বীজ/চারা রোপণের ৩০ দিন ৪৫ দিন ও ৭০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : সব জাত

ফলন : গাছ প্রতি ২৫০ কেজি

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ২০০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ১৫০ সেমি.
(প্রতি শতকে ১৪টি গাছ)

রোপণ সময় : ফেব্রুয়ারি থেকে জমির উচ্চতাভেদে জুন মাস পর্যন্ত বীজ বা চারা রোপণ করা যায়।

ফসল তোলা : চারা রোপণ বা বীজ রোপণের ২ থেকে ৩ মাস পর নিয়মিতভাবে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

পরিচর্যা : ঝাড় দেওয়া, আগাছা দমন, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

চিত্র ৬৮ : ঝিঙ্গা।

ঝিঙ্গা বীজ রোপণের মাদায় সুষম সার না দিলে উচ্চ ফলন আশা করা যায় না। অন্যান্য সারের তুলনায় নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে ঝিঙ্গার স্বাদ ও গুণগত মান বিনষ্ট হয়।

চিত্র ৬৯ : চিচিঙ্গা।

চিচিঙ্গা গাছের মাদায় নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সার সুষম হারে না দিলে ফুল ও ফল উৎপাদন বিলম্বিত হয়।

ঢেঁড়শ ও চুকাইয়ে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৬৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৩০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম
সোডিয়াম মলিবডেট	২.৫ গ্রাম

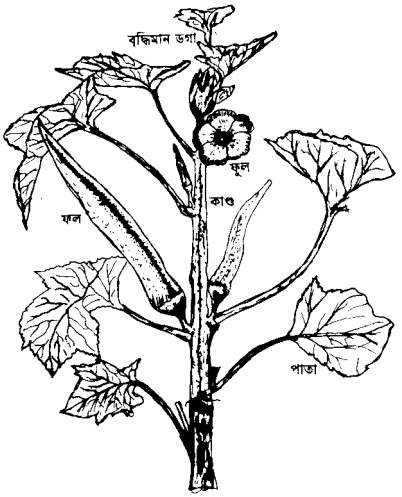

চিত্র ৭০ : ঢেঁড়শ।

ঢেঁড়শ গাছে ম্যাগনেশিয়াম ও অন্যান্য গৌণ পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পড়লে ভাইরাস রোগের আক্রমণের অনুরূপ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় সঠিকভাবে ঘাটতি লক্ষণ সনাক্ত করে নির্দিষ্ট সার প্রয়োগ করতে হয়।

চিত্র ৭১ : চুকাইর বা চুকুর।

চুকাই গাছে চারা অবস্থায় সুষম সার দিলে বড় বড় পাতা উৎপাদিত হয়। এসব পাতা টক সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। চুকাইয়ের ফল তোলা শুরু করার পর পুনরায় নাইট্রোজেন কিস্তি প্রয়োগ করতে হয়।

অধিক ইউরিয়াসহ অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং অন্যান্য সার বীজ বপনের ৩০ দিন ও ৫০ দিন পর ২ বারে প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : সকল জাত

ফলন : প্রতি শতকে ৫০ কেজি

বীজ হার : ১৫ থেকে ২০ গ্রাম

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৭০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ৩০ সেমি

রোপণ সময় : সারা বছরই রোপণ করা যায় তবে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফলন বেশি।

ফসল তোলা : বীজ বপনের দেড়-দুই মাস পর। তবে চারা কিছুটা বড় হওয়ার পর থেকে চুকাই পাতা তোলা যায়।

পরিচর্যা : আগাছা দমন, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

টমেটো গাছে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	৩০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১০০০ গ্রাম
টিএসপি	৭৫০ গ্রাম
এমপি	৮৫০ গ্রাম
জিপসাম	৫০০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম
সোডিয়াম মলিবডেট	২.৫ গ্রাম

অর্ধেক ইউরিয়া এবং সব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সার চারা রোপণের ৪০ এবং ৬৫ দিন পর ২ বারে প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : মানিক, রতন, বাহার, পরি টমেটো-২, বারি টমেটো -৩

ফলন : ২৭০ থেকে ৩২০ কেজি/ শতক

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৫০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ৩৫ সেমি.

রোপণ সময় : সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর, ফেব্রুয়ারি (গ্রীষ্মকালীন) মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

ফসল তোলা : নভেম্বর থেকে এপ্রিল

পরিচর্যা : আগাছা দমন, গাছ বেঁধে দেওয়া, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

চিত্র ৭২ : টমেটো।

টমেটো গাছের জন্য পটাশ সার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জমিতে ঠিকমত পটাশ সার দিলে পাতায় দাগ হয় না, ফলের পচন রোগ কম হয় এবং ফল ফোটে যায় না। টমেটো জমিতে মলিবডেনাম ও বোরন সার দিলে ফলের মান উন্নত হয়। ফলের বর্ণ খুবই উজ্জ্বল হয়।

চিত্র ৭৩ : বেগুন।

বেগুনে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার সুষম হারে দিলে রোগ ও পোকামাকড় কিছুটা নিয়ন্ত্রিত থাকে। ফলনও বেশি হয়। উত্তরা জাতের ফলন বেশি বলে ইসলামপুরী ও শিংনাথ বেগুনের চেয়ে সারের পরিমাণ বেশি দিতে হয়।

বেগুন গাছে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	৩০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১২০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০০ গ্রাম
এমপি	৮০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০ গ্রাম

অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি ইউরিয়া ২ ভাগ করে চারা রোপণের ৫০ দিন এবং ৭৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : উফশী উত্তরা, শুকতারা, তারাপুরী, সুফলা।

অন্যান্য জাত : শিংনাথ, ঝুমকো, বটবটিয়া, মি. চৌধুরী, তাল বেগুন, বালিশ, বারোমানি, চল্লিশা

ফলন : ২৪০ থেকে ২৭০ কেজি/শতক

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৮০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ৫০ সেমি.

রোপণ সময় : প্রধান মৌসুম– অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। খরিপ মৌসুমের জাতের বেগুন জমিতে বা টবে চাষ করলে কেবল কমপোস্ট গুঁড়া সার (গাছ প্রতি সপ্তাহে ৫০ গ্রাম) ব্যবহার করলেই চলে।

উল্লেখ্যযে, বারোমাসি বেগুন, ডিম বেগুন এবং অন্যান্য দেশীয় জাতের বেগুন মার্চ মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

ফসল তোলা : চারা রোপণের দুই আড়াই মাস পর থেকে বেগুন তোলা শুরু হয়।

পরিচর্যা : আগাছা দমন, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

মানকচু ও ওল কচু গাছে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	১৩৫০ গ্রাম
ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম
টিএসপি	৩৭০ গ্রাম
এমপি	৩৫০ গ্রাম
জিপসাম	৩০০ গ্রাম

চারা রোপণের পর একই পরিমাণ সার অক্টোবর ও মার্চ মাসে দু'বার দিতে হয়।

জাত : সব জাত

ফলন : প্রতি শতকে ১৫০ থেকে ২৫০ কেজি

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ১.৫০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ১০০ সেমি.
(প্রতি শতকে ২৭টি গাছ)

চারা রোপণ সময় : জুন থেকে জুলাই

ফসল তোলা : চারা রোপণের দুই থেকে আড়াই মাস পর।

পরিচর্যা : আগাছা দমন, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

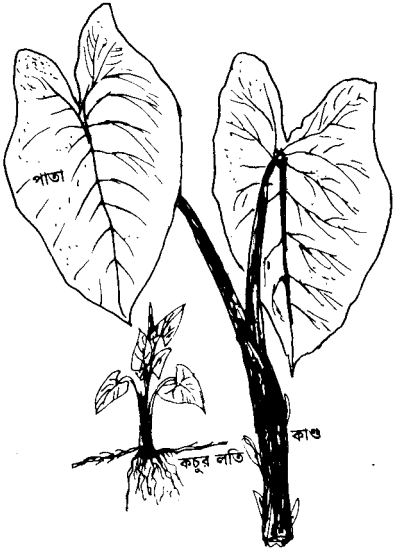

চিত্র ৭৪ : মানকচু।

বিভিন্নজাতের কচু যেমন মানকচু, ওলকচু, পানিকচু, মুখীকচু, পঞ্চমুখীকচু প্রভৃতিতে ফলন অনুসারে সারের পরিমাণেও পাথর্ক্য হয়। তবে সকল ক্ষেত্রেই উচ্চ ফলন পেতে হলে পর্যাপ্ত সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়। নাইট্রোজেন সার কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভাল।

পেঁয়াজ গাছে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৬৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	৫০০ গ্রাম
জিপসাম	৪৫০ গ্রাম

ইউরিয়ার অর্ধেক এবং অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি ইউরিয়া দু'ভাগ করে বীজ বপন/চারা রোপণের ২৫ দিন এবং ৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : বারি পেঁয়াজ-১ ফরিদপুরী, তাহিরপুরী, রেড ক্লিওল, বোম্বাই, করাচী, রেড ট্রপিকানা

ফলন : ৫০ থেকে ৭০ কেজি/শতক

বীজ হার : ২০ গ্রাম/শতক

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ২০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ৮ সেমি.

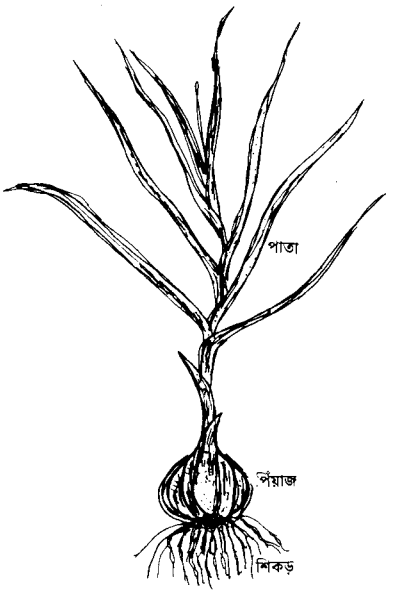

চিত্র ৭৫ : পেঁয়াজ।

পেঁয়াজের উচ্চ ফলনপ্রাপ্তির জন্য পটাশ ও জিপসাম খুব গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৭৬ : রসুন।

রসুনের উচ্চ ফলন প্রাপ্তির জন্য জৈব সারসহ সুষম সার বিশেষ করে গৌণ উপাদানের পুষ্টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঠিকমত পটাশ সার দিলে রসুনের আকার বড় হয়।

রোপণ সময় : সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বীজ বপন বা চারা রোপণ করা যায়।

ফসল তোলা : ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল।

পরিচর্যা : আগাছা দমন, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

উল্লেখ্য, পেঁয়াজে সঠিক পরিমাণে জিপসাম সার প্রয়োগ করলে পেঁয়াজে ফলন বাড়ে, ঝাঁঝ বাড়ে ও গুণগত মান উন্নত হয়।

রসুন

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৬৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমপি	৫০০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম

অর্ধেক ইউরিয়া এবং ও অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ২ বারে বীজ রোপণের ৩০ দিন ও ৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়। জমিতে নিয়মিত ছাই দিতে হয়।

জাত : ছোট, বড় ও এককোষী।
ফলন : প্রতি শতকে ৪০ থেকে ৬০ কেজি।
বীজ হার : ১.৫ কেজি
রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ২৫ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ছোট গাছের ক্ষেত্রে ১০ সেমি. এবং
বড় গাছের ক্ষেত্রে ১৫ সেমি
রোপণ সময় : অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বীজ রোপণ করা যায়।
ফসল তোলা : ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল।
পরিচর্যা : আগাছা দমন, গোড়ায় মাটি দেওয়া, সেচ ও ফসল সংরক্ষণ।

উল্লেখ্য, রসুনের জমিতে সুষমভাবে জিপসাম সার দিলে রসুনের ঝাঁঝ ও গন্ধ বাড়ে, ফলন বেশি হয় এবং এর গুণগত মান বাড়ে। পটাশিয়ামের ঘাটতি হলে রসুন অকালে শুকিয়ে যায়।

মরিচ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৬৫০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমপি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৫০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম

অর্ধেক ইউরিয়াসহ সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি ইউরিয়া চারা রোপণের ৩০ দিন পর এবং ৬০ দিন পর দু'বারে প্রয়োগ করতে হয়।

জাত : দেশীয় সকল জাত

ফলন : প্রতি শতকে কাঁচা ৮০ কেজি

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৭০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ৩ সেমি.

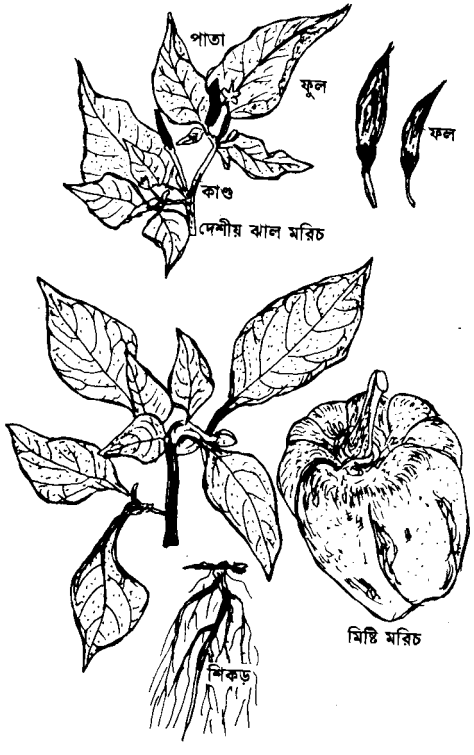

চিত্র ৭৭ : মরিচ।

টবে বা ড্রামে লাগালে বারোমাসী জাতের মরিচ গাছে প্রতি সপ্তাহে কেবল ৫০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া ব্যবহার করলেই চলে।

রোপণ সময় : নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বীজ বপন বা চারা রোপণ করা যায়। বর্ষাকালীন মরিচ মে মাস পর্যন্ত রোপণ করা যায়।

ফসল তোলা : চারা রোপণের দুই থেকে আড়াই মাস পর থেকে ৫ মাস পর্যন্ত।

এখানে উল্লেখ্য মরিচের জমিতে বোরন ও তামার অভাব হলে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, ফুল ঝরে যায় এবং রোগাক্রমণ বেড়ে যায়।

আদা

জাত : দেশী রংপুরী, জামাইকা ও চায়নিজ আদা, টেংগুরা

ফলন : ৭০ থেকে ৯০ কেজি/শতক

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৯০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০০ গ্রাম
এমপি	৫৫০ গ্রাম
জিপসাম	৩৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৪০ গ্রাম

ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং ইউরিয়া ২ ভাগ করে বীজ রোপণের ৪০ দিন ও ৮০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৫০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ২০ সেমি.

বীজ হার : ১৫ কেজি কন্দ।

রোপণ সময় : মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত আদার বীজ রোপণ করা যায়।

ফসল তোলা : ৬ থেকে ৭ মাস পর থেকে ফসল তোলা যায়।

পরিচর্যা : আগাছা দমন করে জাবড়া বা মালচিং দেওয়া, ফসল সংরক্ষণ।

উল্লেখ্য, পরিমিতি পটাশ সার আদার ফলন বাড়ায়।

হলুদ ফসলে সার প্রয়োগ

জাত : পাটনাই সিন্দুরী, ডিমলা, হরিণ নলী, মহিষ বাট, আড়ানী

ফলন : প্রতি শতকে ৫০ থেকে ৭০ কেজি ।

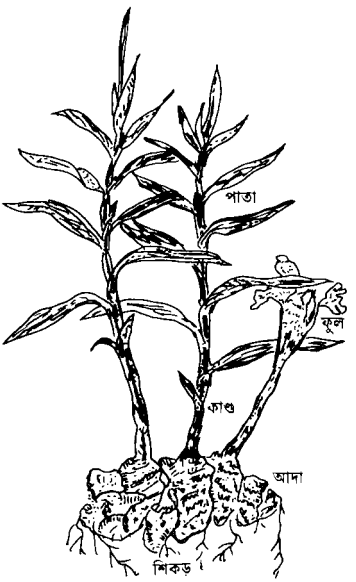

চিত্র ৭৮ : আদা।

আদা একটি দীর্ঘ মেয়াদি ফসল। আদা জমিতে জাবড়া দেওয়ার আগে সমস্ত সার প্রয়োগ করে নিতে হয়। এরপরও কোন সার দেওয়া হলে সার দেওয়ার পর সেচের ব্যবস্থা করতে হয় যাতে প্রয়োগকৃত সার মাটির সাথে মিশে যায়।

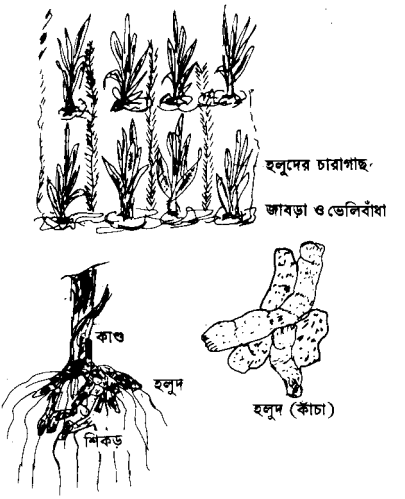

চিত্র ৭৯ : হলুদ।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৬৫০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমপি	৫০০ গ্রাম
জিপসাম	৩৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৪০ গ্রাম

ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং ইউরিয়া ২ ভাগ করে বীজ রোপণের ৩০ দিন এবং ৭০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়। বীজ বপনের পর তা জাবড়া দিয়ে ঢেকে দেয়ার প্রয়োজন হলে সমস্ত সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৫০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ২০ সেমি.

বীজ হার : ১২ কেজি

রোপণ সময় : মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত বীজ রোপণ করা যায়।

ফসল সংগ্রহ : এক থেকে দুই বছর পর্যন্ত ফসল তোলা যায়।

ধনে ফসলে সার প্রয়োগ

জাত : বারি ধনে-১ দেশীয় সাধারণ জাত

ফলন : ছোট গাছ পাতা ১৫০ কেজি এবং বীজ উৎপাদন ১০ কেজি

চিত্র ৮০ : ধনে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৬৫০ গ্রাম
টিএসপি	৪২৫ গ্রাম
এমপি	৩৫০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম
দস্তা সার	৫০ গ্রাম

অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময়ে এবং বাকি ইউরিয়া দু'ভাগ করে বীজ বপনের ২৫ দিন ও ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

বীজ হার : ২০০ গ্রাম

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি দূরত্ব ২০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ দূরত্ব ৫ সেমি.
চারা অবস্থায় গাছ তুলে খাওয়া বা বিক্রি করা যায়।

রোপণ সময় : সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

ফসল তোলা : বীজ বপনের মাসখানেকের মধ্যে সালাদের জন্য ধনিয়া গাছ তোলা যায়। বীজ পাকতে ৩ থেকে ৪ মাস সময় লাগে।

পরিচর্যা : আগাছা দমন, চারা তোলা ও পাতলাকরণ, সেচ, ফসল সংরক্ষণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফল গাছে সার প্রয়োগ

১। ফল গাছে সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা

একটি ফল গাছের চারা অনেক দিন ধরে ফল উৎপাদন করে। তাই রোপণ থেকে শুরু করে ফল উপাদানের পূর্ণ সময় সীমাব্যাপী নিয়মিত সার ব্যবহার করতে হয়। ফল গাছে সার প্রয়োগের ধাপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. চারার রোপণ গর্তে সার প্রয়োগ ;

খ. চারা অবস্থায় সার প্রয়োগ ;

গ. ফল ধরা অবস্থায় সার প্রয়োগ ।

সার প্রয়োগের সুবিধার জন্য ফল গাছের সার সুপারিশের অধিকাংশক্ষেত্রে একক গাছের ভিত্তিতে সারের পরিমাণ নির্ণয় করে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ফল গাছে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফলন প্রাপ্তির জন্য কমপোস্ট গুঁড়া সার ব্যবহারের উপর খুবই গুরুত্ব দিতে হয়।

২। সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি : বিভিন্ন প্রকার ফলগাছে প্রয়োগের জন্য সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের নিয়ম সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

পেয়ারা গাছে সার প্রয়োগ

জাত : কাজী পেয়ারা, পলি পেয়ারা, থাই পেয়ারা, সরুপকাটি কাঞ্চননগর, মুকুন্দপুরী

ফলন : প্রতি গাছে ৫ থেকে ২০ কেজি

সারের পরিমাণ : গর্তে বা টবে

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত/টব
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১৭০ গ্রাম
টিএসপি	১৪০ গ্রাম
এমপি	১৩০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ গ্রাম

চারা রোপণের ২ থেকে ৩ মাস পর ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং তারপর প্রতি মাসে ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম করে কেবল কমপোস্ট গুঁড়া দিতে হয়।

গাছে ফুল আসার পর নিম্নরূপ সার দিতে হয় (২ মাস পরপর)

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গাছ/দুই মাস
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪০ গ্রাম
টি এস পি	২০ গ্রাম
এমপি	২০ গ্রাম

রোপণ দূরত্ব : বড় ড্রাম অথবা সারি থেকে সারি ও গাছ থেকে গাছ ২ মিটার।
রোপণ সময় : মার্চ–এপ্রিল বা আগস্ট–সেপ্টেম্বর।

চিত্র ৮১ : পেয়ারা।

বীজের চারা বা কলমের চারার প্রাথমিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য, গাছের কাঠামো শক্ত করার জন্য এবং দ্রুত ফুল ও ফল ধরানোর জন্য পেয়ারা গাছে জৈব সারসহ সুষম সার দিতে হয়।

পেঁপে গাছে সার প্রয়োগ

জাত : রাঁচি ব্লুস্টেম, নউন ইউ – ১, নউন ইউ – ২।

ফলন : গাছ প্রতি ৪০ কেজি

সারের পরিমাণ (গর্তে/ড্রামে)

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত/টব
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
টি এস পি	১০০ গ্রাম
এমপি	১০০ গ্রাম

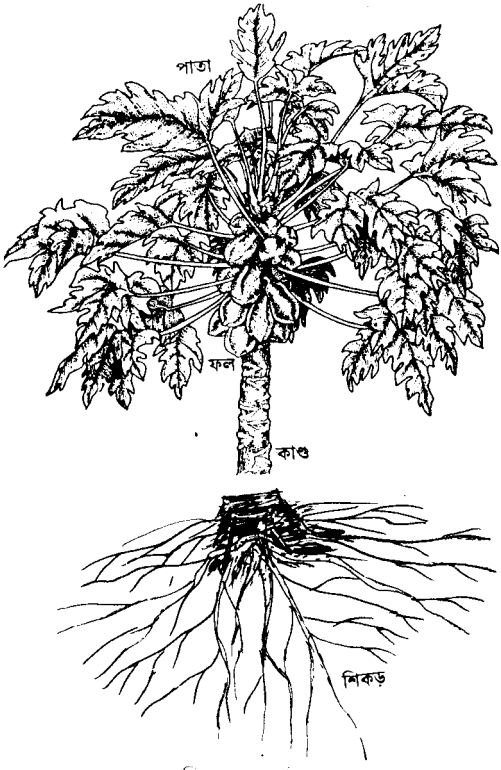

চিত্র ৮২ : পেঁপে।

পেঁপে গাছের রোপণ গর্তে এবং বয়সভেদে পরিমিত সুষম সার না দিলে ভাল ফলন হয় না। পেঁপে গাছের শিকড় তুলনামূলকভাবে কম গভীর বলে ঘন ঘন কিস্তিতে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হয়। পেঁপে গাছের জন্য পটাশ ও গৌণ পুষ্টি উপাদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সার প্রয়োগের ২ সপ্তাহ পর চারা লাগাতে হয়। চারা রোপণের ২ থেকে ৩ মাস পর ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এমপি সার এবং ২০০ গ্রাম ছাই প্রয়োগ করতে হয়।

গাছে ফুল আসার পর প্রতি মাসে নিম্নরূপ সার দিতে হয়

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গাছ/দুই মাস
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪০ গ্রাম
টিএসপি	২৫ গ্রাম
এমপি	৩০ গ্রাম
বোরাক্স	২০ গ্রাম

রোপণ দূরত্ব : বড় ড্রাম বা সারি থেকে সারি ও গাছ থেকে গাছ ২ মিটার

রোপণ সময় : ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত পেঁপের চারা রোপণ করা যায়।

লেবু, মাল্টা, কমলা, কিনো গাছে সার প্রয়োগ

জাত : লেবু এলাচি, বীজ হীন লেবু, কাগজি লেবুসহ সব জাত

ফল : গাছ প্রতি ৫ থেকে ১০ কেজি।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত/টব
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
টিএসপি	৮০ গ্রাম
এমপি	৫০ গ্রাম

প্রতি মাসে গাছের বয়সভেদে সারের পরিমাণ (গ্রাম) প্রয়োগের জন্য

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)		
	২ বছরের কম	২ থেকে ৫	৫ বছরের বেশি
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০	১৫০	২০০
ইউরিয়া	৩০	৪৫	৫০
টিএসপি	১০	১৫	২০
এমপি	১০	১৫	২০
জিপসাম	৮	১২	১৫

চারা রোপণের ৩ থেকে ৪ মাস পর থেকে সার প্রয়োগ শুরু করতে হয়। কমপোস্ট গুঁড়া সারের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দিলে পরবর্তী রাসায়নিক সার না দিলেও চলে।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ২ মিটার
গাছ থেকে গাছ ২ মিটার

রোপণ সময় : মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। পানি সেচ দিলে অন্য সময়ও চারা লাগানো যায়।

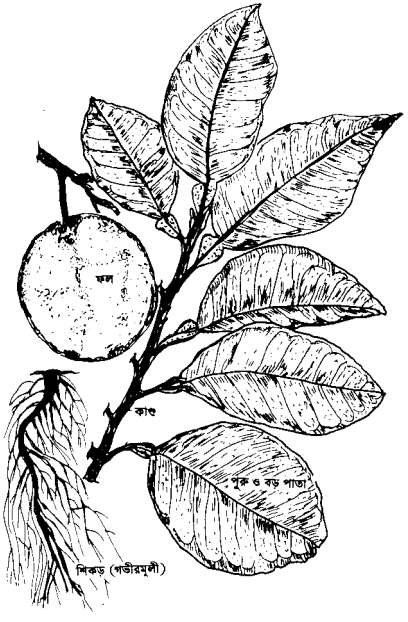

চিত্র ৮৩ : কমলা লেবু।

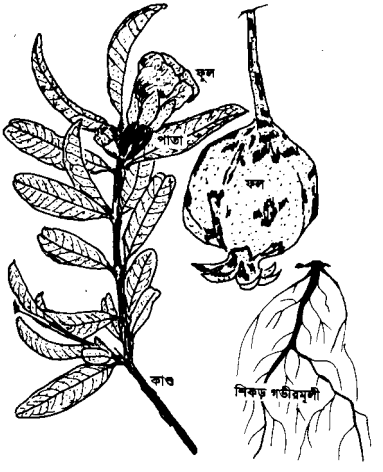

চিত্র ৮৪ : ডালিম।

প্রচুর সংখ্যক ফুল, ফল ধরা এবং ডালিম ফলের ফেটে যাওয়া বন্ধ করার জন্য গাছে সুষমভাবে পটাশ সার দিতে হয়। গর্তে চারা রোপণের পূর্বে এবং পরবর্তীকালে রিঙ পদ্ধতিতে সার দিতে হয়।

ডালিম গাছে সার প্রয়োগ

জাত : দেশী বেদানা

ফলন : ৪ থেকে ৮ কেজি/গাছ/বছর।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত/ড্রাম
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ গ্রাম
এমপি	১০০ গ্রাম
জিপসাম	৭০ গ্রাম

চারা রোপণের ২ থেকে ৩ মাস পর হতে প্রথম বছর বা ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি মাসে প্রতি গাছে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গাছ
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০ গ্রাম
ইউরিয়া	১৫ গ্রাম
টিএসপি	৫ গ্রাম
এমপি	৫ গ্রাম

গাছে ফুল আসার পর বা দ্বিতীয় বছর থেকে প্রতি গাছে প্রতি মাসে নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	২ থেকে ৫ বছর	৫ বছরের বেশি
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০ থেকে ১৫০ গ্রাম	১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১৫ থেকে ৩০ গ্রাম	৩০ থেকে ৪০ গ্রাম
টিএসপি	১০ থেকে ২০ গ্রাম	২০ থেকে ৩০ গ্রাম
এমপি	১০ থেকে ৩০ গ্রাম	৩০ থেকে ৫০ গ্রাম
ছাই	১০০ থেকে ২০০ গ্রাম	২০০ থেকে ৪০০ গ্রাম

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ২০০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ২০০ সেমি.

রোপণ সময় : মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ডালিমের চারা রোপণ করা যায়। তবে পানি সেচ দিলে শুকনা সময়েও চারা লাগানো যায়।

কলা গাছে সার প্রয়োগ

জাত : অমৃতসাগর, মেহেরসাগর, সবরি, স্থানীয় জনপ্রিয় উন্নত জাত।

ফলন : ১৫০ কেজি প্রতি শতকে বা ২০ কেজি/গাছ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত
কমপোস্ট গুঁড়া	৭০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪০০ গ্রাম
টিএসপি	২৫০ গ্রাম
এমপি	৩০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০ গ্রাম
দস্তা সার	৪০ গ্রাম
বোরাক্স	৪০ গ্রাম

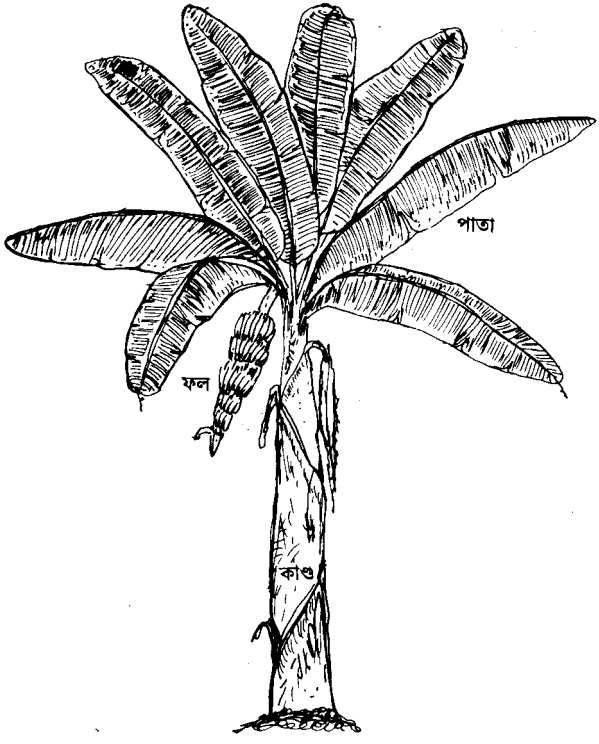

চিত্র ৮৫ : কলা গাছ।

কলার পটাশ চাহিদা খুব বেশি। সেজন্য কলার বাগানে পটাশ সারসমৃদ্ধ সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়।

গর্তে সার প্রয়োগের দু'সপ্তাহ পর চারা রোপণ করতে হয়।

রোপণ পরবর্তী সারের পরিমাণ প্রতি গাছে/বার্ষিক

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪০০ গ্রাম
টিএসপি	২০০ গ্রাম
এমপি	২০০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ গ্রাম

ইউরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সার চারা রোপণের ৩ মাস পর প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সার ৩ ভাগ করে চারা রোপণের ৪ মাস, ৬ মাস এবং ৮ মাস পর প্রয়োগ করতে হয়।

দ্বিতীয় বছর সমপরিমাণ সার বছরে ২ বার সেপ্টেম্বর ও মার্চ মাসে প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ২৭০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ২৭০ সেমি. | শতকে ৫ থেকে ৬ টি গাছ

রোপণ সময় : সেপ্টেম্বর – অক্টোবর বা মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে কলার চারা রোপণ করা যায়।

নারকেল গাছে সার প্রয়োগ

জাত : দেশী, মালয়েশিয়া কিং, ডুয়ার্ফ, থাই ডুয়ার্ফ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম
টিএসপি	৬০ গ্রাম
এমপি	৮০ গ্রাম

গর্তে সার প্রয়োগের দু'সপ্তাহ পর চারা রোপণ করতে হয়।

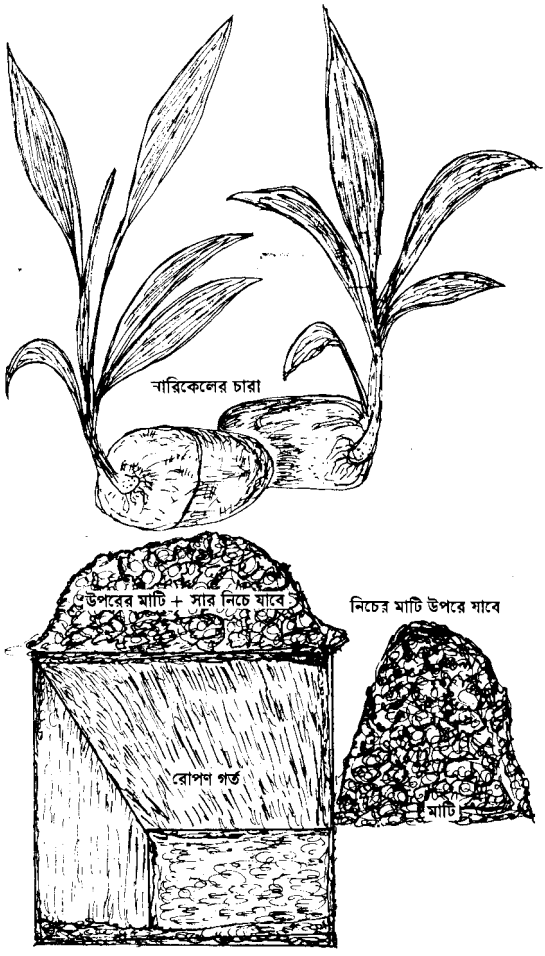

চিত্র ৮৬ : নারকেলের চারা রোপণ ও সার প্রয়োগ।

রোপণ পরবর্তী সার প্রয়োগ

	গাছের বয়সভিত্তিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)		
সারের নাম	১ বছরের কম	১ থেকে ৫ বছর	৫ বছরের বেশি
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০–১০০	১০০–৫০০	৫০০–১০০০
ইউরিয়া	৫০–১০০	১০০–২০০	২০০–৫০০
টিএসপি	৩০–৫০	৫০–২০০	২০০–৪০০
এমপি	৪০–৬০	৬০–২৫০	২৫০–৫০০
জিপসাম	২৫–৪০	৪০–১০০	১০০–২৫০

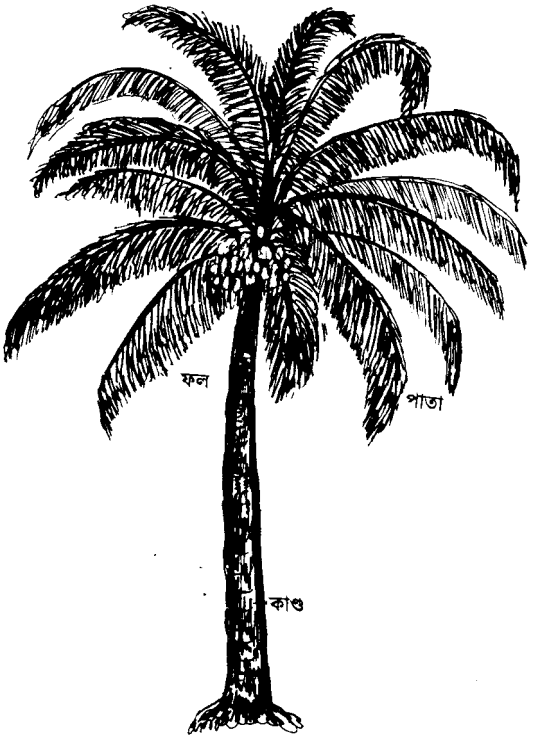

চিত্র ৮৭ : নারকেল গাছ।

(একটি নারকেল গাছে শক্ত কাঠামো ও ন্যূনতম পাতা উৎপাদনের জন্য চারা রোপণ থেকেই সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়।)

এই পরিমাণ সার বছরের ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসে প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : ৫ থেকে ৮ মিটার

রোপণ সময় : জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চারা লাগানো যায়।

আঙুর

জাত : ব্লাক পার্ল, জাককাউ, থাপসন, পুশা।

ফলন : প্রতি শতকে ১০ থেকে ২০ কেজি।
প্রতি গাছে ১ থেকে ২ কেজি

গর্তে সার প্রয়োগ (বা বড় টবে) গর্ত ৬০ × ৬০ × ৬০ সেমি.

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	২০০ গ্রাম
টিএসপি	৩০০ গ্রাম
এমপি	২০০ গ্রাম

গর্তে সার দেওয়ার ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পর চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের ৪০ দিন ও ৮০ দিন পর গাছ প্রতি নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়। কমপোস্ট গুঁড়া ৫০ গ্রাম, ইউরিয়া ১০ গ্রাম, টিএসপি ৫ গ্রাম, এমপি ৫ গ্রাম।

বয়সভেদে প্রতি গাছে সার প্রয়োগ মাত্রা (গ্রাম)

সারের নাম	গাছের বয়স	
	১ থেকে ৩ বছর	৩ বছর বা বেশি
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০–৩০০	৩০০–৪০০
ইউরিয়া	৫০–১০০	১০০–২০০
টিএসপি	১০০–২০০	২০০–৪০০
এমপি	৫০–১০০	১০০–২০০
জিপসাম	৪০–৭০	৭০–১৫০

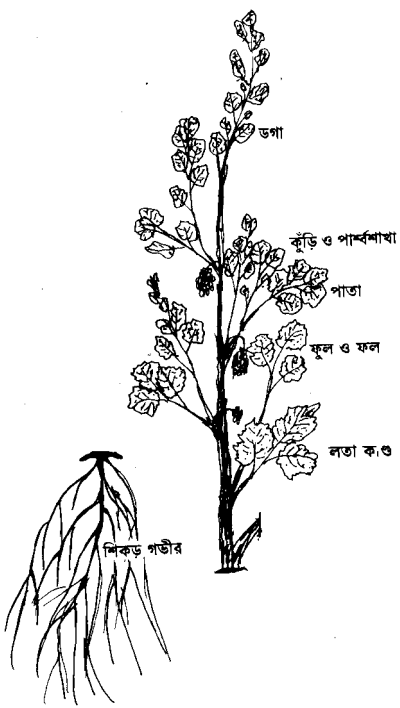

চিত্র ৮৮ : আঙুর লতা।

আঙুর গাছে ফলন পাওয়ার জন্য ও মিষ্টি আঙুর ফলানোর জন্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের সাথে পটাশিয়ামের পরিমাণ, অনুপাত ও সুষমতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

উক্ত সার বছরে ৩ বারে প্রয়োগ করতে হয়। আঙুর গাছের ডগা ছাঁটাইয়ের সময়ের ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ফেব্রুয়ারি ও মে মাসে এই সার প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ২৫০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ১৫০ সেমি.
প্রতি শতকে গাছের সংখ্যা ১০ থেকে ১১ টি

রোপণ সময় : আবহাওয়াভেদে ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

আনারস গাছে সার প্রয়োগ

জাত : হানিকুইন, জায়েন্ট কিউ

ফলন : প্রতি শতকে ১২০ থেকে ১৫০ কেজি

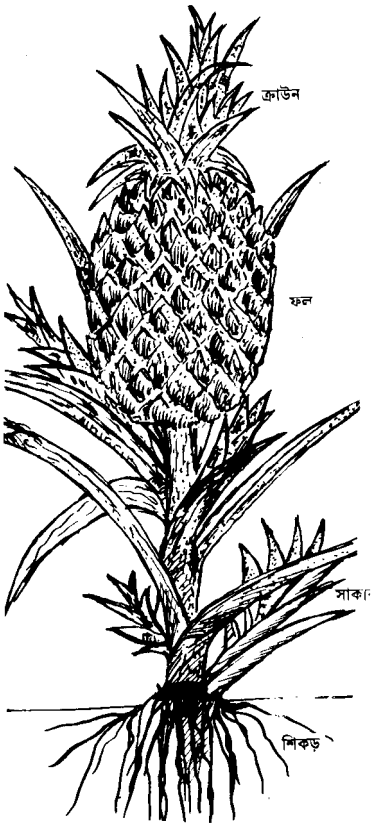

চিত্র ৮৯ : আনারস।

রসালো ও মিষ্টি আনারসের জন্য পটাশসহ সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়। নাইট্রোজেন সার কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। অপুষ্টি লক্ষণ দেখা দিলে আনারসে ম্যাগনেশিয়াম প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (প্রতি শতকে)
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১২০০ গ্রাম
টি এসপি	৫৫০ গ্রাম
এমপি	৫০০ গ্রাম
দস্তা সার	৫০ গ্রাম

ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় রোপণ গর্তে ৩০ × ৩০ × ৩০ সেমি. এবং ইউরিয়া চারা রোপণের ৩০ দিন, ৯০ দিন ও ১৫০ দিন পর ৩ বারে প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৪০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ৪০ সেমি.
চারার সংখ্যা ১২৫ টি

বাড়ির আঙিনায় আনারসের চারা লাগালে সীমানা ঘেঁষে এক সারিতেও লাগানো যায়। এতে আনারস গাছ বেড়া হিসেবেও কাজ করে। তিতা কৃমিনাশক হিসেবে আনারসের টাটকা কচি পাতার রসও পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, আনারসের ফল একবার তোলার পর মুড়ি চাষ করতে হলে গাছ পরিষ্কার করে পুনরায় সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা করতে হয়।

আম ও কাঁঠাল গাছে সার প্রয়োগ : বহুজীবী ফলগাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আম ও কাঁঠাল গাছে চারা অবস্থায় ও পরবর্তীকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থান সার প্রয়োগ করতে হয়। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

আম গাছে সার প্রয়োগ

জাত : লতা, ল্যাংড়া, ফজলী, বোম্বাই, গোপালভোগ আম্রপালী, (কলম বা বীজ চারা)

গর্তে সার প্রয়োগ (বা বড় ড্রাম)

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০০ গ্রাম
ইউরিয়া	২০০ গ্রাম
টিএসপি	২০০ গ্রাম
এমপি	১০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের দু'সপ্তাহ পর চারা রোপণ করতে হয়।

গাছ প্রতি রোপণ পরবর্তী সার প্রয়োগ

সার	গাছের বয়সভিত্তিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)		
	১ বছরের কম	১ থেকে ৩ বছর	৩ বছরের বেশি
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০–২০০	২০০–৪০০	৪০০–৮০০
ইউরিয়া	১০০–২০০	২০০–৩০০	৩০০–৪০০
টিএসপি	৫০–১০০	১০০–২০০	২০০–৩০০
এমপি	৩০–৫০	৫০–১০০	১০০–২০০
জিপসাম	৪০–৭০	৭০–১২০	১২০–১৫০

উক্ত সার বছরে ৩ বার অক্টোবর, ফ্রেব্রুয়ারি ও জুন মাসে প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : ৬ থেকে ১০ মিটার

রোপণ সময় : মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত আমের চারা লাগানো যায়।

চিত্র ৯০ : আম গাছ।

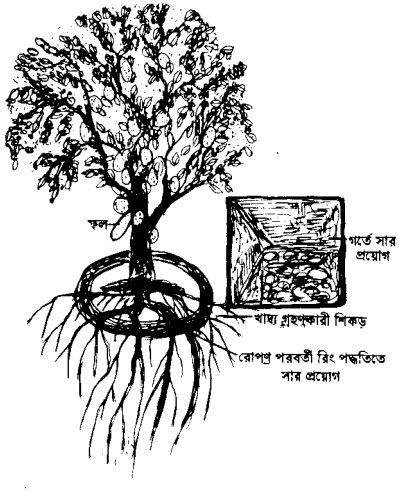

চিত্র ৯১ : কাঁঠাল গাছ।

কাঁঠাল গাছে সার প্রয়োগ

জাত : কোষ নরম ও শক্ত, আগাম, বর্ষাতি ও বারমাসী (কলম বা বীজ চারা)

ফলন : ১০০ থেকে ৩০০ কেজি/গাছ

গর্তে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ গ্রাম
এমপি	১০০ গ্রাম

সার প্রয়োগে দু'সপ্তাহ পর চারা রোপণ করতে হয়।

রোপণ পরবর্তী সার প্রয়োগ

সার	গাছের বয়সভিত্তিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)		
	১ বছরের কম	১ থেকে ৫ বছর	৫ বছরের বেশি
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০ থেকে ২০০	২০০ থেকে ৩০০	৩০০ থেকে ৫০০
ইউরিয়া	৫০ থেকে ১০০	১০০ থেকে ২০০	১০০ থেকে ২০০
টিএসপি	৩০ থেকে ৫০	৫০ থেকে ১০০	১০০ থেকে ২০০
এমপি	৩০ থেকে ৫০	৫০ থেকে ১০০	১০০ থেকে ২০০
জিপসাম	২৫ থেকে ৪০	৪০ থেকে ৬০	৬০ থেকে ১০০

এই সার বছরে ৩ বার অর্থাৎ অক্টোবর, ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসে প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : ৮ থেকে ১২ মিটার

রোপণ সময় : মার্চ থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত কাঁঠালের চারা লাগানো যায়।

সুপারি গাছে সার প্রয়োগ

জাত : দেশী, থাই সুপারি, খুলনা, নারিকেলী

ফলন : প্রতি শতকে ১৫০০ থেকে ৩০০০ টি সুপারি

প্রতিগাছে ১৫০ থেকে ৩০০ টি সুপারি

চিত্র ৯২ : সুপারি গাছ।

সারের পরিমাণ (রোপণ গর্তে) গর্ত ৪০ × ৪০ × ৪০ সেমি.

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	৩০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম
টিএসপি	৩০ গ্রাম
এমপি	৪০ গ্রাম

বয়স্ক গাছে সার প্রয়োগ

সারের নাম	গাছের বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)		
	১ বছরের কম	১ থেকে ৪ বছর	৪ বছরের বেশি
কমপোস্ট গুঁড়া	৪০ থেকে ৬০	৬০ থেকে ১৫০	১৫০ থেকে ৩০০
ইউরিয়া	৩০ থেকে ৫০	৫০ থেকে ১০০	১০০ থেকে ২০০
টিএসপি	১০ থেকে ২০	২০ থেকে ৫০	৫০ থেকে ১০০
এমপি	১০ থেকে ২০	২০ থেকে ৫০	৫০ থেকে ১৫০

প্রতি গাছে এই পরিমাণ সার বছরে সেপ্টেম্বর, ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসে প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি এবং গাছ থেকে গাছ ২০ মিটার
প্রতি শতকে গাছের সংখ্যা ১০টি গাছ।

রোপণ সময় : জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সুপারির চারা লাগানো যায়।

সপ্তম অধ্যায়

ফুল গাছে সার প্রয়োগ

১। ফুল গাছে সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা

ফুল গাছেও অন্যান্য গাছের মতো সার প্রয়োগ করতে হয়। ফুলগাছে সার প্রয়োগের উদ্দেশ্যও প্রয়োগ-সময় জানা আবশ্যক। নিচে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

ফুল গাছে সার প্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য

ক. উজ্জ্বল ফুল উৎপাদন করা ;

খ. বড় আকারের ফুল উৎপাদন করা ;

গ. বেশি সংখ্যক ফুল উৎপাদন করা ;

ঘ. ফুলের সৌরভ বাড়ানো ;

ঙ. ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ানো।

ফুল গাছে সার প্রয়োগের বিভিন্ন সময়

ক. চারা রোপণের সময় গর্তে সার প্রয়োগ করা ;

খ. গাছ বড় হওয়া অবস্থায় মাটিতে সার প্রয়োগ করা ;

গ. গাছ বড় হওয়া অবস্থায় গাছে স্প্রে করা।

এক্ষেত্রে, ফুল গাছে সার প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও সার প্রয়োগের সময় বিবেচনা করে সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষ করে ফুল গাছে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুষমিত কমপোস্ট গুঁড়া সার প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ফুল গাছে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতি গাছে এবং পাশাপাশি বর্গ মিটারে, ৫ বর্গ মিটার বা ১০ বর্গমিটারের ইত্যাদি আয়তন ব্যবহার করা হয়েছে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ের সুবিধার জন্য তা করা হয়েছে।

২। ফুল গাছে প্রয়োগের জন্য সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

বিভিন্ন প্রকার ফুলের গাছে প্রয়োগ পদ্ধতি উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হয়। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফুল গাছে সার প্রয়োগের পদ্ধতিসহ সারের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

গোলাপ

জাত : মধ্যমাকার গাছ হাইব্রিড টি ও পারপিচুয়াল।

গাছ প্রতি সারের পরিমাণ : সাধারণ মাত্রা

রোপণ : গর্তে (গর্ত ৪০ × ৪০× ৪০ সেমি.) বা টবে

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	৩০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম
টিএমপি	১৫০ গ্রাম
এমপি	৮০ গ্রাম
জিপসাম	২৫ গ্রাম

চিত্র ৯৩ : গোলাপ।

(গোলাপ গাছের আকার এবং গোলাপ ফুলের সংখ্যা, আকার ও প্রকারের উপর ভিত্তি করে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়।)

গর্তে সার দেওয়ার দু'সপ্তাহ পর চারা রোপণ করতে হয়। রোপণের পরবর্তী মাস থেকে প্রতি গাছে প্রতি সপ্তাহে ৩০ থেকে ৫০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া ব্যবহার করতে হয়। দ্বিতীয় বছর থেকে প্রতি গাছে প্রতি সপ্তাহে ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া ব্যবহার করতে

হয়। সাথে সাথে নিয়মিত তরল সার ব্যবহার করতে হয়। বাগানে বা গাছে ফুলের সংখ্যা কম মনে হলে গাছ প্রতি মাসে ২০ গ্রাম করে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি সার দিতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ১০০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ৫০ সেমি.

গাছের আকার আকৃতি অনুসারে এই দূরত্ব কমবেশি হয়।

রোপণ সময় : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে গোলাপের চারা (কলম) লাগালে ভাল হয়।

ছোট গোলাপ

জাত : ডুয়ার্ফ পলিয়েন্থা ফ্লেরিবান্দা চীনা গোলাপ	গাছে উচ্চতা : ৬০ সে.মি.

সারের পরিমাণ (প্রতি বর্গমিটারে বা ২ থেকে ৩ টি টবে)

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট	৫০০ গ্রাম
অথবা	
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪০ গ্রাম
টিএসপি	৪০ গ্রাম
এমপি	৩০ গ্রাম
জিপসাম	২০ গ্রাম

রোপণ পরবর্তী সময়ে প্রতি গাছে প্রতি মাসে ৩০ থেকে ৫০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৬০ সেমি.
গাছ থেকে গাছ ৩০ সে.মি.

রোপণ সময় : সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই গোলাপের চারা রোপণ করা যায়।

রজনীগন্ধা

জাত : সিংগেল ও ডাবল, ইন্ডিয়ান

সারের পরিমাণ (প্রতি বর্গ মিটার বা ৪টি টবে)

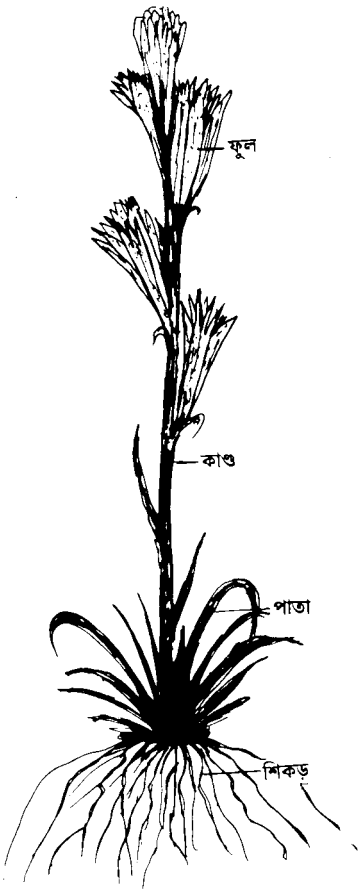

চিত্র ৯৪ : রজনীগন্ধা ফুল।

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কম্পোস্ট সার	১৫০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০ গ্রাম
টিএসপি	১৫ গ্রাম
এমপি	১০ গ্রাম
জিপসাম	৫ গ্রাম

ইউরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সার জমি প্রস্তুতের সময় চারা রোপণের সারিতে এবং ইউরিয়া সার ৩ ভাগ করে চারা রোপণের ৩০, ৫০ ও ৭৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়। দ্বিতীয় বছরে একই পরিমাণ সার একই নিয়মে প্রয়োগ করতে হয়।

রোপণ দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৩০ সে.মি.
গাছ থেকে গাছ ২০ সে.মি.

রোপণ সময় : ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে রজনীগন্ধার চারা রোপণ করলে ভাল হয়।

ফুল গাছে সার প্রয়োগ

গাছের নাম : শেফালী, কবরী, কামিনী, কাঞ্চন, যুঁই, মাধবীলতা, বাগানবিলাস

রোপণ গর্তে সার প্রয়োগ : গর্ত ৬০ × ৬০ × ৬০ সেমি.

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ গ্রাম
এমপি	১০০ গ্রাম
জিপসাম	৭৫ গ্রাম

গর্তে সার প্রয়োগের ২ সপ্তাহ পর চারা রোপণ করতে হয়।

গাছে রোপণের পরবর্তী মাস থেকে ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি মাসে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০ থেকে ১০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০ থকে ৪০ গ্রাম
টিএসপি	২০ থকে ৩০ গ্রাম
এমপি	১০ থকে ২০ গ্রাম
জিপসাম	৫ থকে ১০ গ্রাম

ফুলন্ত গাছ প্রতি সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ	
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০ গ্রাম	প্রতি মাসে প্রয়োগ করতে হবে।
ইউরিয়া	৫০ গ্রাম	
টিএসপি	৩০ গ্রাম	
এমপি	২০ গ্রাম	
জিপসাম	১৫ গ্রাম	

অথবা প্রতি মাসে ৫০০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া দিলেই চলে।

রোপণ দূরত্ব : ২০০ থেকে ৩০০ মিটার

রোপন সময় : এপ্রিল–মে বা সেপ্টেম্বর –অক্টোবর।

মৌসুমী ফুল গাছে সার প্রয়োগ

সারের পরিমাণ গাছের আকার, উচ্চতা ও রোপণ নক্সার বাগানে বা টবে মৌসুমী ফুলগুলো উচ্চতা অনুসারে মিশ্র বর্ণে সাজিয়ে বা গুচ্ছাকার নক্সায় রোপণ করতে হয়। এখানে প্রধান প্রধান শীতকালীন মৌসুমী ফুল গাছের উচ্চতা দেওয়া হলো। গাছের আকার ও উচ্চতা বিবেচনা করে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়।

ফুলের নাম	গাছের উচ্চতা
পর্টুলেকা সালপি গ্লোসিস (খাটো) এগেরিটাম (খাটো) ফ্লক্স লোবেলিয়া গাঁদা	১৫ থেকে ২৫ সেমি.
সুই উইলিয়াম ভারবেনা লিনারিয়া মিমুলাস নেস্টারশিয়ান (খাটো)	২০ থেকে ৪০ সেমি.
এন্টিরহিনাম (খাটো) ক্যালেন্ডুলা কেন্ডিটাফ্ট ডায়ান্থাস করগেট–মি–নট নিমেশিয়া লুপিন	২০ থেকে ৪০ সেমি.

প্রতি বর্গমিটারে উল্লিখিত ফুল গাছে সারের পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	১০০০ গ্রাম
অথবা	
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০০ গ্রাম
ইউরিয়া	২০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ গ্রাম
এমপি	২০ গ্রাম
জিপসাম	১৫ গ্রাম

সব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়। চারা রোপণের পর প্রতি সপ্তাহে প্রতি বর্গমিটারে ৫০ গ্রাম করে কমপোস্ট গুঁড়া ব্যবহার করলেই চলে।

ফুলের নাম	গাছের উচ্চতা	রোপণ দূরত্ব
এগেরিটাম কারনেশন সাইনোগ্লোসাস লার্কসপার ওয়াল ফ্লাওয়ার পপি ডেইজি গাঁদা ডালিয়া	৪০ থেকে ৬০ সেমি.	৩০ সেমি.
এস্টিরহিনাম এস্টার (তারা ফুল) করিওপসিস পিটুনিয়া স্ট্র ফ্লাওয়ার লুপিন নেস্টারশিয়া চন্দ্রমল্লিকা ক্লিওম ডালিয়া	৬০ থেকে ৭৫ সে.মি	৩০ সেমি.
কেন্সালুলা নিকোশিয়ানা লুনারিয়া সালপিগ্লোসিস কসমস ডালিয়া হলিহক	৭৫ থেকে ৯০ সেমি.	৪০ সেমি.

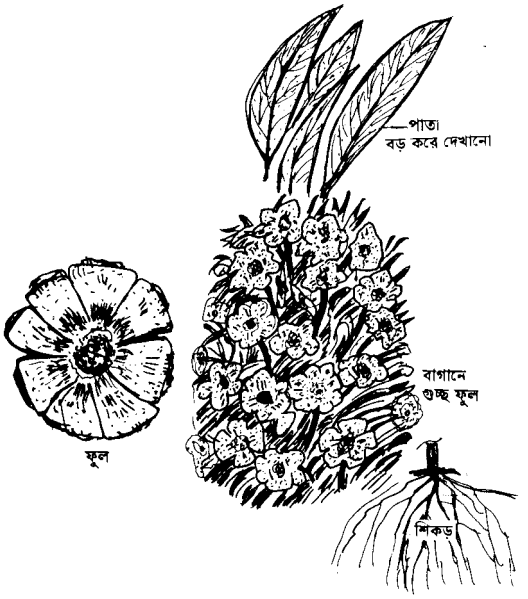

চিত্র ৯৫ : পুর্টুলেকা।
(সুষম সার প্রয়োগ করলে পর্টুলেকা ফুলের আকার বড় হয় এবং রঙ উজ্জ্বল হয়।)

চিত্র ৯৬ : এন্টিরহিনাম ও ফ্লক্স ফুল।

চিত্র ৯৭ : সুইট উইলিয়াম ও ডায়ান্থাস।

চিত্র ৯৮ : ভারভেনা তিন ধরনের (ক,খ,গ) ফুল।

(ভারভেনা ফুলের বেশ কয়েকটি উপজাত রয়েছে। এককভাবে জন্মালে বা গুচ্ছাকারে জন্মালে সেই অনুসারে সার দিতে হয়।)

চিত্র ৯৯ : ক্যালেন্ডুলা ও ন্যাস্টারশিয়াম।

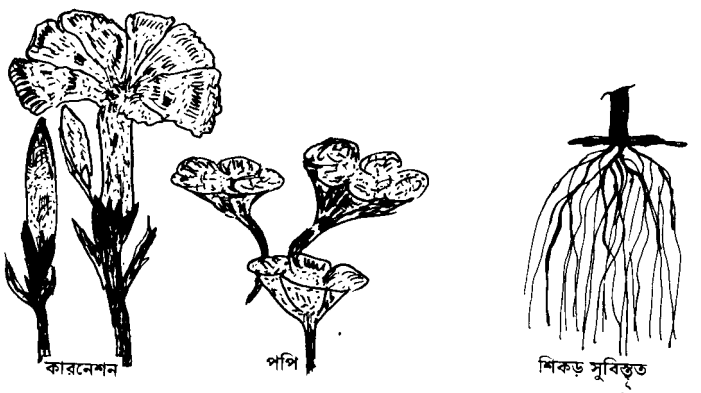

চিত্র ১০০ : কারনেশন ও পপি।

চিত্র ১০১ : ডালিয়া।

(ডালিয়া ফুলের অনেকগুলো উপজাত রয়েছে। যেমন সিঙ্গল ও ডবল, লাল, হলদে ও মিশ্র। ফুলের সংখ্যা ও আকার এবং গাছের আকারের উপর ভিত্তি করে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। পরিমিত পটাশ ও ফসফেট সার দিলে গাছের কাঠামো শক্ত হয়, ফুল গাছ খাড়া থাকে এবং ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ে।)

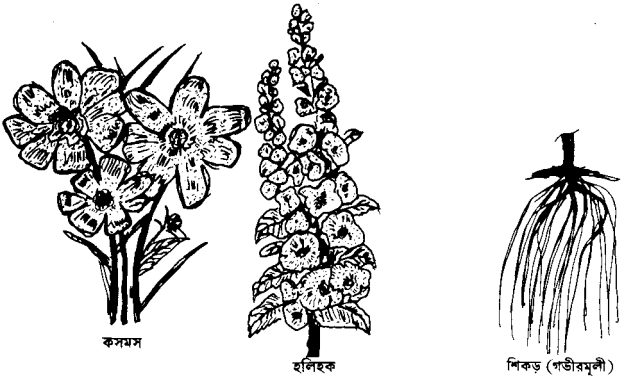

চিত্র ১০২ : কসমস ও হলিহক।

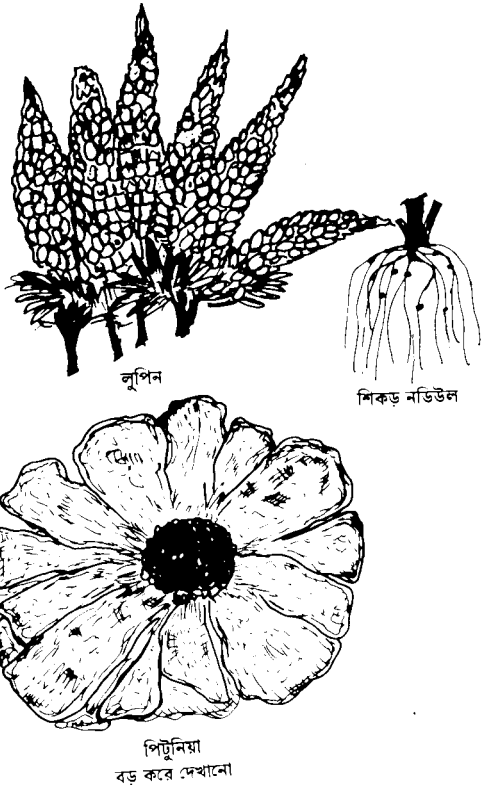

চিত্র ১০৩ : লুপিন ও পিটুনিয়া।

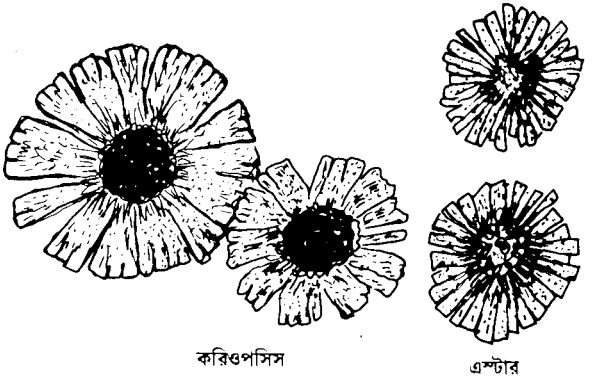

চিত্র ১০৪: কোরিওপসিস ও এস্টার

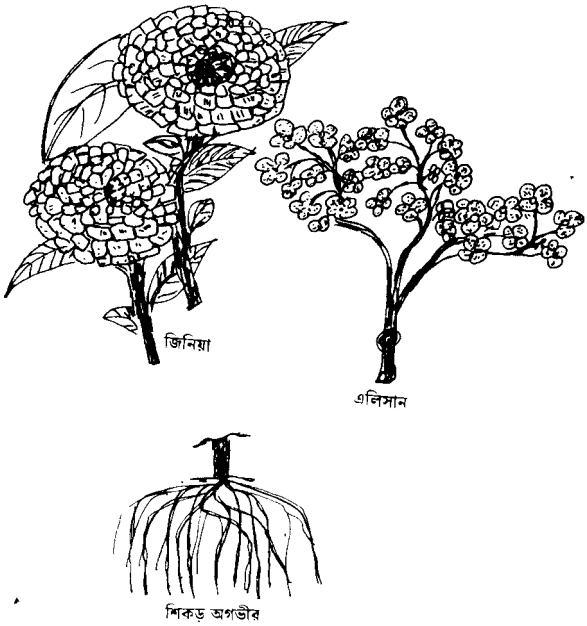

চিত্র ১০৫ : জিনিয়া ও এলিসান

চিত্র ১০৬ : স্যালভিয়া ও প্যানজি।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন ফুল

ফুলের নাম	গাছের উচ্চতা	রোপণ দূরত্ব
বোতাম ফুল দোপাটি কোরিওপসিস শ্যাম সোহাগিনি পর্টুলেকা	২৫ থেকে ৫০ সে.মি.	৩০ সেমি.
মোরগ ফুল টোরেনিয়া জিনিয়া কোচিয়া	৫০ থেকে ৮০ সেমি.	৩৫ সেমি.
হলদে কসমস সূর্যমুখী টিমোনিয়া সন্ধ্যামণি সূর্যমণি বৈজয়ন্তী	৮০ থেকে ১২০ সে.মি.	৪০ সেমি.

সারের পরিমাণ প্রতি বর্গ মিটার বা ২টি টবে

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	১৫০০ গ্রাম
অথবা	
কমপোস্ট গুঁড়া	৭০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০ গ্রাম
টি এসপি	৪০ গ্রাম
এম পি	২০ গ্রাম

পরবর্তী সময়ে ফুলের মৌসুম পর্যন্ত প্রতি বর্গমিটারে সপ্তাহে ৫০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া ব্যবহার করতে হয়।

ক্ষুদ্র ঝোপজাতীয় ফুল

বেলী সুইট সুলতান, নার্গিস, টগর, হাস্নাহেনা, দোলনচাঁপা, ভূঁইচাঁপা — গাছের উচ্চতা ১৫০ থেকে ১৬০ সে.মি.

সারের পরিমাণ (প্রতি গাছে বা প্রতি টবে)

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	১২০০ গ্রাম
অথবা	
কমপোস্ট গুঁড়া	৬০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০ গ্রাম
টি এসপি	৪০ গ্রাম
এমপি	২০ গ্রাম
জিপসাম	১৫ গ্রাম

পরবর্তী প্রতিটি গাছে ১৫ দিন পর পর ৫০ গ্রাম করে কমপোস্ট গুঁড়া ব্যবহার করতে হয়।

জবা : গাছের উচ্চতা ফুলবৃক্ষ ২০০ থেকে ২৫০ সেমি.

গন্ধরাজ : রোপণ দূরত্ব ২০০ সেমি.

সারের পরিমাণ (প্রতি গাছে) রোপণ গর্তে

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪০ গ্রাম
টিএসপি	২০ গ্রাম
এমপি	২০ গ্রাম
জিপসাম	১৫ গ্রাম

রোপণ পরবর্তী সময়ে গাছে প্রতিমাসে ৫০ গ্রাম, ২ থেকে ৫ বছরে ১০০ থেকে ২০০ গ্রাম এবং

বড় গাছে প্রতি সপ্তাহে ১০০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া দিলেই চলে।

জেসমিন ফুল

জেসমিনজাতীয় ফুল ও সেগুলোর উচ্চতা উল্লেখ করা হলো।

গাছের নাম	গাছের উচ্চতা
বেলী বা বেলা খেয়ে বেলা মোতিয়া বেলা রাই বেলা চামেলী	৬০ থেকে ৭৫ সেমি. ৬০ থেকে ৯০ সেমি.
জুঁই স্বর্ণ জুঁই মল্লিকা	১২০ থেকে ১৬০ সেমি.

সারের পরিমাণ (প্রতি গাছে বা প্রতি ড্রামে) রোপণ গর্তে বা বড় গাছে

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	৫০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৫০ গ্রাম
টি এস পি	৪০ গ্রাম
এম পি	৩০ গ্রাম
জিপসাম	২০ গ্রাম

পরবর্তী সময়ে প্রতিটি গাছে প্রতি সপ্তাহে ৫০ গ্রাম করে কমপোস্ট গুঁড়া দিলেই চলে।

বাহারী লতা ও ফুল

অপরাজিতা, বহুলতা, মাধবীলতা, কুন্ধলতা, বাগানবিলাস, মালতী, ঝুমকোলতা, কুমারীলতা

অন্যান্য লতার নাম পরবর্তীকালে দেওয়া হয়েছে।

প্রতি গাছে রোপণ গর্তে সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট গুঁড়া	২০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪০ গ্রাম
টি এস পি	৩০ গ্রাম
এমপি	২০ গ্রাম
জিপসাম	১০ গ্রাম

চারা রোপণের পর প্রতি গাছে প্রতি মাসে ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া ব্যবহার করলেই চলে।

বাহারী গাছ

পাতা বাহার দূরন্ত ককটাস ছায়াগাছ	গাছের উচ্চতা, জাত ও ছাঁটাই অনুসারে ভিন্ন হয়ে থাকে।

অন্যান্য বাহারী গাছের নাম পরবর্তীতে দেওয়া হয়েছে। এসব গাছে প্রতি ২ থেকে ৩ টি টবে বা প্রতি বর্গমিটারে প্রতি মাসে ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম কমপোস্ট গুঁড়া দিলেই চলে।

গোলাপ গাছে সার প্রয়োগের বিশেষ জ্ঞাতব্য

ফুল গাছের মধ্যে গোলাপ গাছে সার প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বর্তমানে গোলাপের বাণিজ্যিক চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

অধিক সংখ্যক উন্নত মানের ফুল উৎপাদন করতে হলে গোলাপে জৈব ও রাসায়নিক সারের সমন্বয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়।

গোলাপে সার প্রয়োগের প্রকার ও পরিমাণ মূলত গোলাপ গাছের আকার, আকৃতি, ফলের বর্ণ ও ফুলের গাছের উপর নির্ভর করে। যেমন—

গাছ ও ফুলের আকার

ক) গাছ ও ফুলের আকার বড় করতে হলে গাছে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন ও ম্যাগনেশিয়াম সার প্রয়োগ করতে হয়। গোলাপ গাছে ম্যাগনেশিয়ামের অভাব হলে পাতার আকার ছোট হয়, ফলে ফলের আকারও ছোট হয়ে যায়।

খ) ফুলের বর্ণ : ফুলের বর্ণ আকর্ষণীয় করতে হলে ক্লোরিনসম্পন্ন সার ব্যবহার করা যাবে না। এক্ষেত্রে পটাশের জন্য মিউরেট অব পটাশের বদলে পটাশিয়াম সালফেট বা পটাশিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করতে হয়। সুষম ফসফেট সার ফুলের পাঁপড়ির সতেজতা বাড়ায়, বর্ণ উজ্জ্বল করে, ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

গ) ফুলের গন্ধ সুগন্ধী গোলাপের চাষ করতে হলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই পর্যাপ্ত পচা জৈব সার বা সুষম কমপোস্ট গুঁড়া এবং অণুপুষ্টি (micronutrient) সার ব্যবহার করতে হয়। সালফার, দস্তা ও বোরনের অভাব হলে ফুলের গন্ধ কমে যায়। গাছে মলিবডেনামের অভাব হলে ফুলের গন্ধের স্থায়িত্ব কমে যায়।

এসব বিবেচনা করে গোলাপ গাছে সার প্রয়োগের সুবিধার্থে এদেশে সচরাচর চাষ করা জাতের আকার, ফুলের বর্ণ ও গন্ধের ভিত্তিতে গোলাপের একটি শ্রেণিকরণ উল্লেখ করা হলো।

সাধারণ নাম	ফুলের বর্ণ	গাছের প্রকৃতি
১. গোলাপ (উচ্চতা এক মিটারের বেশি)		
স্লিভার জুবিলী	গোলাপি এবং ঘিয়ে	ঝোপ
আলেকজান্ডার	কমলা গোলাপি	খাড়া
এ্যাডমিরাল রুডনি	হাল্কা গোলাপি	ঝোপ
শান্তি	হলদে গোলাপি	ঝোপ
জাস্ট জয়	তামাটে গোলাপি	ঝোপ
গ্যান্ড ডিকসন	হলদে	খাড়া
ন্যাশনাল ট্রাস্ট	লাল	ঝোপ
পিকাডেলি	লাল হলদে	খাড়া
পিঙ্ক ফেবারেট	গাঢ় গোলাপি	খাড়া
ফ্ল্যাগর‍্যান্ট ক্লাউড	লাল	খাড়া
রেড ডেভিড	লাল	খাড়া
ট্রোইকা	কমলা লাল	খাড়া
আরনেস্ট এইচ মোরস	লাল	খাড়া
২. গুচ্ছ গোলাপ (উচ্চতা এক মিটারের কম)		
অ্যানিস	হাল্কা হলদে	ঝোপ
সাউম্প	কমলা	খাড়া
এভলিন ফিসন	লাল	ঝোপ
এলিজাবেথ	হাল্কা গোলাপি	খাড়া
পিঙ্ক পারফেক্ট	গোলাপি ক্রিম	ঝোপ
কোরিসিয়া	উজ্জ্বল হলদে	ঝোপ
মারগারেট মেরিল	ক্রিম	ঝোপ
আরথারবেল	স্বর্ণ হলুদ	ঝোপ
সিটি অব লিডস	গাঢ় গোলাপি	ঝোপ
ট্র্যাম্পটার	লাল	ঝোপ
এসকেপেইড	গোলাপি সাদা মিশ্র	খাড়া
আইরিশ বিউটি	গোলপি গাঢ়	খাড়া
কোরবেল	গোলাপি	খাড়া
লিভারপুল একো	গোলাপি	ঝোপ

সাধারণ নাম	বর্ণ	গন্ধ
৩.ক্ষুদে গোলাপ (উচ্চতা আধা মিটারের কম উঁচু)		
এন্দোলা রিপন	গাঢ় গোলাপি	মধ্যম
বেবী মসকুইরেড	হলদে ও লাল মিশ্র	গন্ধহীন
ডারলিং ফ্লেইম	গাঢ় ফসল	গন্ধহীন
রেড এইস	খয়েরী	হাল্কা
রাইজ এন সাইন	হলদে	হাল্কা
স্টারিনা	কমলা লাল	হাল্কা
পৌর টয়	ক্রিম সাদা	হাল্কা
জুডি ফিচার	গোলাপি	হাল্কা

৪. লতা গোলাপ (উচ্চতা ৩ মিটারেরর বেশি)

লতাজাতীয় গোলাপে ফসফেটের চেয়ে নাইট্রোজেন বেশি হয়ে গেলে গাছ পাতায় ভরে গিয়ে ফুলের উৎপাদন কমে যায়। এজন্য এসব জাতের গাছে পর্যাপ্ত ফসফেট সার দিতে হয়।

সাধারণ নাম	বর্ণ	গন্ধ
হ্যান্ডল	ক্রিম	হাল্কা
কমপ্যাসন	গোলাপি	কড়া
স্পেক্টিকুলার	কমলা লাল	গন্ধহীন
মেগোল্ড	হলদে	কড়া
গোল্ডেন শাওয়ারস	সোনালি হলুদ	মধ্যম
আলরবারটিন	হাল্কা গোলাপি	কড়া
থর্নলেস রোজ	গাঢ় গোলাপি	কড়া
মারমেইড	হলদে	মধ্যম
নিউ ডন	তামাটে গোলাপি	কড়া

৫. গুল্ম গোলাপ (উচ্চতা ১ থকে ২ মিটার)

সাধারণ নাম	বর্ণ	গন্ধ
ফ্লেড লোডস		হাল্কা
ব্যালেরিনা	হাল্কা গোলাপি	হাল্কা

লতাজাতীয় গাছে সার প্রয়োগ

লতাজাতীয় গাছ ছায়া, আধা ছায়া বা সূর্যালোকসম্পন্ন পরিবেশে রোপণ করা হয়। বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি ও এঁটেল দে-আঁশ মাটিতে লতাজাতীয় গাছ লাগানো হতে পারে। তাই লতাজাতীয় গাছের প্রকৃতি, প্রাপ্ত সূর্যালোকের পরিমাণ এবং মাটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। যেমন—

ক) গাছ সূর্যালোকে হলে সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়।

খ) গাছ লাগানোর মাটি বেলে হলে জৈব সার ও রাসায়নিক সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়।

গ) মাটি উর্বর ও সুনিষ্কাশিত হলে সারের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেওয়া যায়।

ঘ) গাছে, অণুপুষ্টি সারের ঘাটতি দেখা দিলে তা পরবর্তীতে গাছের পাতায় স্প্রে করা যায়।

ঙ) ছায়ায় লাগানো গাছের কাঠামো শক্ত রাখার জন্য পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম সরবরাহ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চ) রোদে লাগানো গাছে যাতে ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। মাটিতে প্রয়োগ ছাড়াও ম্যাগনেশিয়াম সার বা ইপসম সল্ট গাছের পাতায় স্প্রে করা যায়।

সাধারণ নাম	স্থান / মাটি	গাছের প্রকৃতি
এষ্টিনিডিয়া	সূর্যালোকিত সাধারণ মাটি	লতা
বিটার সুইট	সূর্যালোক বা হাল্কা ছায়া সাধারণ মাটি	লতা
আই ভি	ছায়া, সাধারণ মাটি	লতা
জেসমিন	সূর্যালোকিত সাধারণ মাটি	লতা
অলংকার লতা	সূর্যালোক বা হাল্কা ছায়া সুনিষ্কাশিত মাটি	লতা
শিলা গোলাপ	সূর্যালোকিত	গুল্ম
লেভেন্ডার	সূর্যালোককিত বা হাল্কা ছায়া, সুনিস্কাশিত মাটি	গুল্ম
প্রাইভেট	সূর্যালোকিত বা ছায়া সাধারণ মাটি	গুল্ম
ম্যাগনোলিয়া	সূর্যালোকিত বা হাল্কা ছায়া হিউমাস মাটি	গুল্ম
ভার্জিনিয়া লতা	সূর্যালোকিত বা হাল্কা ছায়া, উর্বর মাটি	লতা

সাধারণ নাম	স্থান/মাটি	গাছের প্রকৃতি
ভার্জিনিস বোয়ার	হাল্কা ছায়া উর্বর মাটি	লতা
প্যাসন	সূর্যালোকিত সুনিস্কাশিত মাটি	লতা
হানি সাকল	সূর্যালোকিত বা হাল্কা ছায়া উর্বর মাটি	লতা
উইসটেরিয়া	সূর্যালোকিত উর্বর মাটি	লতা

জনপ্রিয় ফুলও লতা-বাহারী গাছের নাম
গোলাপের প্রকার

চায়নেসিস, হাইব্রিড পার্পিচুয়াল, হাইব্রিড-টি, পলিয়েন্থা ফ্লোরিবান্দা, লতা গোলাপ ও গুল্ম গোলাপ।

জনপ্রিয় গোলাপের উপমহাদেশীয় জাত

পাপা মিলান্দ, সর্বোদয়, জয়, বসরাই, কুমকুম, তাজমহল, রাণী, রাজা, তুহিন, হরিদ্রা , বুরবো, পণ্ডিত নেহেরু, ক্রিমসন গ্লোরি, সোলে, গঙ্গা, জওহর, কমলা, শ্রীনিবাস, লালবাহাদুর, মৃণালিনি, চন্দ্রমা, প্রেম, প্রিয়া, বনজারণ, ভগবতী, মোহিনী ও দিল্লী প্রিন্সেস।

শরত ফুল

শাপলা, রক্তকমল, লালপাম, স্থলপদ্মা, জবা, রাধাচূড়া, কলাবতী, করবী ও শিউলী / শেফালী

হেমন্ত ফুল

হাস্নাহেনা, মধুমঞ্জুরী ও দেবকানন।

বসন্ত ফুল (বৃক্ষ)

ভাটফুল, ভূঁইচাপা, লিলি, গিরিমল্লিকা, কনকচাঁপা ও অন্যান্য চাঁপা, শিমুল, কাঞ্চন, গন্ধরাজ, নাগেশ্বর (নাগকেশর), পলাশ, অশোক ও সন্ধামণি।

গ্রীষ্মফুল (বৃক্ষ)

কদম, রঙ্গন, শ্বেতকাঞ্চন, যুঁথি, বা জুঁই, রজনীগন্ধা, দোলনচাঁপা, কেতকি, কামিনী, পারুল, পিয়াল, বকুল মান্দার, সোনাইল, হিজল, তমাল, টগর, মল্লিকা ও জয়ন্তী;

ঔষধি ফুল

অতসী, গাঁদা, চন্দ্র, মল্লিকা, দুপুরচন্ডি, দোপাটি, নয়নতারা, মোরগ ফুল, সন্ধামালতী ও বকফুল।

লতা

অপরাজিতা, চামেলী, যুঁথি, ঝুমকা, তারামনিদেতা (কুঞ্জলতা) গ্লোরিওসা, নীলমণি লতা, বাগানবিলাস, মর্নিং গ্লোরি, মাধুরি লতা, মধুমালতী, ব্রহ্মলতা,

মৌসুম

ডালিয়া (চিত্রিতা, ক্যাকটাস ও পম্পন), কসমস, জিনিয়া, সেলভিয়া, হলিহক, এস্টার, লার্কসপার, সুইটপি, পিটুনিয়া, ফ্লক্স, পর্টুলেকা, ভার্বেনা।

বাহারী গাছ

পাতাবাহার, লাল পাতা, মানি প্ল্যান্ট, পুন্নাগ, বকফুল, মেন্দি, মুন ফ্লাওয়ার (চন্দমুখী), ম্যাগনোলিয়া, উদয় পদ্ম, লবঙ্গ লতা, সুরভি (গরিনিম), হলদে শাপলা।

বিরল তরুলতা

অনন্তলতা, কালবাসক, পারুল, কেশরাজ, গকুল (গুইয়া বাবুল) চিতা, টেকমা (সোনাপাতি), ডে লিলি (গুল নার্গিস) তেলসুর।

আলো-ছায়ায় রোপণের উপযোগী বিভিন্ন গাছ

সাধারণ নাম	স্থান মাটি	গাছের প্রকৃতি
বারবেরি	সূর্যালোকিত হাল্কা ছায়া	গুল্ম
বাটারফ্লাই বুটশ	সুর্যালোকিত সুনিষ্কাশিত মাটি	গুল্ম
ক্যামেলিয়া	সূর্যালোকিত বা হাল্কা ছায়া	গুল্ম
ললি স্টার	সূর্যালোকিত বা হাল্কা ছায়া সাধারণ মাটি	গুল্ম
হাইড্রেনজিয়া	আংশিক ছায়া সুনিষ্কাশিত মাটি	গুল্ম
ইউনিমাস	সূর্যালোকিত বা হাল্কা ছায়া সাধারণ মাটি	
হেলি	সূর্যালোকিত বা হাল্কা ছায়া সাধারণ মাটি	গুল্ম
প্রুনাস	সূর্যালোকিত বা হাল্কা ছায়া সাধারণ মাটি	গুল্ম
এজালিয়া	আংশিক ছায়া অম্লমাটি	গুল্ম
ভিবার নাম	সূর্যালোকিত হিউমাস মাটি	গুল্ম

সুষম সার দেওয়া জমিতে-টবে চারা রোপণ থেকে ফুল ফোটার সময়সীমা

ফুলের নাম	সময়সীমা
কসমস, ক্যালেন্ডুলা, পর্টুলেকা, পপি	৩০ থেকে ৩৫ দিন
ন্যাস্টারশিয়াম, রজনীগন্ধা, গাঁদা, স্ট্রফ্লাওয়ার, টিথোনিয়া, জিনিয়া এন্টিরহিনাম, স্ন্যাপ ড্রাগন, জিপসোফিলা	৭০ থেকে ৯০ দিন
কোরিওপসিস, কারনেশন, ক্লিওম, সুইট সুলতান, ভারবেনা, লুপিন, লার্কসপার, ডালিয়া, অপরাজিতা, নিমেসিয়া, পানজি, ক্যাম্পানুলা, ডায়ান্থাস, স্যালভিয়া, লোবেলিয়া, সালপিগ্লোসিস, মোরগ ফুল, অতসী এগারেটাস, চন্দ্রমল্লিকা	৯০ থেকে ১০০ দিন
ফরগেট-মি-নট, সুইটপি, মাইওসোটিস	১০০ থেকে ১৩০ দিন।

উপকরণের প্রাপ্তিস্থান

বীজ, চারা, কলম, সার, বালাইনাশক, কৃষিপুস্তক ও কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাপ্তিস্থান (ঢাকা)

কুষ্টিয়া সিড স্টোরস ঃ রোড ৩ বাড়ি-৭, মিরপুর ১১, ঢাকা। টেলিফোন ৮০১৪৩৫, ৮০২৩৩৬।

কৃষিবিদ উপকরণ নার্সারি ঃ খামার বাড়ী সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা। টেলিফোন ৮০২৩৩৬।

আদর্শ জৈব খামার : পুবাইল রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন, জয়দেবপুর, গাজীপুর, টেলিফোন (ঢাকা)-৮৩৮০২৪।

ইউনাইটেড সিড স্টোর ঃ ১৫ গ্রীন রোড, ঢাকা। টেলিফোন ৫০৮৫০৯, ৫০০৩৭৮।

মেসার্স জয়পাড়া বীজ ভাণ্ডার ঃ ১৪৫ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা। টেলিফোন ২৮১০৭৯।

ক্যাপিটাল সিড হাউজ ঃ ১৯০ শেরে বাংলা রোড, খুলনা। টেলিফোন ২৩৬৬৩, ২০০৯৫।

ঢাকা সিড স্টোর ঃ ৯ ডি আইটি এভিনিউ, ঢাকা টেলিফোন ২৩১৪৬০।

মেসার্স নাদিম বীজ ভাণ্ডার ঃ ১৭৪ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা। টেলিফোন ২৩৫৭৪৮।

এগ্রিস্পেক্স ঃ ৫৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। টেলিফোন ২৫৭১৫৪, ২৩১০০৮।

মল্লিকা সিড কোম্পানি ঃ ১৪৯ রাজউক এক্সটেনশন রোড, টেলিফোন ৪০৬৫৩৬ ৪০৬০৪৩।

দি সোসাইটি নার্সারি ঃ কে. সি. দে রোড চট্টগ্রাম। টেলিফোন ২০৫৬২৪।

ঢাকা বোন এন্ড সার ঃ ৩১/ই তোপখানা রোড, ঢাকা। টেলিফোন ২৪৩৪৪৫, ২৫৭৭৫৬।
মাইস্পেক্স ইন্টারন্যাশনাল ঃ ৩২৫ বায়তুল আমান, রোড ৩, শ্যামলী, ঢাকা টেলিফোন ৩২৪২৬৭।
এগ্রোসার্ভ ঃ রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং ১১৪ মতিঝিল বা/এ, টেলিফোন ২৫০০৭৫, ২৫৭৭৯২।
রাজধানী বীজাগার ঃ ১৭৪ ফুলবাড়িয়া স্টেশন রোড, ঢাকা, টেলিফোন ২৪৯১৮৬, ৩৮৩৩৪০।

সাধারণ কৃষি যন্ত্রপাতি

বাড়ির আঙিনায় মাঠে, ছাদে টবে শাক-সবজি, মসলা, ফুল, ফলমূল, চাষাবাদ করার প্রয়োজনে বাড়িতে কিছু যন্ত্রপাতি ও উপকরণ রাখতে হয়। যেমন-

সংরক্ষণ পাত্র ঃ প্লাস্টিকের ছোট বড় বয়ম বীজ ও সার দ্রব্য রাখার জন্য;

চিত্র ১০৭ : সার দ্রব্য রাখার পাত্র।

ছোট আলমারী ঃ রোগনাশক, কীটনাশক, হরমোন ও অন্যান্য পাত্র ও উপকরণ নিরাপদে রাখার জন্য;

কোদাল খুরপি ঃ মাটি আলগা করা, আগাছা বাছাই ছোট লাঙল ;

ঝাঝরি, বালতি, মগ ঃ গাছে পানি দেওয়ার জন্য ;

দা, ছুরি, কাচি ঃ গাছ ছাঁটাই ও কলম কাটার জন্য ;

কাঠের বাক্স বা ফ্রেম ঃ বীজতলা হিসেবে চারা তৈরির জন্য ;

স্প্রে যন্ত্রপাতি ঃ ঔষধ ও অন্যান্য সার দ্রবণ ছিটানোর জন্য এবং

বস্তা, টব, পলি প্যাকেট ঃ জৈব সার ও পট মিশ্রণ রাখার জন্য।

চিত্র ১০৮ : সার প্রয়োগের যন্ত্রপাতি।

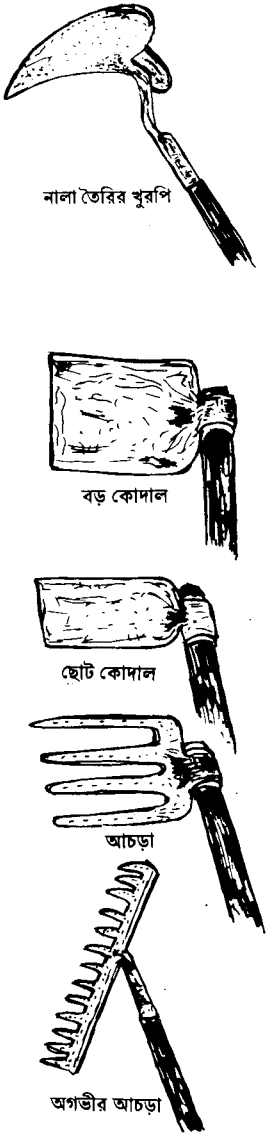

চিত্র ১০৮ : সার প্রয়োগের যন্ত্রপাতি।

তথ্যপঞ্জি

TISDALE, S.L.; NELSON, W. L. AND BEATON, J.D. 1985 *Soil fertility and fertilizers, 4th. ed.* MacMillan Publishing Company, New York.

ANNUAL REPORTS (1985 -94) BARI, BRRI, BJRI, SRTI, BINA, BARC. Dhaka.

KEMMLER, G. AND TANDON, H. L. S. 1988. *Potassium Deficiency and its Correction in Horticultural Crop.* Int. Potash Instiiute and FDCO, India, New Delhi

STATISTICAL POCKET BOOK 1995, Bangladesh Bureau of Statistics. Govt. of Bangladesh.

HESSAYON, D.G. 1988. *The Rose Expert.* Publications Britanica House, England.

UPLB. 1978 *The Philippines Recommends for Soil Fertility Management* PCARRD. Manila

BARI ICRIASAT 1991. Advänces in Pubes Research in Bangladesh, Proc Ind National Workshop on Rulses.

TANDON, H.L.S1992. *Fertiliurs, Organic Mannurs, Reaydeble wasts and Biofertilius.*, Fertilizer Development and Consultation Organization (FDCO) New Delhi, India.

TANDON, H. L. S 1992. *Fertilizers Recommendation for Hoticultural Crops.* FDCO. New Dolhi: India. BARC. 1989 Fertilizer Recommendation Guide Bangladesh Agricultural Reserch Council, Farmgate, Dhaka.

ইসলাম, এম. এস এবং আমিন, এম. এস. ১৯৮৮ *সার ব্যবহার নির্দেশিকা*, ঢাকা।

আমিন, এস. এম ১৯৯০। *বাংলাদেশ মৃত্তিকার পরিচিতি ও ব্যবহার।* ঢাকা।

আমিন এম. এস ১৯৯৬। *পরিবেশ বিজ্ঞানঃ মৃত্তিকা অণুজীব ও জৈব সার।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আমিন এম. এস. ১৯৯৬। *পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ মৃত্তিকার ভৌত ধর্ম।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিএ আর আই, ১৯৯৩। *ভুট্টার উৎপাদন ও ব্যবহার।* জয়দেবপুর, [illegible]।

বিশ্বাস, এস. ১৯৮৩। *সার তৈরি ও ব্যবহার।* পশ্চিমবঙ্গ [illegible] পুস্তক [illegible]। কলিকাতা, ভারত।

বি. আর সি. ১৯৯৫। *কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশে পটাশ সারের ব্যবহার।* ফার্মগেট, ঢাকা।

BANSDOC Library
Accession No. 17782